দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী

সুধীরকুমার মিত্র

ডি. এম. লাইব্রেরী / কলকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা, আষাঢ় ১৩৬৫
জুন ১৯৫৮

ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণী কলকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে আশিস্ গোপাল
মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও বীণাপাণি প্রেস ১১ কৃষ্ণদাস পাল লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে কমলা সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

ঋষি অরবিন্দ

যিনি ভারতে হিন্দুধর্মকে সতেজ করে ভারত-সংগঠনের
ব্রত নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন
তাঁর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি
সুধীরকুমার মিত্র

ঋষির বাণী

"The religion of India is nothing if it is not lived……. In this Hinduism, we find the basis of the future World Religion. Our aim will, therefore, be to help in building up India for the sake of Humanity —this is the spirit of nationalism which we progress and follow."

"ভারতের ধর্মকে যদি সতেজ না করা হয়, তবে তা অবলুপ্তির গর্ভে বিলীন হবে। এই হিন্দুধর্মের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিশ্বধর্মের ভিত্তি লুকিয়ে আছে। তাই মানবতার জন্য ভারত-সংগঠন করাই আমাদের লক্ষ্য। বস্তুতপক্ষে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষসাধন ও তার অনুসরণ আমাদের উদ্দেশ্য।"

লেখকের অন্যান্য বই

হুগলী জেলার ইতিহাস

নয়া বাঙলা

ভারতের রাষ্ট্রভাষা

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী

বাঘা যতীন

মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই

যুগাচার্য বিবেকানন্দ

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

আমাদের বাপুজী

আমাদের নেতাজী

তীর্থ সপ্তক

জেজুরের মিত্রবংশ, রাজকুমারী কৃষ্ণকমলিনী

তারকেশ্বরের ইতিকথা

রঘুনাথ গোস্বামী

মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল

কায়স্থ কৌস্তভ (সম্পাদনা)

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ

(১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

হুগলী জেলার দেবদেউল

দিব্যপথের দিশারী

দক্ষিণের দেবস্থান

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র (নাটক)

সংবাদের আলোকে নজরুল

প্রবন্ধ শতক

India's National Language.

The Footprints.

প্রায় চার দশক আগে আমার হুগলী জেলার ইতিহাসের প্রকাশক শিশির পাবলিশিং হাউসের কর্ণধার বহু গ্রন্থের লেখক সুসাহিত্যিক এবং শিশির, সচিত্র শিশির, আমার দেশ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার মিত্র মহাশয় সচিত্র শিশিরে প্রকাশের জন্য বিশেষ ভাবে তাগাদা দিয়ে 'বঙ্গে দুর্গোৎসব' নামে একটি নিবন্ধ আমাকে দিয়ে লেখান। সচিত্র শিশিরে ১৩৫৭ সালে পূজা সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। দুর্গাপূজা নিয়ে ইতিহাসাশ্রিত এইটি আমার প্রথম রচনা।

তারপর সাড়ে তিন দশক ধরে বিভিন্ন পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রাচীন কাহিনীমূলক দেবদেবীর উদ্ভব সম্বন্ধে বিচিত্র কথা এবং সমসাময়িক পুস্তক ও তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে উদ্ধার করে দুর্গাপূজা নিয়ে নানা লেখা ছাড়া আমায় একাধিকবার কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও সরস্বতী পূজা সম্বন্ধেও অর্ধশতাধিক নিবন্ধ রচনা করতে হয়েছিল। এই সব ছোট ছোট নিবন্ধাবলীর মধ্যে কেবল ধর্ম নয়—এর মধ্যে নিহিত রয়েছে ধর্মসাধনার দিক থেকে ধর্মের আবরণে সেকালে প্রচলিত বঙ্গসমাজের একটি সমাজচিত্র, যার মধ্যে তখন নররলিও বাদ যায় নি। সেকালে এ থেকে ঈশ্বরই যে একমাত্র সত্য এই দীন লেখকের বদ্ধমূল ধারণা হয়। তাই ধর্মের নামে তখন যে কোন কাজ করতে তাঁরা কখনও পরাঙ্মুখ হননি দেখা যায়। এটা ছিল প্রথা।

গল্পের মতো করে সরল ভাষায় লেখা, সেকালের কাহিনীমূলক ঐ সব পৌরাণিক নিবন্ধাবলী রচনাকালে সব সময়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা আমার স্মরণ হয়েছে। এই যে ধর্মের নামে পূজাপার্বণ ইত্যাদি সব নানাবিধ অনুষ্ঠান এটাকে অনেকে কুসংস্কার ও অর্থের অপব্যয় বলে মনে করলেও, কবিগুরু নিয়ম ও যুক্তিতে "যার ধর্ম যেটা সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয়, সেটাই তার আনন্দ" বলে যা লিখেছিলেন, এ কথাটি সত্য বলে মনে হয়েছে। পূজাকে উপলক্ষ্য করে আমাদের যত ধর্মকর্ম সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

"ধর্ম সাধনার দুটো দিক আছে—একটা শক্তির দিক, একটা রসের দিক। শক্তির দিক হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাস।.....মনের মধ্যে একটা নিশ্চয় অনুভব। একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে।.....এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে ঈশ্বর সত্য।"

ঈশ্বর যে সত্য সেই বিশ্বাসে সুদূর অতীত কাল থেকে দেশের আপামর জনসাধারণ যে ভাবে ধর্মাচরণ করতেন তা আদিতে অনার্য দেবতা শিব থেকে শুরু করে ধর্মঠাকুর, শনিঠাকুর, বিশ্বকর্মা এমন কি কার্তিক, গণেশ কিছুই বাদ যায়নি। সে যুগে ধর্মসাধনার জন্য দেশের নানা স্থানে কথকতা গীতা ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্য আখড়া পাঠবাড়ী মেলা ইত্যাদির সংস্থাপন এ সবই ছিল ধর্মের অন্যতম অঙ্গবিশেষ, যা মোটামুটি বিধৃত হয়েছে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে। শিবের মত দুর্গাও যে আদিতে ছিলেন অনার্য দেবতা তা বাঙালী-সমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন। দুর্গা ছিলেন প্রথমে শবর বা আদিম সমাজের দেবী। তারপর হিন্দুর দেবতামণ্ডলীতে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটলো তা রামায়ণ, মহাভারত বা দেবীমাহাত্ম্য প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর বিবিধ রচনা থেকে জানা যায়।

দুর্গাকে আমরা শিবজায়া বলে জানি। তিনি ছিলেন শিবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং শিব ছিলেন অনার্য সমাজের দেবতা। সতীর দশ দিকে দশ মহাবিদ্যারূপে আবির্ভাব এবং তাঁর দেহত্যাগে দেশের নানা স্থানে মহাপীঠ সমূহের উৎপত্তি এ সবই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। দশ মহাবিদ্যার অবতারই হচ্ছে হরির দশ অবতার। তারা : মৎস ; বগলা : কূর্ম ; ধূমাবতী : বরাহ ; ছিন্নমস্তা : নৃসিংহ ; ভুবনেশ্বরী : বামন, মাতঙ্গী : রাম ; ত্রিপুরা : পরশুরাম ; ভৈরবী : বলভদ্র ; মহালক্ষ্মী : বুদ্ধ ; দুর্গা : কল্কি। কিন্তু আমরা যে দুর্গাকে জানি, ও পূজা করি তিনি দুর্গ নামক দৈত্যনাশিনী নন, তিনি হচ্ছেন মহিষমর্দিনী। এখন আমরা অর্ধচন্দ্রাকৃতি চালচিত্রের মধ্যে যে দুর্গার পূজা করি; তাতে দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, বাম পার্শ্বে গণেশ ও কার্তিক বিরাজ করছেন দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে কিন্তু গণেশ ও কার্তিকের অবস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের বিপরীত। পণ্ডিতদের অভিমত যেমন ডঃ অতুল সুর বলেন যে, বাঙালীর কল্পনায় দেবীর উভয়পার্শ্বে যথাক্রমে গণেশ কার্তিক ও লক্ষ্মী সরস্বতীর উপস্থিতি "দু-তিনশো বছরের চেয়ে পুরানো নয়।" তিনি বলেছেন "মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা জাঁকজমক করে বাঙলাদেশে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করে-ছিলেন, দেবীর প্রতিমায় কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উপস্থিতি তাঁদেরই কল্পনা প্রসূত অবদান। কেননা বাঙালী তখন দুর্গা বা গৌরীকে ঘরের মেয়ে করে তুলেছিল এবং কল্পনা করে নিয়েছিল যে মা বাপের বাড়ি আসার সময় তার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন।"

তারপর দুর্গারই রূপান্তর কালী মহাকালী ব্রহ্মময়ী কালী চামুণ্ডা কালী থেকে শুরু করে শাক্ত ও শক্তিবাদের মূল তত্ত্ব পর্যন্ত সংক্ষেপে গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে যা অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের মুগ্ধ না করুক বিস্মিত করবে। এ ছাড়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-প্রবর্তিত দুর্গারূপী দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা ও হিন্দু দেবতামণ্ডলীতে তাঁর অনুপ্রবেশ উপন্যাসের চমকপ্রদ কাহিনীর মতই পাঠককুলকে আনন্দ দেবে।

দেব-দেবী বিষয়ক এই সব তথ্যসমৃদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে কিছু বেছে নিয়ে প্রকাশ করা হলো দেব-দেবীর কথা ও কাহিনীতে। তবে চল্লিশ বছর আগে সাধু ভাষায় "সচিত্র শিশিরে" প্রকাশিত প্রথম 'বঙ্গে দুর্গোৎসব' নামক নিবন্ধটি অপরিবর্তনীয় রইলো। এ প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রিকাগুলির বন্ধু স্থানীয় সম্পাদকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রেরণায় ও তাগিদে এই সব নিবন্ধাবলী প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বলে তাঁদের কাছেও আমার ঋণ বড় কম নয়। তাই তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আর পাণ্ডুলিপি রচনায় শ্রীমান অশোক কুমার নন্দনের ও আমার পুত্র পল্লবের কথা ভেবে তাদেরও জানাই আশীর্বাদ।

হুগলী জেলার দেব দেউলে প্রকাশিত পৌরাণিক রচনা "রাধাকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন" এবার এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হলো। প্রয়াত বন্ধু শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত "দেবতা তেত্রিশ কোটি" কবিতাটি দিয়ে গ্রন্থের সূচনা করতে পেরে নিজেকে আমি ধন্য বোধ করছি। পরিশেষে, ঋষি অরবিন্দ ভারতের ধর্মকে সতেজ করার বিষয় উল্লেখ করে বলেছিলেন, হিন্দুধর্মের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ বিশ্বধর্মের ভিত্তি; তাই তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্য হিন্দু দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী উৎসৃষ্ট হলো। দেব-দেবীর শাস্ত্রীয় উৎপত্তির কাহিনীগুলি পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের সরল ক্রিয়া কৌমুদী থেকে গ্রহণ করেছি। তাই তাঁর কাছেও আমার ঋণ অপরিশোধ্য। আর সংস্কৃতিবান্ তরুণ শ্রীমান আশিস্ গোপাল মজুমদারের শিরে দেব-দেবীর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এই আমার প্রার্থনা।

সুধীরকুমার মিত্র

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দেবতা তেত্রিশ কোটি ১ / ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ ৩ / রাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন ১০ শ্রীনাম মাহাত্ম্য ১৯ / সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা ৩০ / গীতা শ্লোকের ছন্দ ৪৫ শ্রীহরির বাঙ্ময়ী মূর্তি ৪৬ / শিব মহিমামৃত ৫৩ / শিবরাত্রি ৫৫ / তারকেশ্বর ৫৭ গাজন ৬১ / ঘণ্টেশ্বর ৬৮ / ষণ্ডেশ্বরের গাজন ৭১ / দেবসেনাপতি কার্তিক ৭৫ / সর্ব সিদ্ধিদাতা গণেশ ৮০ / দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ৮৬ / শনিঠাকুর ৮৯ ধর্মশিক্ষা ও ভজনস্থলী ৯২ / পাটবাড়ী ১০০ / সত্যনারায়ণ ১০৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম-সমাজ-মন্ত্র ১১৫ / দুর্গা দশদিকে নব নব রূপে ১২১ / পশ্চিমবঙ্গের মহাপীঠ ১৩৬ / দুর্গাপূজার গোড়ার কথা ১৪৭ / বঙ্গে দুর্গোৎসব ১৫১ / চুঁচুড়ার দুর্গা নব নব রূপে ১৬২ / সেকালের দুর্গোৎসব ১৬৬ / দুর্গাপূজায় কল্যাবৌ ১৮০ মহাভারতে দুর্গার কথা ১৮৫ / বাঙালীর দুর্গাপূজা ১৮৯ / সেকালের সমাজে দুর্গাপূজা ১৯১ / অর্জুনের দুর্গাস্তব ১৯৭ / প্রথম দুর্গোৎসব ২০১ / চিতু ডাকাতের দুর্গাপূজা ২০৪ / প্রাণকৃষ্ণবাবুর দুর্গাপূজা ২১০ / পাণ্ডুয়ার দুর্গোৎসবের শতবার্ষিকী ২১৪ / রঙ্গমঞ্চে প্রথম দুর্গাপূজা ২১৭ / দুর্গাপূজা ॥ সেদিন থেকে এদিন ২২১ /

তৃতীয় অধ্যায়

কালী-কালী-মহাকালী ২২৭ / শাক্ত ও শক্তিবাদ ২৩৩ / ডান-কুনির চামুণ্ডা ২৪১ / তমলুকের বর্গভীমা ২৪৫ / মহানাদের ব্রহ্মময়ী ২৪৯ / জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী ২৫৩ / মা লক্ষ্মীর পূজা ২৫৫ বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী ২৬০ / মা শীতলা দেবী ২৬৬ / মা ষষ্ঠী দেবী ২৬৯ / মা মনসা দেবী ২৭২

দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী

প্রথম অধ্যায়

দেবতা তেত্রিশ কোটি

দেবতা তেত্রি কোটি—
মনসা শীতলা ওলা শনি ষষ্ঠী গন্ধেশ্বরী
সাধ্য নেই গুণে গুণে লিষ্টি পূর্ণ করি…
দেবতা তেত্রিশ কোটি—
তার অর্থ ডাক বাক্স কোটি তেত্রিশ
সবখানে হাতের নাগালে নেই
ব্রহ্মা-বিষ্ণু বড় পোষ্টাফিস
চিঠি যদি ফেলা যায় ছোট বাক্সে ক্ষুদ্র গ্রাম হতে
সেও ঠিক গন্তব্যে পৌঁছায়।
হেন কোন কথা নেই ফেলতেই হবে জি-পি-ও তে
নেই বিধি শাস্ত্র পঞ্জিকায়।
দেবতা তেত্রিশ কোটি—
তার অর্থ প্রত্যেকেরে প্রণাম জানাই
তার অর্থ প্রত্যেকটি মানুষের মাঝে
দেবতা বিরাজে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

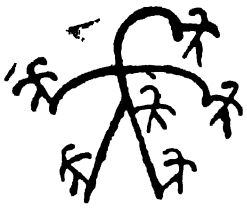

ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ

মানুষের ধর্ম কখনও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে না, ইহাই যুগে যুগে বিশ্বের সমস্ত পণ্ডিতদের দৃঢ় বিশ্বাস। যে ধর্ম মানুষের পক্ষে নিত্য তা উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুতে কখনও আলাদা হবে না। হতে পারে না। নিত্যধর্ম দেশভেদে ও কালভেদে কেবল ভিন্ন নাম ও আকার পেয়েছে, পরে কালের মরুপথ বেয়ে চলতে চলতে মানুষের নিত্যধর্ম বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের অপব্যাখ্যায় বিকৃতরূপ ধারণ করেছে। এ কথাগুলি হচ্ছে ভারতে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনঃরুজ্জীবক ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের। তিনি ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজী বাঙলা, হিন্দী, উর্দু, ফারসী ভাষায় হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করে শতাধিক দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করে সুধী সমাজের প্রশংসা লাভ করেন। শাক্ত বংশের সন্তান, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী এই শক্তিধর মহাপুরুষ ১৮৩৮ সালে ২ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল আচার্যের অভাবে আমাদের বৈদিক ধর্মের উপর যে কালিমা প্রবেশ করেছিল তিনি তা অপনোদনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি যে মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের উজ্জ্বলতম আলোক প্রদর্শন করেছেন বাঙলা দেশে সে সম্বন্ধে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য। ১৯১৪ সালে ২৩শে জুন তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

বেদই ভারতের একমাত্র শাস্ত্র, যে শাস্ত্রের দ্বারা আবহমান কাল থেকে ভারতের কোটি কোটি হিন্দু শাসিত হচ্ছেন। বেদ্ যা বলেন, তা সত্য, তাই কথায় বলে 'বেদবাক্য।' "বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন— কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন" এটি হচ্ছে মহাপ্রভুর কথা। সমগ্র বেদের এই হচ্ছে সারমর্ম। বেদশাস্ত্রের প্রথমতঃ সম্বন্ধ বিচার করলে 'কৃষ্ণ' ছাড়া জীবের কেউ নেই! দ্বিতীয়তঃ 'কৃষ্ণভক্তি' ছাড়া আর অভিধেয় কিছু নেই, আর তৃতীয়তঃ প্রয়োজন বিচারে 'কৃষ্ণপ্রেম' ব্যতীত পৃথিবীতে সবই অসার এই তত্ত্বই বেদে প্রকাশিত হয়েছে। মহাপ্রভুর এই গূঢ়তত্ত্ব বিশেষ মনোযোগের

সঙ্গে অনুধাবন না করলে আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপসিদ্ধান্ত চালিত চিত্তের অন্ধকার কখনও দূর হবে না। তাই তিনি বলেছেন :

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার—জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥"

ভাগবতকথার আচার্য ও উপদেষ্টা ভগবান বেদব্যাসের বেদ সম্বন্ধে নিজের মুখের উক্তি হচ্ছে :

"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃতা ভূজমুচ্যতে।
বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দেবাৎ কেশবাৎপরম্ ॥"

অর্থাৎ দু-হাত তুলে, সত্য সত্য সত্য এই তিন সত্য করে আমি বলছি যে, বেদ হতে শ্রেষ্ঠ আর কোন শাস্ত্র নেই এবং কেশব হতেও শ্রেষ্ঠ নেই আর কোন দেবতা।

আর বেদান্ত হলো ভগবানের বর্তিকা; অন্ধ-অহমিকা ও বন্ধনের মধ্যেও সে পথ দেখাবে, কিন্তু যখন ভিতরে বেদের আলো দেখা দেবে তখন আর সেই বর্তিকার দরকার হবে না, কারণ সেই শাশ্বত সূর্যালোকে জীব সুনিশ্চিত পথে অনায়াসে চলবে।

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা এ, পি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী বলতেন যে, "কৃষ্ণের সাধনা হল ধর্মের পি-এইচ-ডি। আর অন্য সব ধর্ম হল বি. এ, এম. এ ইত্যাদি।"

হিন্দু শাস্ত্রমতে দেবপূজা উপাসনার নিম্নতম রূপ। মানুষের যখন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এইরূপ অনুভূতি হয়, তখন তার সাধক অবস্থা, তখন তিনি সর্বোত্তম অবস্থা লাভ করেন। যতদিন সাধকের মন ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত থাকে ততদিন তার মধ্যম অবস্থা। আর যজ্ঞ ও পূজায় মন যতদিন নিবিষ্ট থাকবে ততদিন তার অধম থেকেও অধমাবস্থা। (কুলার্ণব, ৯ম উল্লাস)

শিব পার্বতীকে বলেছেন : মনের দ্বারা কল্পিত মূর্তি যদি মানবের মোক্ষসাধক হয়, তবে স্বপ্নে রাজ্যলাভ করেও মানুষ রাজা হতে পারে। মাটি, ধাতু, শিলা ও কাঠের নির্মিত মূর্তিতে যাদের ঈশ্বরবোধ হয়, তারা বৃথায় তপস্যা ও পূজা করে ক্লেশ পায়। যথার্থ ঈশ্বরজ্ঞান ছাড়া তারা কখনও মোক্ষলাভ করে না। (মহানির্বানতন্ত্র, ১৪ উল্লাস)

বহু দেবদেবী পূজা করিবে বর্জন।
কৃষ্ণভক্ত বলি সবে করিবে তর্পণ ॥—হরিনামচিন্তামণি

তারপর পূজার পশু বলি যে ধর্ম নয় ও অ-কর্তব্য তা কে অস্বীকার করবে?

কোন পুরুষ দেবতার পূজায় পশু বলির বিধান নেই; পুরুষ দেবতা সব আর্যদের দেবতা। কিন্তু নারী দেবতার পূজায় পশুবলির বিধান অনার্যদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। মাতৃপূজায় এক সন্তান অপর এক সন্তানকে নিজের মনঃকামনা পূরণের জন্য বধ করে কিরূপে তাঁর প্রীতিসাধন করবে? মায়ের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের হাজার রকমের উপায় থাকতে এই তামসিক উপায় অনার্যদের কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেটাই ধর্ম বলে আমরা আজও চালাচ্ছি। মনু বলেছেন: ইহলোকে যার মাংস আমি খাচ্ছ পরলোকে সেই পশু আমার মাংস খাবে। (৫৫।৫ অধ্যায়)

মহাভারতে আছে: মদ্য, মৎস, মধু, মাংস, আসব ও খেচরী প্রভৃতি ধূর্তগণের দ্বারা দেবপূজায় প্রবর্তিত হয়েছে, বেদে ইহা উপদিষ্ট হয় নি। "সুতরাং মৎস্যান মধু মাংসমাসবং কৃষ্ণরোদনম্—ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং হ্যেতন্নৈতদ দেবেষু কল্পিতম্॥" (শান্তিপর্ব ২৬৪ অধ্যায়)

ধর্মই ব্যক্তিকে ও জাতিকে ধারণ করে বা ধরে রাখে, ধর্ম যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মানুষের পতন হয় না। ব্যাসদেব লিখেছেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম দ্বিবিধ —বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করে যে ধর্ম, তাই জৈবধর্ম, আর সেই ধর্ম থেকে পতিত হয়ে, যারা বিপরীত ধর্ম অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার প্রতিমা গঠন করে, তারা আসুর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হন। "বিষ্ণুভক্তি পরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ।" (পদ্মপুরাণ)। তাই যত রকমের পূজাই হোক, শালগ্রাম শিলা ছাড়া কোন পূজাই সিদ্ধ হয় না এবং সকলের আগে "বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণ করে, তবে পুরোহিত যে পূজা করছেন সেই দেবদেবীর মন্ত্র পাঠ করেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব জীব জগতের বেদনার কারুণ্যর তাপে তাপে তাঁর দানলীলা উদ্ভিন্নকরেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ভারতে ধর্মের এই দুরাবস্থা থেকে দেশবাসিকে উদ্ধারের জন্য এর প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হন। তাঁর বাণী আমাদের দেশের সামাজিক ও আধাত্মিক জীবনে আনে এক অভিনব বিপ্লব। তিনি বলেন: "স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়—পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয়॥" মুসলমান রাজত্বে ইসলামের একেশ্বরবাদ যখন প্রবল ভাবে সারা ভারতে প্রসার লাভ করে আমাদের সব ধর্মান্তরিত করছিল, তখন চৈতন্যধর্ম শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এক সুস্পষ্ট একেশ্বরবাদ গড়ে তোলেন বলে হিন্দুধর্ম আসুরধর্মাচার্যদের হাত থেকে তখন রক্ষা পায়। কি কি উপায়ে বেদ সকল শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব স্থাপন করেছেন, তিনি সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে তা শাস্ত্রজ্ঞানহীন

পণ্ডিতদের এগিয়ে এসে সত্যধর্মর দীপ্তিলাভ দেখিয়ে দেন :

শাস্ত্রধর্ম নাহি জানে অধ্যাপনা করে।
গর্দভের প্রায় তারা শাস্ত্র বহি মরে ॥

তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র সর্বেশ্বর, পরমাত্মা তাঁর অংশ, ব্রহ্ম তাঁর জ্যোতি। নারায়ণ তাঁর ঐশ্বর্য বিলাস মূর্তি বিশেষ ব্রহ্ম পরমাত্মা বা নারায়ণের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্বন্ধ কি এই কথা তিনি ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় :

পরম অদ্বয় জ্ঞান বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
চিৎস্বরূপ জগদীশ সদা শুদ্ধসত্ত্ব ॥
গোলক বিহারী কৃষ্ণ সে তত্ত্বের সার।
চতুঃষষ্টি গুণে অলঙ্কৃত রসাধার ॥

শুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণু বা পরব্যোমপতি নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আছে মোট ৬৪টি গুণ। সেই গুণগুলি হচ্ছে (১) সুরম্যাঙ্গ (২) সর্বসল্লক্ষণ-যুক্ত (৩) সুন্দর (৪) মহাতেজা (৫) বলবান (৬) চিরকিশোর (৭) সর্বভাষাবিদ (৮) সত্য বাক্ (৯) প্রিয় বাক্ যুক্ত (১০) বাকপটু (১১) সুপণ্ডিত (১২) বুদ্ধিমান (১৩) প্রতিভা যুক্ত (১৪) সুরসিক (১৫) চতুর (১৬) দক্ষ (১৭) কৃতজ্ঞ (১৮) সুদৃঢ়-ব্রত (১৯) দেশ কাল পাত্রজ্ঞ (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত (২১) শুচি (২২) জিতেন্দ্রিয় (২৩) স্থির (২৪) দান্ত (২৫) ক্ষমাশীল (২৬) গম্ভীর (২৭) ধৃতিমান (২৮) সমদর্শন (২৯) বদান্য (৩০) ধার্মিক (৩১) শূর (৩২) করুণ (৩৩) মানদ (৩৪) সরল উদার (৩৫) বিনয়ী (৩৬) লজ্জাযুক্ত (৩৭) শরণাগতপালক (৩৮) সুখী (৩৯) ভক্তবন্ধু (৪০) প্রেমবশ্য (৪১) সর্বসুহৃৎকারী (৪২) প্রতাপী (৪৩) কীর্তিমান (৪৪) সর্বলোকের অনুরাগ ভাজন (৪৫) সজ্জনপক্ষাশ্রিত (৪৬) নারী মনোহারী (৪৭) সর্বারাধ্য (৪৮) সমৃদ্ধিমান (৪৯) শ্রেষ্ঠ (৫০) ঐশ্বর্যযুক্ত (৫১) সর্বদা স্বরূপ সম্প্রাপ্ত (৫২) সর্বজ্ঞ (৫৩) নিত্য নূতন (৫৪) সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত স্বরূপ (৫৫) নিখিল সিদ্ধিবশকারী (৫৬) অবিচিন্ত্য মহাশক্তি (৫৭) কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ (৫৮) সরল অবতার বীজ (৫৯) হতশত্রু সুগতি দায়ক (৬০) আত্মারামগণের আকর্ষক (৬১) লীলামাধুর্যের কল্লোল সমুদ্র (৬২) প্রেম মাধুর্য (৬৩) রূপমাধুর্য মুরলী গীত গান কারী (৬৪) সর্বশ্রেষ্ঠ চরাচর বিস্ময়কারী ও সৌন্দর্যশালী।

এই ৬৪টি গুণের মধ্যে প্রথম ৫০টি গুণ জীবে বিন্দু বিন্দু রূপে বর্তমান আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ওই সকল গুণ পরিপূর্ণ ভাবে আছে। প্রথম ৫০টি ও

তারপর আর ৫টি অর্থাৎ ৫৫টি গুণ অংশ রূপে মহাদেবাদিতে আছে। তারপরে যে ৫টি গুণের উল্লেখ আছে তাহা ও প্রথম ৫৫টি নারায়ণে আছে। অর্থাৎ নারায়ণে পূর্বোক্ত প্রথম ৬০ টি গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ৬০ টি গুণ ছাড়া আবার শেষের ৪টি অসাধারণ গুণ পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করছে শ্রীকৃষ্ণে। কারণ তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, আর কারও নেই সেই অসাধারণ গুণ।

বিষ্ণুর যে বিভিন্নাংশ দুইত প্রকার।
পঞ্চাশৎ গুন জীবে বিন্দু বিন্দু তার॥
গিরিশাদি দেবে সেই গুণ পঞ্চাশৎ।
তদাধিক পরিমাণে সর্বদা সংযুত॥
তদ্বতীত আর পঞ্চগুণ অংশ মানে।
প্রকাশিত আছে তব বিচিত্র বিধানে॥

শিব প্রভৃতি দেবতার এই পঞ্চাশটি গুণ ছাড়া আর পাঁচটি আংশিক গুণ আছে। অর্থাৎ সেই সকল গুণ বিষ্ণুতত্ত্ব ছাড়া আর কারও পূর্ণ রূপে নেই। তাই বিষ্ণুপূজাতেই সর্বদেবতার পূজা হয়, অন্য দেবের পৃথক পূজা শাস্ত্রানুসারে নিষ্প্রয়োজন।

এ জড় জগতে বিষ্ণু পরম ঈশ্বর।
গিরিশাদি যত দেব তার বিধিকর॥
এক এক দেব এক এক ফলদাতা।
সর্বফলদাতা বিষ্ণু সকলের পাতা॥
শিব-ব্রহ্মা-গণপতি-সুর্য দিকপাল।
কৃষ্ণ শক্তি বলেতে ঈশ্বর চিরকাল॥
অতএব পরমেশ্বর একমাত্র জানি!
আর সব দেবে তাঁর শক্তি মধ্যে গনি॥

বস্তুতত্ত্ববিচারে কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন বস্তু নেই, তাই শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়তত্ত্ব বলে নির্দেশ করেছে। এ বিষয় শ্রীভক্তিবিনোদ লিখেছেন:

প্রথমে শিখায়—পরতত্ত্ব একহরি।
শ্যাম, সর্বশক্তিমান রসমূর্তিধারী॥

অদ্বয় বস্তু নির্দেশও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ দিগ্‌ভেদে বস্তুকে পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন করে থাকেন। যাঁরা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করে বস্তু নির্দেশ করেন, তাঁরা জড় অস্তিত্বের বিপরীত ভাবকে একটি বিশেষ রহিত বস্তু জ্ঞানে

অনুসন্ধেয় বস্তুকে নিরাকার, নির্বিকার, নিঃশক্তি, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বলে সিদ্ধান্ত করেন। তাতে বস্তুর স্বরূপ পাওয়া গেল না। যাঁরা বুদ্ধিযোগে বস্তু অন্বেষণ করলেন, তাঁরা স্বীয় আত্মার অবিরোধী স্বরূপবিশেষ আত্মসহচর পরমাত্মার দর্শন করেন। আর যাঁরা ভক্তিযোগে বস্তু নির্দেশ করেন, তাঁরা সেই অদ্বয় বস্তুর স্বরূপ লাভ করে সর্বৈশ্বর্য, সর্ব-মাধুর্যপূর্ণ, সর্বশক্তিমান একটি পৃথকভূত পরতত্ত্বরূপ ভগবানকে দর্শন করেন।

সহস্র (বিষ্ণু) নামের তুল্য এক রাম নাম।
তিন রামনাম তুল্য এক কৃষ্ণ নাম॥

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অবতারী আর সমস্ত প্রকাশই হচ্ছে অবতার। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর কথা :

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর॥
পুরুষাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশ অবতার॥

কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর বাসনা করলে জীবের কোন বাস্তব কল্যাণ হয় না, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা ও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই তত্ত্বই তার হরিনাম চিন্তামণি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, জৈবধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থে ভাগবততত্ত্বের সেই স্বরূপটি প্রকাশ করেছেন। পাঠক এই সব গ্রন্থ পাঠ করলে পরমার্থ সৌরভ লাভ করবেন।

সচ্চিদানন্দ নামক একটি নিবন্ধে শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক লিখেছেন—

ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনায় উপনিষদের ঋষিদ্রষ্টারা বলেন, তিনি সৎ, তিনি চিৎ, তিনি আনন্দ। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য ৬।২।১)। এই সদ্ বস্তু হতেই সকল সৃষ্টি। এই সৎ স্বরূপ যিনি ছিলেন, আছেন ও কালও থাকবেন তাঁরই পরিচয় অন্য সব উপনিষদেও—'অস্তীতি, স এবাস্য উ ব্রুবঃ (কঠ ২।৩।১২,২।১।১৩), এতদ্বৈতৎ—ইনিই সেই আত্মা। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' (বৃহদারণ্যক), 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ (ঐতরেয়)।

এই সৎ স্বরূপ যিনি সৃষ্টির মূলে, তিনি চিৎ স্বরূপ বা চেতনাযুক্ত। তাঁর ঈক্ষণেই সৃষ্টি। 'স ঐক্ষত (ঐতরেয়)। ব্রহ্মের চিৎস্বরূপতা বা জ্ঞান স্বরূপত্ব তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (২।১।৩) বাক্য নির্দেশিত। তিনিই নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্'। কঠোপনিষদ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ একই ভাষায়

এই চৈতন্যস্বরূপের পরিচয় দেন। ব্রহ্মসূত্রেও পরমাত্মার ও জীবাত্মার এই জাতৃত্ব শ্রুতি বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে।

এই ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপত্বও ঋষিরা জেনেছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি দেখলেন ও বল্লেন, 'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ—বিজ্ঞানময়ের ভিতর আনন্দময় আত্মা। বৃহদারণ্যক বলছেন (৩।৯।২৮।৭) 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'। উপনিষদ গুলিতে বারে বারে এই আনন্দস্বরূপের দর্শন। 'আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডক), 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান, আনন্দ আত্মা তত বৈ সদজায়ত। রসো বৈ সঃ, আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' (তৈত্তিরীয়) আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে ঋষিরা জানলেন।

সৎ চিৎ আনন্দ ভিন্নভাবে ব্রহ্মের বা আত্মার গুণবাচক হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, বহু প্রচলিত উপনিষদগুলিতে এক সঙ্গে সচ্চিদানন্দ বলে কোথাও ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে বর্ণিত হতে দেখা যায় না। তবে দেখা যায় যে এই বিশেষণ বহু শত বৎসর ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ও 'রসো বৈ সঃ' এই সব বচনের মধ্যে সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া গেলেও এবং পরবর্তীকালে ব্রহ্ম সম্বন্ধে ও উক্তিবাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে এই বিশেষণের প্রয়োগ দেখে থাকলেও, ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ দর্শন নিয়ে লিখতে গিয়ে বল্লেন, 'সচ্চিদানন্দ নামকরণ যেমন তাঁর নিজের মৌলিকত্বের পরিচয় দেয় তেমন তাঁর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় দেয়। সচ্চিদানন্দ শব্দটি প্রাচীন উপনিষদে পাওয়া যায় না। (শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৮৯ পৃঃ ১২)

সচ্চিদানন্দ নামকরণে শ্রীঅরবিন্দের মৌলিকত্ব বলা ঠিক মনে হয় না। কারণ তাঁর বহু পূর্ব হতেই ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে সচ্চিদানন্দ নামটি সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত।

কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত ৩২ খানি উপনিষদের মধ্যে কঠ, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতির সঙ্গে পঞ্চব্রহ্ম উপনিষদ ব্রহ্মের অদ্বৈত স্বরূপ, আকাশময় বিগ্রহ প্রভৃতি আলোচনা করে দহর আকাশে যে 'সঃ শিবঃ সচ্চিদানন্দে'র পরিচয় দিয়েছেন তা ব্রহ্মেরই বর্ণনা। শঙ্করাচার্য তাঁর বেদান্তসারে, তত্ত্ববোধ ও ব্রহ্মানুচিন্তন প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার কথা বলেছেন। "সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্য মুক্ত স্বভাবজম্।" "অহং দেবো না চান্যোস্মি ব্রহ্মে বাহং ন শোকভাক্।"

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোত্তরখণ্ডে শিব কবচে শিবের যে বর্ণনা 'নিত্যশুদ্ধ পরিপূর্ণ সাচ্চিদানন্দরূপায়ায়" তা ব্রহ্মেরই বর্ণনা। শিব এখানে ব্রহ্মেরই স্বরূপ।

দেবী ভাগবতে (৫।৮) মহামায়াকে সচ্চিদানন্দরূপিনী বলে বর্ণনা।

চৈতন্যচরিতামৃতে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের কথা। এখানে (আদি ২, মধ্য ২০) ব্রহ্মসংহিতার একটি শ্লোক কয়েক বারই উদ্ধৃত হয়েছে।

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সচ্চিদানন্দের কথাই বার বার বলেন। বেদে ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে ওঁ সচ্চিদানন্দ শিবঃ। পুরাণে ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ। (কথামৃত ৪।১৫) ভাবে বিভোর হয়ে বলেছেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না।" (৪।১৩।৩)। যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই কালী (৪।১২।২) সচ্চিদানন্দ নামে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তায় পরম শক্তিমান বা ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি বহুকাল ধরেই চিন্তিত ও বর্ণিত হয়ে এসেছেন।

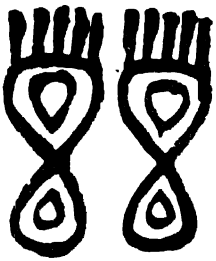

রাধাকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন

ভারতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের চরণের প্রতিকৃতি চন্দন দিয়ে প্রত্যহ অঙ্গে ধারণ করেন। কারণ নানাবিধ কামনা বাসনার প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিচলিত ভবসাগরে নিমগ্নপ্রায় মানুষের একমাত্র ভরসা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ। যাঁরা দিনরাত শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণাগতি লাভ করা খুব সহজ ও অনায়াসসাধ্য হয় এবং শ্রদ্ধাভক্তি-প্রীতি তাতে সঞ্জীবিত ও বর্ধিত হয় ও আরও পুষ্টিলাভ করে। রাধাকৃষ্ণের চরণ চিন্তা অব্যাহত রাখার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সুধীবৃন্দ কৃষ্ণচরণ প্রতিকৃতির, চন্দন-ছাপ সর্বাঙ্গে ধারণ করেন।

এই সব বৈষ্ণব কারা? তদুত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' একবার বলেছেন :

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তাঁর পরম সম্মান॥

প্রত্যেক মানুষের হাতে ও পায়ের তলায় নানাপ্রকার রেখা ও চিহ্ন আছে। হস্তরেখাবিদ্ জ্যোতিষীরা সেই সব রেখা দেখে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বিচার করেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ মূর্তিধারী পরমেশ্বর। তাই তিনি আদি ও গোবিন্দ এবং তিনি সকল কারণের কারণ ও তিনিই অনাদি। "পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—তাঁতে বড, তাঁর সম, কেহ নহে আন।" ব্রহ্মসংহিতায় আছে :

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম্ ॥

যাবতীয় নামের মধ্যে একমাত্র 'কৃষ্ণ' নামই ভগবানের সর্বপ্রধান নাম এবং অন্য যে কোনো দেবদেবীর নাম এই সচ্চিদানন্দ মূর্তিধারী কৃষ্ণ নামেরই অন্তর্গত এবং সমস্ত অবতারাদিও কৃষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত! মহাপ্রভুও বলেছেন :

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্ব অবতংস ॥

যেমন সমুদ্রপ্রবাহ অনন্ত, সেই রকম ভগবতলীলারও আদি-অন্ত নেই—উহা নিত্য এবং বিরাম বিরহিত। কিন্তু যত লীলা আছে, সেই সবই শ্রীকৃষ্ণে বর্তমান আছে। কৃষ্ণে স্বরূপতত্ত্ব, মাধুর্য, ভক্তি ও রসতত্ত্ব সবই একত্রে বিদ্যমান।

শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌স্বয়ম্" এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য" এই সব উক্তি থেকে কৃষ্ণই যে 'পরমেশ্বর' সেই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসম্মত ভাবে ধর্মমত বলে স্থিরীকৃত হয়েছে, তাই রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন মন্দির শিব মন্দিরের পরেই বাঙলায় স্থানলাভ করেছে দেখা যায়।

তিনি যখন নরদেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর দেহের আকৃতি কেমন ছিল, সে বিষয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এ চিত্রে অনেক কিছু বিধৃত আছে দেখা যায়। "কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা" তাই তাঁর চরণযুগল যাবতীয় পাপ নিবর্তক ব'লে এখানে তাঁদের দুজনেরই চরণ-চিহ্ন নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা ও ব্যাখ্যা করবো।

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ চোদ্দ আঙুল পরিমিত দীর্ঘ ও ছয় আঙুল পরিমিত বিস্তৃত বলে মৎস্যপুরাণে লেখা আছে। রাধাকৃষ্ণের উভয়ের চরণে উনিশটি চিহ্ন আছে। এই চিহ্ন কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে ও রাধার বাম চরণে আছে এগারটি। আর কৃষ্ণের বাম চরণে ও রাধার দক্ষিণ চরণে আছে আটটি।

শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণতলে (১) যব (২) চক্র (৩) পদ্ম (৪) ঊর্ধ্বরেখা (৫) অঙ্কুশ

(৬) ছত্র (৭) ধ্বজ (৮) বজ্র (৯) স্বস্তিক (১০) জম্বুফল (১১) অষ্টকোণ এবং বাম চরণতলে (১) শঙ্খ (২) অম্বর (৩) ধনু (৪) গোষ্পদ (৫) কলস (৬) ত্রিকোণ (৭) অর্ধচন্দ্র ও (৮) মৎস্য এই উনিশটি চিহ্নের সমাবেশ দেখা যায়।

শ্রীরাধিকার দক্ষিণ চরণতলে (১) শঙ্খ (২) পর্বত (৩) গদা (৪) বেদী (৫) রথ (৬) কুন্তল (৭) শক্তি (৮) মৎস্য এবং বাম চরণতলে (১) যব (২) চক্র (৩) কমল (৪) ঊর্ধ্বরেখা (৫) অঙ্কুশ (৬) ধ্বজ (৭) ছত্র (৮) বলয় (৯) বল্লী (১০) পুষ্প (১১) অর্ধচন্দ্র এই উনিশটি চিহ্ন আছে। শ্রীরাধার চরণে এই ঊনবিংতি রেখা-রূপা মহালক্ষ্মীগণ সব সময় রাধিকার চরণসেবন করে থাকেন বলে 'রূপচিন্তা-মণিতে' দেখা যায়। "তাং রাধাং চিরমুবিংশতি মহালক্ষ্যাচ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে।'

শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে কোথায় কোন্ চিহ্নের সমাবেশ আছে তা পদ্মপুরাণে লেখা আছে। তাঁর দক্ষিণ চরণের মাঝখানে আছে ধ্বজা। শরণাগত ভক্তগণকে অভয়দান করবার জন্য তিনি নিজ চরণে রাষ্ট্রশক্তি নির্দেশক লক্ষণস্বরূপ ধ্বজা চিহ্ন ধারণ করেছেন। আর মাঝের আঙুলের অগ্রভাগ থেকে তিন আঙুল নীচে ধ্বজার ঠিক উপরে আছে পদ্ম। পদতলে পদ্ম এই সৌভাগ্যসূচক চিহ্ন থাকলে লোকে বহু ধনশালী হয় এবং ভগবান তাই ভক্তগণের মনোভ্রমরকে মোহন করবার জন্য, তাঁর চরণে পদ্মচিহ্ন ধারণ করেছেন। পদ্মপুরাণে আছে :

"মধ্যে ধ্বজাতু বিজ্ঞেয়া পদ্মং ত্র্যঙ্গুলমানতঃ।
বজ্রং হৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অনশ্চৈব তদগ্রতঃ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু বলে তাঁরও উভয় চরণে বত্রিশটি চিহ্ন ছিল বলে জানা যায়। এ সম্বন্ধে 'বৈষ্ণবাচার দর্পণে' শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ চিহ্নের যে বিবরণ আছে তা উদ্ধৃত হলো :

দক্ষিণ চরণ চিহ্ন :

শ্রীশচীনন্দন হরির দক্ষিণ চরণ।
অমলকমল সম স্মর মোর মন॥
ছত্র (১) শক্তি (২) যব (৩) বজ্র (৪) অঙ্কুশ (৫) কুন্তল (৬)।
বেদী (৭) গদা (৮) রথ (৯) চারি (১০) জম্বুফল (১১)॥
অষ্টকোন (১২) স্বস্তিক (১৩) আর চারিটিকমল (১৪)।
সুবিমল ঊর্দ্ধরেখা (১৫) বিশুদ্ধ অচল (১৬)॥
এই ষোল চিহ্নযুক্ত দক্ষিণ চরণ।
গৌরাঙ্গসুন্দরে সর্বভাব প্রকটন॥

গৌর বিশ্বম্ভর পরিপূর্ণ ভগবান।
তাঁর পাদপদ্ম স্মর ভাগ্যবান ॥

বামচরণ চিহ্ন :

যাহাতে আকাশ (১) শংখ (২) কমণ্ডল (৩) ধ্বজ (৪)।
অর্দ্ধচন্দ্র (৫) চক্র (৬) লতা (৭) আর পুষ্প স্রজ (৮) ॥
জ্যাবিহীন ধনু (৯) আর ত্রিকোণ (১০) বলয় (১১)।
গোষ্পদ (১২) কমলপুষ্প (১৩) কুম্ভ চতুষ্টয় (১৪) ॥
মৎস্য (১৫) আর কুর্ম (১৬) এই বৈষ্ণব লক্ষণ।
সর্বদোষ অপরাধ পাপ নিকৃন্তন ॥

শ্রীকৃষ্ণের পদ্মের দক্ষিণ পাশে আছে বজ্র, আর তার অগ্রভাগে আছে অঙ্কুশ। পাপরূপ পর্বত চূর্ণ করবার জন্য বজ্র এবং হাতির মাথায় খোঁচা দেবার জন্য আঁকশির মুখের মতো লোহার সূক্ষ্মাগ্র বক্র মুখকে বলা হয় অঙ্কুশ। সেই অঙ্কুশচিহ্ন ভগবান ভক্তদের মদোমত্ত হাতিকে বশীকরণ করার জন্য ধারণ করেছেন।

এর পর বুড়ো আঙুলের নীচে আছে যব ও যেখানে সন্নিবিষ্ট হলে চরণের শোভাবর্ধন হয়, সেখানে আছে স্বস্তিক চিহ্ন। সর্বসম্পদ লাভ সূচনার জন্য যব চিহ্ন এবং শরণাগতজনের শুভসূচক স্বস্তিক চিহ্ন তাদের স্বস্তিলাভ সূচনা করবার জন্য ভগবান ধারণ করেছেন।

স্বস্তিক সম্বন্ধে 'স্কন্দপুরাণে' কার্তিক প্রসঙ্গে লেখা আছে : যিনি ভগবান কেশবের সামনে মাটি অথবা বিবিধ ধাতু বিকার দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র সর্বতোভদ্র প্রভৃতি মণ্ডল রচনা করেন, তিনি একশত কল্পকাল স্বর্গে বাস করেন। যিনি শালগ্রাম বিগ্রহের সামনে বিশেষতঃ কার্তিক মাসে শুভ স্বস্তিক রচনা করেন, তিনি সাতপুরুষ পর্যন্ত কুল পবিত্র করেন। যে নারী রোজ ভগবান কেশবের সামনে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি সাতজন্মের মধ্যে কখনও বৈধব্য যন্ত্রণা লাভ করেন না। যে নারী গোময় গ্রহণ করে ভগবান কেশবের আগে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি কখনও পতিপুত্র ও ধনের বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন না। যিনি বিষ্ণুর প্রাঙ্গন বিচিত্র বর্ণে বিচিত্রিত ও স্বস্তিক চিহ্ন দিয়ে ভূষিত করেন, তিনি ত্রিভুবনে পরমানন্দে বিহার করেন। "শ্রীচৈতন্যভাগবতে" দেখা যায় যে চৈতন্যজায়া নরতনুধারিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রত্যহ প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত কাজকর্ম একাকিনী নিজের হাতে সম্পাদন করতেন। তাঁর দৈনিক আচরণ ও পূজার বর্ণনার মধ্যে তিনি প্রত্যহ তাই স্বস্তিক মণ্ডলী রচনা করতেন

বলে জানা যায়। যথা :

উষাকাল হইতে লক্ষ্মী যত গৃহ কর্ম।
আপনে করেন সব এই তাঁর ধর্ম॥
দেবগৃহে করেন যে স্বস্তিক মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লেখেন হইয়া কুতুহলী॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল॥

এই স্বস্তিক চিহ্ন রচনার নিয়ম হচ্ছে, বিষ্ণুপূজক মন্দিরের মধ্যে ঈশান, বায়ু, নৈঋত ও অগ্নি এই চার কোণের চারটি চতুষ্কোণকে ষোলভাগ করে শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণ চূর্ণদ্বারা লেপন করবেন।

বুড়ো আঙুল ও মাঝের আঙুলের মধ্যভাগ থেকে চরণের মাঝখান পর্যন্ত ভক্তগণের ঊর্ধ্বলোকপ্রাপ্তি সূচনা করবার জন্য ভগবান ঊর্ধ্বরেখা ধারণ করেছেন! আঙুলের অগ্রভাগ থেকে আট আঙুলের নীচে আছে অষ্টকোণ। শরণাগত ভক্তবৃন্দের অষ্টদিক রক্ষা অর্থাৎ পূর্ব, ঈশান, উত্তর, বায়ু, পশ্চিম, নৈঋত, দক্ষিণ, অগ্নি,—এই আট দিক দিয়ে কোনো বিপদ যাতে না আসে এবং শরণাগতদের অষ্টসিদ্ধি—অনিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য ইঙ্গিত, বশিত্ব প্রাপ্তির সূচনার জন্য অষ্টকোণ চিহ্ন ধারণ করেছেন।* তিনিই তাঁর শরণাগত ভক্তগণকে সব রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, ইহা জ্ঞাপনার্থে তিনি ছত্র চিহ্ন ধারণ করেছেন। ইহার অর্থ ত্রিতাপতপ্ত জীব তাঁর ছাতার নীচে থাকলে সবরকম ক্লেশ ও দুঃখের হাত থেকে নিবৃত্তি লাভ করে।

---

*অণুর মতো ক্ষুদ্র হতে পারার নাম অনিমা, অনিমার দ্বারা এত ছোট হওয়া যায়, যে পাথরের মধ্যেও প্রবেশ করা যায়; খুব হালকা হতে পারার নাম লঘিমা, লঘিমাসিদ্ধি লোক এত হালকা হতে পারে যে. সূর্যকিরণ ধারণ করে উপরের দিকে উঠে যেতে পারে। খুব বড় হতে পারার নাম মহিমা, মহিমাসিদ্ধ লোক নিজের দেহকে পাহাড়ের মতো বড় করতে পারে। যে সিদ্ধির প্রভাবে যখন যা ইচ্ছা স্পর্শ করতে পারা যায়, তার নাম ঈশিত্ব; যে সিদ্ধির দ্বারা ভূত-ভৌতিকের সৃষ্টি আদি করা যায়, তার নাম ঈশিত্ব, যে সিদ্ধির দ্বারা সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারা যায় তার নাম প্রকাম্য,—আর যে সিদ্ধি দ্বারা যেমন সঙ্কল্প তেমনি কাজ করা যায় তাকে বলে গরিমা বা কামবলয়িতা গরিমাসিদ্ধ লোক দগ্ধ বীজ থেকেও অঙ্কুর উৎপাদন করতে পারেন।

অবিদ্য, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই হচ্ছে পঞ্চক্লেশ।

ছত্রের উপরে আছে চক্র আর নীচে আছে জম্বুফল। চক্রের কাজ হচ্ছে ছেদন, নিপাতন, ভ্রামণ ও শাস্তিকরণ। তাঁর শরণাগত ভক্তগণকে রক্ষা করার জন্যই তাঁর চক্র চিহ্ন ধারণ। এই চক্র হচ্ছে প্রাচীন ভারতের একটি যুদ্ধাস্ত্র। রত্নমালায় ইহা কুন্তলাকার, প্রান্তভাগ উত্তম কোণযুক্ত ও ধারালো, নীল জলের ন্যায় তাঁর বর্ণ এবং মণ্ডল পরিমাণে দুই প্রাদেশ বলে লেখা আছে। ভগবান তাঁর চরণে জম্বুফল চিহ্ন ধারণ করে ঘোষণা করেছেন যে, জম্বুদ্বীপ-বাসিগণের পক্ষে তাঁর চরণই একমাত্র উপাস্য। জম্বু দ্বীপ হচ্ছে সপ্তদ্বীপের অন্যতম ভারতবর্ষ।* নীল পর্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তরে অবস্থিত সুদর্শন নামে জম্বুবৃক্ষ থেকে দ্বীপের নাম হয় জম্বুদ্বীপ। প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর এই হচ্ছে সপ্ত দ্বীপ।

শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণের আঙুলের অগ্রভাগ থেকে চার আঙুল নীচে আছে নানা বর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রধনু অর্থাৎ শক্রধনু এবং তার অধোভাগে দ্বিধুরযুক্ত গোষ্পদ-চিহ্ন আছে। তাঁর চরণে শরণাগতগণের ভবসাগর গোষ্পদ তুল্য হয়। এই চিহ্নে এই তত্ত্ব জানা যায়। ইন্দ্রধনু ও গোডালির মাঝখানে ও বুড়ো আঙুল থেকে আট আঙুল নীচে ত্রিকোণ চিহ্ন এবং চরণের যথাযোগ্য শোভাবর্ধনের জন্য উপযুক্ত স্থানে আছে কলস চিহ্ন। ইহা অর্ধচন্দ্রের দুই কোন ও ত্রিকোণের প্রান্তভাগে সংলগ্ন। শ্রীভগবানের চরণই হচ্ছে—ত্রিগুণাপ্রকৃতি এবং ঊর্ধ্ব মধ্য ও অধঃ এই ত্রিলোকের আশ্রয়। দেব, তির্যক ও নর—এই ত্রিবিধ জীবের পক্ষে তাঁর চরণই একমাত্র আরাধ্য। মুক্ত, মুমুক্ষ ও বিষয়ী এই ত্রিবিধগণের তাঁর চরণই ইষ্ট এবং কায়, মন ও বাক্য এই তিনের দ্বারা তাঁর চরণই একমাত্র আরাধ্য—এই সমস্ত গূঢ়তত্ত্ব সূচনা করার জন্যই চরণতলে ভগবান ত্রিকোণ চিহ্ন ধারণ করেছেন। তাঁর শ্রীচরণ জীবের অমৃতত্ব পাওয়ার উপায়—ইহা জ্ঞাপন করার জন্য পদতলে তিনি অমৃত কলস চিহ্ন ধারণ করেছেন।

ত্রিকোণং মধ্য নির্দিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিৎ।
অষ্টাঙ্গুল প্রামাণেন তদ্ভবেদর্ধচন্দ্রকং॥—পদ্মপুরাণ

এই সমস্ত চিহ্নের উপরে অশ্বর চিহ্ন, একবারে নীচে প্রায় গোডালির কাছে

---

*The Sanscrit name of the country between the Himalaya and the Vindhya mountains is Yambudwipa or Bharatkhanda (History of India By Thomas Keightley. Kondon, 1847)

সন্নিবিষ্ট আছে মৎস্য চিহ্ন। অম্বর চিহ্নে একটি বাহ্যমণ্ডল ও একটি অন্তর্মণ্ডল থাকে। অম্বর অর্থাৎ আকাশের মতো শ্রীভগবানের চরণ সর্বব্যাপী হলেও যে নির্লিপ্ত, চরণের অম্বর চিহ্ন থেকে এই তত্ত্বটি জানা যায়। কামধ্বজ মৎস্য তাঁর চরণ তলে থাকায় জানা যায় যে, তাঁর চরণই একমাত্র সকল প্রকার কামনা পূরণ করতে সমর্থ। বুড়ো আঙুলের নীচে শুভ সূচক শঙ্খ চিহ্ন ধারণ তাঁর ভক্তগণকে তিনি যে সদাসর্বদা সর্বরকম মঙ্গল করেন—ইহাই জ্ঞাপন করছে। নানা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন সম্বন্ধে নানা রকম বিচার ও চিহ্ন সমাবেশের প্রণালী, ভক্তগণ যাতে শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণাগতি লাভ করতে পারেন, তাই সন্নিবেশিত আছে।

শ্রীরাধিকার পূজা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের অর্চনার অধিকার থাকে না। তাই বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রথমে শ্রীরাধার অর্চনা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য "কৃষ্ণস্যারাধনাধিকারো যতো রাধার্চনং বিনা" এই কথা দেবীভাগবতে আছে। তাঁকে অর্চনা করলে জীবের স্বরূপ ভক্তি প্রীতি পুষ্টিলাভ করে।

রাধা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার একান্ত অধীন। তিনি ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্যও জীবনধারণ করতে পারেন না, তাই "শ্রীরাধায়ৈস্বাহা" এই ষড়ক্ষর মূলমন্ত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্যন্ত নিয়ত উপাসনা করে থাকেন। এই মন্ত্রের দ্বারা মানুষের সবরকম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সহস্রকোটি মুখ এবং শতকোটি জিহ্বা লাভ করলেও "শ্রীরাধায়ৈস্বাহা" এই মন্ত্রের মহিমা বর্ণনা করা যায় না বলে দেবীভাগবতে লেখা আছে।

ষড়ক্ষরো মহামন্ত্রো ধর্মাদ্যর্থ প্রকাশকঃ।
মায়াবীজাদিকশ্চায়াং বাঞ্ছা চিন্তামণিঃ স্মৃত ঃ॥
বক্ত্র কোটি সহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি।
এতন্মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈবশক্যতে॥

মহাবিরাট থেকে ক্ষুদ্র কীট পর্যন্ত সমস্ত চরাচর রাধাকৃষ্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁদের প্রতি অচলাভক্তি থাকলে মানুষের অনায়াসে সংসার বন্ধন হতে মুক্তিলাভ হয়, তাই তাঁদের প্রসন্নতার জন্য জীবের রাধাকৃষ্ণের চরণচিন্তা একান্ত কর্তব্য। চরিত্রামৃতকারের কথায় :

তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাহার চরণে প্রীতি—"পুরুষার্থ সার"॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "রূপচিন্তামণি" গ্রন্থে রাধিকার বাম চরণে ছত্র, চক্র ধ্বজা, লতা, পুষ্প, বল্লী, বলয়, উর্ধ্বরেখা, অঙ্কুশ, অর্ধচন্দ্র এবং যব এই এগারটি চিহ্ন এবং দক্ষিণ চরণে শক্তি, গদা, রথ, বেদী কুন্তল, মৎস্য, পর্বত ও শঙ্খ আটটি চিহ্নের উল্লেখ করেছেন।* শ্রীমৎ রূপগোস্বামীর 'আনন্দচন্দ্রিকা' টীকায় শ্রীরাধিকার পদচিহ্নের স্থানও নির্দেশ করা আছে। তিনি লিখেছেন : শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন সমাবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করলে জানা যায় যে, শ্রীরাধিকার বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যব, তার নিম্নভাগে চক্র, তার নিম্নভাগে বলয়। তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠসন্ধি হতে আরম্ভ করে অর্ধচরণ পর্যন্ত উর্ধ্বরেখা। মধ্যমা তলে কমল, কমলতলে পতাকাসহ ধ্বজা। কনিষ্ঠ তলে অঙ্কুশ। পাঞ্চিতে অর্ধচন্দ্র তার উপরে বল্লী এবং পুষ্প এই একাদশ চিহ্ন। শ্রীরাধিকার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ। কনিষ্ঠা তলে বেদি, তার তলে কুন্তল, তর্জনী এবং মধ্যমার তলে পর্বত। গোড়ালিতে মৎস্যের উপরিভাগে রথ এবং রথের উভয় পার্শ্বে শক্তি ও গদা এই অষ্টচিহ্ন। শ্রীরাধিকার উভয় চরণের চিহ্ন ও গণনায় উনবিংশতি।

শাস্ত্রবচনে যে ভাবে রাধাগোবিন্দের চরণ চিহ্নের সমাবেশ হয়েছে, তাতে দুজনেরই চরণের চিহ্ন হচ্ছে গননায় উনিশটি। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ এবং শ্রীরাধার বাম চরণে এগারটি ও শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণে এবং রাধার দক্ষিণ চরণে আটটি চিহ্নের সমাবেশ দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণের বাম ও দক্ষিণ চরণের এগারোটি চিহ্নের মধ্যে ছয়টি চিহ্ন ও উহাদের দক্ষিণ ও বাম চরণের আটটির মধ্যে দুটি চিহ্ন রাধাকৃষ্ণের উভয়ের চরণেই বিদ্যমান আছে। সেগুলি হচ্ছে : (১) ধ্বজ, (২) অঙ্কুশ, (৩) যব, (৪) উর্ধ্বরেখা, (৫) ছত্র, (৬) চক্র এবং (১) মৎস্য ও (২) শঙ্খ। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার উভয়ের পদচিহ্নের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, কিন্তু রাধিকার চরণতলে বল্লী, বলয় ও পর্বত, কুন্তলের তাৎপর্য যে কি তা বর্ণিত হয়নি। কাজেই আমার

---

*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকায় শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীরাধার বামচরণে সাতটি চিহ্ন ও দক্ষিণ চরণে আটটি চিহ্ন আছে বলে উল্লেখ করেছেন। মধ্য-লীলা (৩য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা ১১২৮ দ্রষ্টব্য। রাধাগোবিন্দবাবুর মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না; কারণ শ্রীমদ রূপ গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উভয়েই শ্রীরাধার চরণতলে যথাক্রমে এগারটি ও আটটি মোট উনিশটি চিহ্নের কেবল নাম উল্লেখ করেননি, তাঁদের গ্রন্থে সেগুলির স্থান নির্দেশও করে গেছেন।

ভ্রম প্রমাদাদি পূর্ণ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কল্পনা করে ওই চিহ্নগুলির তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো না। শ্রীরাধিকার চরণের ছাপও চন্দন দ্বারা অঙ্গে ধারণ হুগলীর বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে। কারণ মূল প্রকৃতি প্রাণাধিষ্ঠাত্রী রাধার শক্তিতেই জগতের উৎপত্তি হয়েছে। এবং মূল প্রকৃতি ভুবনেশ্বরী প্রসন্ন না হলে জীবের মুক্তির আর কোনো উপায় নেই।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান। তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—তাঁর সমান বা তাঁর থেকে অধিক আর কেউ নেই। তিনি স্বীয় পরমানন্দরূপে পরিপূর্ণকাম। শ্রীকৃষ্ণমূর্তি পরম অপূর্ব এবং তাঁর আনন্দময় ও চিন্ময় বিগ্রহ পূর্বসিদ্ধ এবং সৎ-চিৎ-আনন্দ লক্ষণযুক্ত। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে:

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণসর্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্বশাস্ত্রে কয়॥

তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহধারী—এর কারণ বলা হয়েছে 'চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর'—'সৎ' শব্দের দ্বারা নানাভাবোপলক্ষিত স্বরূপ বুঝায়। যাহা মিথ্যা ও শূন্য নয় এবং যা কোনো রকমের বাধা প্রাপ্ত হয় না, তাই সৎ। অব্যভিচারে সর্বসময় যা বর্তমান থাকে, এবম্ভূত সত্যস্বরূপ নিত্য বস্তু হচ্ছে সৎ। শ্রীকৃষ্ণমূর্তি সত্য ও নিত্য তাই সৎস্বরূপ। 'চিৎ' শব্দের দ্বারা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ বুঝায়। যা স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ অন্যের সাহায্য ছাড়া নিরপেক্ষভাবে নিত্য প্রকাশমান থেকে অপরাপর বস্তুসমূহকে প্রকাশ করে, তাই চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান। এই চিৎ বিশ্লেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানস্বরূপতা নির্ণীত হলো। 'আনন্দ' বলতে পরম সুখস্বরূপ বুঝায়। সর্বপ্রকারে অহেতুকী পরম প্রেমাস্পদই আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আনন্দস্বরূপ। তাঁর সম বা উর্ধ্ব কেউ নাই। ইহা অপ্রাকৃত গুণাগুণবিশিষ্ট। সৎ-চিৎ-আনন্দ এই ত্রিবিধ গুণ তাঁর একই বিগ্রহে অবস্থিত বলে তাঁকে "সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ—একই বিগ্রহে তিহো ধরে তিন রূপ" বলে মহাপ্রভু বর্ণনা করেছেন।

রাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্নের মতন তিলক কাটাও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রীতি। ১৯১১ সালে সেনসাস রিপোর্টে মিঃ এল, এম, এস, ওম্যালি সাহেব The Insignia of Hindu Sects নামক নিবন্ধে সারা ভারতে বৈষ্ণবদের কপালে ৪০টি তিলকচিহ্নের চিত্র দিয়ে বলেছেন "The Vaishna : as are strict about the wearing of the tilak, a devout Vaishna infact rarely omits to mark all 12 parts of the body,

বিশ্বের যাবতীয় ভাব প্রাকৃত, ত্রিগুণজাত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অসৎ। তাই নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকথা গুণী, জ্ঞানী, ভক্ত, মুনি, ঋষি, যোগী, সাধু সন্ন্যাসী ও রসিক ব্যক্তিগণ সব সময় পরমার্থিক উন্নতির জন্য শ্রবণ ও কীর্তন করেন। 'শ্রবণ-কীর্তনে মিলে ভক্তি নিরমল' আমিও সেই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকথা আজ কীর্তন করে ধন্য ও কৃতার্থ হলাম। কারণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে :

বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্বা জল দিলে মাত্র।
কভু যম তান অধিকারে নহে পাত্র॥
যাঁহার চরণ-রসে শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি জড়ালে সে কৃষ্ণ পায়॥

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন :

"নাম ভিন্ন কলিযুগে নাহি আর ধর্ম।
সর্বশাস্ত্র-সার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম॥"

তাঁর শ্রীমুখের এই কথা শুদ্ধভক্তি প্রচার-ভাগীরথীর ভগীরথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সমগ্র শাস্ত্র মন্থন ক'রে যে সব অকাট্য প্রমাণসহ তাঁর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত শতাধিক গ্রন্থে গবেষণা করে প্রচার করেছেন, তা আজ পর্যন্ত বাঙলাভাষায় কোন লেখক কোন গ্রন্থে প্রদর্শন করেন নি। আমরা মানুষ—সামাজিক জীব। বিশ্বের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবনের সংযোগ-সূত্রটি খুঁজে

না পেলে আমাদের কখনও নিবৃত্তি ঘটে না। পশুর জীবন থেকে আমাদের জীবনের এই হচ্ছে তফাৎ। আমাদের এই স্বরূপধর্ম উজ্জীবিত হয় একমাত্র নামের কৃপায় এবং তখনই আমরা নিত্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হই। নামের সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত যুক্ত হলে নামের মূলে যিনি নামী, তাঁর শক্তি আমাদের এই মর্ত-জীবনেই অমৃতের স্পর্শ দান-করে ; এবং তিনি নিজে বৃহৎ বলে আমাদের বড করে দেন ('বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ')। একমাত্র নামেই আমাদের সকল পিপাসার নিবৃত্তি ও পরমার্থ-সিদ্ধির উপায়।

অসীম কৃপাময় এই নাম। নামীর চেয়ে অধিক কৃপা নামের। সকল সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে হ'লে শ্রদ্ধা দীক্ষা পুরশ্চর্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু নাম এ সকলের অপেক্ষা করে না। সম্বন্ধ মাত্রেই নামের কৃপাশক্তি আমাদের প্রাণে কার্যকরী হয়। নামামৃত এক বাগিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হয়ে মধুর রসে সব ইন্দ্রিয়কে প্লাবিত করে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই নামের মহিমা সুললিত পয়ারছন্দে সবল ও সহজভাবে যা লিখেছেন তা আর কোথাও দেখা যায় না। যথা :

স্মৃতি কহে, হেলায় শ্রদ্ধায় নাম লয়।
কৃষ্ণ তাঁরে কৃপা করি' হয়েন সদয়॥
নামেব সদৃশ জ্ঞান নাহিক নির্মল।
নামের সদৃশ ব্রত নাহিক প্রবল॥
নামের সদৃশ ধ্যান নাহি এ জগতে।
নামের সদৃশ ফল নাহি কোন মতে॥
নামের সদৃশ ত্যাগ কোনরূপে নয়।
নামের সদৃশ সম কভু নাহি হয়॥
নামের সদৃশ পুণ্য নাহি এ সংসারে।
নামের সদৃশ গতি না দেখি বিচারে॥
নামই পরম-মুক্তি, নাম উচ্চগতি।
নামই পরম-শান্তি, নাম উচ্চস্থিতি॥
নামই পরমভক্তি, নাম শুদ্ধা মতি।
নামই পরমপ্রীতি, নাম পরা স্মৃতি॥
নামই কারণ তত্ত্ব, নাম সর্ব প্রভু।
পরম আরাধ্য নাম গুরুরূপে বিভু॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নামের বিষয়ে যা বলেছেন, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর—'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' তা বর্ণনা করেছেন। "প্রভু কহে—হরিনাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥" মহাপ্রভু শুধু সূত্র বা ফরমূলা দিয়েছেন। কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শাস্ত্র থেকে সূত্রের সব প্রমাণ উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন :

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্বান্নামনামিনোঃ॥'

তিনি বলেছেন : "এই নাম জড়জগতে মহাসৌভাগ্যবান্ পুরুষদিগের জিহ্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্বশক্তিসম্পন্ন—মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই জড়জগতে বর্তমান জীববৃন্দের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই।"

কলিযুগে পরমার্থ-লাভের সহজ উপায় যে নামসঙ্কীর্তন, এ কথা মহাভারতে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবও বলেছেন, দেখা যায়। তিনি বলেছেন—'হরি' এই দুটি অক্ষর জীবনরূপ দুর্গম পথের পাথেয়স্বরূপ (প্রাণকান্তারপাথেয়ং), সংসার রূপ ব্যাধির মহৌষধি (সংসারচ্ছেদভেষজম্) এবং দুঃখশোক হ'তে পরিত্রাণদাতা (দুঃখশোকপরিত্রাণাম্)।

হরিনাম-কীর্তনে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ বিনষ্ট হয়; ইহকাল-পরকালের পাপরাশি সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হয়ে যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁর শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকের প্রথম শ্লোকে তাই বলেছেন—"হে হরিনাম, আমি তোমাকে সর্বতোভাবে এবং সম্যগরূপে আশ্রয় করি (পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি)।"

সাধক প্রেমানন্দের উক্তি :

"কহে দাস প্রেমানন্দ, বিচারিলে সব ধন্ধ,
কহিলে শুনিলে কিবা হয়।
'হরি' 'হরি' অবিরত, গাহে এই প্রেমগীত,
সুনির্মল হইবে হৃদয়॥"

এ বিষয়ে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখেছেন :

"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
'হরি' 'হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥"

বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের ব্যাখ্যা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে

এই উক্তির মাধুর্য আস্বাদন করতে গিয়ে প্রেমিক ভক্তগণ বলেন, প্রথম 'হরি' হলেন—কৃষ্ণহরি, আর দ্বিতীয় 'হরি' হলেন গৌরহরি। 'কৃষ্ণহরি' জীবের সংসার নাশ করেন, আর গৌরহরি দেন 'প্রেমভক্তি'। গৌরহরির এই কৃতিত্ব পৃথিবীর ধর্মজগতের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ বলা যায়।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই হরিনাম সম্বন্ধে যে শতাধিক প্রমাণ শাস্ত্র থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন, তাঁর সেই গবেষণালব্ধ প্রমাণগুলি একত্রিভূত করে যে কেউ 'থিসিস' দিলে ডক্টর উপাধিতে তিনি অবশ্যই ভূষিত হবেন। এখানে তাঁর উদ্ধৃতির কয়েকটি মাত্র কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মূল সংস্কৃত না দিয়ে কেবল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করছি।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ-মতে শ্রীহরিনামে যত পাপ-নাশিনী শক্তি আছে, পাতকী ব্যক্তি তত পাপ কখনও করতে পারে না। বিষ্ণুধর্মে আছে, হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ ইত্যাদি মঙ্গলময় নাম যাঁর মুখে বর্তমান, তাঁর কোটি কোটি মহাপাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। বৃহন্নারদীয়ে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সর্বপাপপ্রশমনকারী হরিকীর্তন পরিত্যাগ করে, তাকে আমি পশুগণের চেয়ে ভিন্ন দর্শন করি না। এই পুরাণেই আছে, :

"হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অর্থাৎ হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন ; এই কলিকালে নাম ছাড়া জীবের আর অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।

আমরা সকলে সংসার-বন্ধনে পড়ে ছটফট করছি। এর হাত থেকে মুক্তি চাই। এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? উপায়—কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম ভজন করলে বন্ধনের ভয় থাকে না, তাই মোক্ষের জন্যও আর চিন্তা করতে হয় না। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানালেন :

বেদ বলে, নাম—চিৎস্বরূপ জগতে।
নামের আভাসে সিদ্ধ হয় সর্বমতে॥

শ্রীচৈতন্যদেবও ঠিক এই কথাই বলেছেন। নামে—বিশ্ববীজ যিনি, তিনি নিজভাবটি ব্যক্ত ক'রে আমাদের কাছে প্রকটিত হ'ন।

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥

নামের অনন্তশক্তির কথা গরুড়পুরাণ থেকে উল্লেখ করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বলেছেন, সিংহরবে ভীত হয়ে মৃগগণ যেমন পলায়ন করে, ঠিক সেই রকম জীব নামোচ্চারণ করলে সর্বপাপ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। তাই পাপানলদগ্ধ জীবের পক্ষে হরিনাম অখিল পাপের উন্মূলক। নামাশ্রিত ব্যক্তির সকল দুঃখ নামকর্তৃক শমিত হয়। স্কন্দপুরাণে নামে সর্বব্যাধিবিনাশের বর্ণনায় আছে, যাঁর নামস্মরণ-কীর্তন হতে সবরকম আধিব্যাধি বিনষ্ট হয়, আমি সেই অনন্ত-দেবকে নমস্কার করি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে, মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিকীর্তন করেন, তাহলে তাঁর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায় ও তিনি হ'ন বিশ্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন :

নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয় হত॥
নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন।
নামাভাসে সর্বরোগ হয় নিবারণ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে নামপরায়ণ ব্যক্তির সর্বদুঃখের উপসম হয়। নাম সর্বপ্রকার রোগ ও উপদ্রবনাশক এবং সর্বপ্রকার বিঘ্ননাশক বলেই মঙ্গলপ্রদ।

যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহসমুদায়।
নামাভাষে সকল অনর্থ দূরে যায়॥

কারণ নাম—নিত্যশুদ্ধ। নাম—পূর্ণ পদার্থ। নামের আশ্রয় যে কোন ভাবে নিলে শাস্ত্রের সব বিধি-বিধান নামাশ্রয়ী ব্যক্তিকে তাঁর কিঙ্করূপে সেবা করে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেখতে পাই—যাঁরা নিত্যকাল 'হরে', 'কেশব', 'গোবিন্দ', 'বাসুদেব',—এই বলে নামসমূহ কীর্তন করেন, তাঁদের উপর কলির কোন রকম আধিপত্য থাকে না। প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু তাই বলেছেন :

এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ-নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥

জাতিনাশ-পাপের প্রায়শ্চিত্তপ্রার্থী তাই সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি কাশীতে মহাপ্রভুর উপদেশ এই :

প্রভু কহে,—ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন॥
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
অপর 'নাম' লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥

নারসিংহে আছে যে, নাম শোনামাত্রই নারকীর উদ্ধার হয়। নারকীরা যে যে স্থানে হরিনাম কীর্তন করেছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁরা হরিভক্তি লাভ করে দিব্যধাম প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন :

এক কৃষ্ণনাম যদি মুখে বাহিরায়।
অথবা শ্রবণ-পথে অন্তরেতে যায় ॥
শুদ্ধ বর্ণ হয় বা অশুদ্ধ বর্ণ হয়।
তাতে জীব তরে, এই শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গেয়েছেন :

কৃষ্ণ-নাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা
দুঃখময় অন্য কথা-দ্বন্দ্ব ॥

গৌরনাম উচ্চারণে রাধাকৃষ্ণ দু'টি নাম একসঙ্গে উদ্‌গীত হয়। তাই নরোত্তম ঠাকুর সংক্ষেপে 'গৌর' নামটি করতে কলির জীবকে উপদেশ দেন, এবং তিনি "অন্য কথাকে দ্বন্দ্ব" বলে তাই উল্লেখ করেছেন।

হরিনাম-উচ্চারণ করলে প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সর্বপ্রকার পাপ নষ্ট হয়ে যায়। ভাগবতে লেখা আছে—কৃষ্ণনাম মুমূর্ষ ও আতুর অবস্থায় এবং পড়তে পড়তে, স্খলিত হতে হতে বা বিবশ হয়ে গ্রহণ করলেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উত্তমাগতি লাভ হয়। যথা :

"নামে দৃঢ় হৈলে নাহি হয় পাপে মতি।
পূর্বপাপ দগ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ অতি ॥"

স্কন্দপুরাণে আছে : হে তাত! ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদপাঠের কোন প্রয়োজন নেই। গোবিন্দাদি হরিনামই একমাত্র কীর্তনীয়, তুমি তাই সর্বদা হরিনাম গান কর। হরিনাম কেবল সর্ববেদের নয়, সর্বতীর্থেরও অধিক। বামন-পুরাণে শত সহস্র কোটি তীর্থ-সেবার সমগ্র ফল বিষ্ণুর নামকীর্তন হতে অনায়াসে পাওয়া যায় বলে লেখা আছে। এই নিষ্কপট বিশ্বাসে সর্বকর্মে সিদ্ধি লাভ হয়। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন :

গধর্ম হরিনাম অনন্ত শ্রদ্ধায়।
যে করে আশ্রয় তার সর্বলাভ হয়॥

স্কন্দপুরাণে তাই দেখা যায় যে, সূর্যগ্রহণ, কোটি গোদান, প্রয়াগ-গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ ও পর্বতপ্রমাণ সুবর্ণদানের ফল গোবিন্দকীর্তনের শতাংশের একাংশের ও সমান নয়। বিষ্ণুর এই নামসংকীর্তনই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়বর্গের বিনাশক, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের নিগ্রহকারী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের মূল বলে উক্ত শাস্ত্রে কথিত হয়েছে। যথা:

নামাশ্রিতজনে নাম সদা রক্ষা করে।
অপরাধ কভু তার না হৈতে পারে॥

স্কন্দপুরাণে আছে যে, একমাত্র হরিনামেই সর্বশক্তি বিদ্যমান। শ্রেষ্ঠ দেবগণের সর্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিগুলি যা দান, ব্রত, জপ ও তীর্থে আছে এবং অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে ও অধ্যাত্মবস্তুতর জ্ঞানে যা নিহিত আছে ভগবান্ হরি সেই সব শক্তি আকর্ষণ করে নিজ নামে অর্পণ করেছেন। গীতায় অর্জুন তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—"হে হৃষীকেশ! তোমার গুণকীর্তন শুনে জগৎ হৃষ্ট হয়ে অনুরাগ লাভ করে।"

বৃহন্নারদীয়ে দেখা যায়, যাঁরা নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দন প্রভৃতি নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সর্বদা বন্দিত হন ও তাঁদের কোন অমঙ্গল হয় না।

নামাশ্রিতজনে নাম সদা রক্ষা করে।
অপরাধ কভু তা'র না হইতে পারে॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরে লিখিত আছে—হরিনামগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাক্তির পক্ষে হরিনাম গ্রহণে দেশকালের নিয়ম বা উচ্ছিষ্টাদি বিষয়ে কোন নিষেধ নেই। অর্থাৎ হরিনাম সর্বদা সর্বত্র সেব্য।

বরাহপুরাণে ভগবদুক্তি—জগতে যে মানব নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব প্রভৃতি নাম সব সময় কীর্তন করেন, তিনি ভক্তিযোগদ্বারা আমাতে যুক্ত হন। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—"হে রাজেন্দ্র! যদি মুক্তিবাসনা করেন, তবে গোবিন্দনাম কীর্তন করুন্। হে নরনাথ!" সাংখ্য-যোগাদির কি প্রয়োজন? যথা:

বর্ণাশ্রম-ধর্ম আর সাংখ্য-যোগজ্ঞান।
কলিজীবে উদ্ধারিতে নহে বলবান্॥
গোবিন্দ গোপাল-রাম শ্রীনন্দনন্দন।
রাধানাথ হরি যশোমতী প্রাণধন॥

মদনমোহন শ্যামসুন্দর মাধব।
ব্রজনাথ ব্রজগোপ রাখাল যাদব॥
এইরূপ নিত্যলীলা প্রকাশক নাম।
এ সব কীর্তনে জীব পায় কৃষ্ণনাম॥

নন্দীপুরাণে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি সর্বত্র ও সর্বকালে পাপ-কর্মাদিতে রত, সেও হরিনাম-সঙ্কীর্তন-প্রভাবে শুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে।

"নামাশ্রিত জনে নাম সদা রক্ষা করে।
অপরাধ কভু তার না হইতে পারে॥"

মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—দ্রৌপদী দূরবাসী আমাকে "হে গোবিন্দ" বলে যে আহ্বান করেছিলেন, সেই ঋণ অত্যন্ত বর্ধিত হয়ে আমার হৃদয় হতে দূরীভূত হচ্ছে না।

স্কন্দপদ্মপুরাণে আছে—এই দামোদর-নাম-কীর্তনই একমাত্র মঙ্গল, একমাত্র নিত্যধন ও জীবনের একমাত্র ফল।

বিষ্ণুরহস্যে বলা হয়েছে যে, সত্যযুগে ভক্তির সঙ্গে হরির অর্চন ও শত শত যজ্ঞাদিদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে গোবিন্দ কীর্তনদ্বারা তা সমস্তই পায়।

ভক্তিসাধনের যত রকমের পথ আছে, তার মধ্যে হরিনাম কীর্তনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবচিন্তামণিতে দেখতে পাই—বিপদনাশন বিষ্ণুর নাম স্মরণ দ্বারা পাপ দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু তা বহু আয়াসে সাধিত হয়, কিন্তু 'কৃষ্ণ' এই নাম ঠোঁটে উচ্চারণ হওয়া মাত্রই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তন হয়ে যায়।

হরিনামই যে কলির হাত থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় তা মহাপ্রভু বলেছেন, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই তত্ত্ব সর্বসাধারণের জন্য শাস্ত্র মন্থন করে প্রমাণ করেছেন যে নাম শুধু উপায় নহেন, উপেয়। অন্য কোন উপায়েই উপেয়-স্বরূপ এই অমূল্যবস্তুটি লভ্য নয়। নামাশ্রয়ে ভগবানের আত্মভাবে গুপ্ত লীলাটি ব্যক্ত হয়। নামাশ্রয়ে হয় চিত্তের উজ্জীবন, মনোময় কোষ হতে বিজ্ঞানময় কোষে হয় সত্যের অনুভূতি। তখন নামের মহাবদান্য-লীলার লাবণ্যরসে ভক্তের চিত্ত অভিষিক্ত হয় এবং মহাকারুণ্যের মহিমায় তিনি ডুবে যান। তাঁর সর্বকর্মের ভিতর দিয়ে নামই পরিস্ফূর্ত হতে থাকে, নামের চরণে নিজেকে দানই তখন সত্য হয়ে দাঁড়ায় এবং 'নাম-প্রেম-দান-আদি' বর্ণের মাহাত্ম্য তার জীবনে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকটিত হতে থাকে, এই কথা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

যে অনুপম ভাষায় প্রমাণ প্রয়োগ করে তাঁর পুস্তকে উদ্ধার করেছেন, তা বঙ্গভাষায় বিরল। তিনি বলেছেন, নাম সর্বকালেই সর্বোত্তম ধর্ম, কিন্তু কলিতে অন্য ধর্মের ভরসা না থাকায় শ্রীনামের রসময়-বিগ্রহ-স্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের তীর্থময় ঔদার্যে, রসময় মাধুর্যে ও করুণাবতারের করুণায়। হরিনাম মন্ত্র, যুগধর্মরূপে অবতীর্ণ হয়ে তাই জগতের লোকের দুঃখ মোচন করেছেন।

কলিযুগে সুদুঃসাধ্য অন্য শুভকর্ম।
অতএব নাম আসি হইল যুগধর্ম॥
হরিদাস দাসে ভক্তিবিনোদ যেজন।
হরিনাম চিন্তামণি গায় অকিঞ্চন॥

নাম ও নামী অভিন্ন—নাম স্বয়ং নিত্য, শুদ্ধ মুক্ত, তাই নাম ছাড়া আর অন্য গতি নেই। "মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্র'—শাস্ত্রে এই জন্যই মন্ত্রের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। আর মন্ত্রের আত্মা হচ্ছে এই নাম।

নামে দৃঢ় হৈলে নাহি হয় পাপের মতি।
পূর্বপাপ দগ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ অতি॥

প্রহ্লাদ গুরু-গৃহ থেকে ফিরে এসেছেন, পিতা হিরণ্যকশিপুরের উত্তরে প্রহ্লাদ যা বলেছিলেন, তা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলি :

প্রশ্ন হলো, কি শিখেছ, রাজার সভা মাঝে
কয় শিশু তাঁর নাম শিখেছি রাজার বাজা যে॥
যাঁর আদি নাই, অন্তও নাই যে জন চিরন্তন।
সত্যমূর্তি স্বতঃস্ফূর্তি, অরূপ নিরঞ্জন॥
তিন ভুবনেব প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে।
শিখেছি নাম বলতে তাঁহার গাইতে সে নাম মুখে॥

তাই মহাপ্রভু বলেছেন : "এক কৃষ্ণ নামে হয় সংসারের নাশ।" রাজা দশরথ অন্ধমুনির ছেলেকে ভুল করে হত্যা করেছিলেন। ঋষি বামদেব বশিষ্ঠ দেবের পুত্র। রাজা দশরথকে তাঁর সেই হত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য, রাজাকে তিনি দশবার 'রাম' নাম জপ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ দেব তাঁর ছেলে, বামদেবের এই কথা শুনে রাগে জলে উঠে বললেন :

একবার রাম নামে যত পাপ হরে,
কোটি পাপীর সাধ্য নাই যে তত পাপ করে।
দশবার রাম নাম বলালি রাজারে?

মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল,
দূর হ'রে বামদেব হওরে চণ্ডাল।

এই বামদেব ঋষিই রাজা দশরথকে একবারের পরিবর্তে দশবার রাম নাম করতে বলায় পিতার অভিশাপে তিনি হয়েছিলেন গুহক চণ্ডাল। নামের যে কি ক্ষমতা এটি হচ্ছে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নামের মহিমা সম্বন্ধে রামায়ণের একটি কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। হনুমান রাম অবতারে রুদ্রের অবতার রূপে জন্মলাভ করেছিলেন। মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেই হনুমান একবার জগৎটাকে ভাল করে দেখে নিল যে, পদার্থটা কি আর কত বড। পূর্বদিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলেন লাল টকটকে গোলাকার একটা পদার্থ পূর্বদিকটা অরুণরাগে রঞ্জিত করে রেখেছে। সেই গোলাকার বস্তুটাকে দেখে, তিনি ভাবলেন এটা একটা সুন্দর পাকা ফল। তিনি লাফ দিয়ে ফলটাকে খাবার জন্য ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধরতে পারবেন কেন? সূর্যের প্রখর তেজে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন মলয় পাহাড়ে। ভেঙ্গে গেল তাঁর চোয়াল, তাই তাঁর নাম হল হনুমান। বাঙালী রামায়ণকার কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন:

হনু ভগ্ন হৈল পড়ি মলয় শিখরে
এই হেতু হনুমান নাম তার ধরে॥

এই হনুমানই লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সময় যখন শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করছেন, 'সীতা উদ্ধার করতে এসে আমার ভাই গেল; স্ত্রী ও বন্ধু দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়, কিন্তু এমন দেশের কথা তো কখনো শুনিনি যেখানে গেলে সহোদর ভাই পাওয়া যায়।' বাল্মীকি লিখেছেন:

দেশে দেশে কলত্রাণী দেশে দেশে চ বান্ধবা।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদর॥

বিশল্যকরণী দিয়ে এই রাত্রেই যদি চিকিৎসা করা যায়, তা'হলেই লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচবে। কে আনবে চিনে সেই বিশল্যকরণী? হনুমান তখন 'রাম রাম' এই নাম উচ্চারণ করতে করতে ছুটল ঔষধ আনতে। ঔষধ আছে গন্ধমাদন পর্বতে, বিশল্যকরণী তিনি চেনেন না—তাই গন্ধমাদন পাহাড়টাকে মাথায় নিয়ে হনুমান চলেছেন লঙ্কায়, রাত পোহাবার আগে বিশল্যকরণী দিয়ে চিকিৎসা না হলে লক্ষ্মণ বাঁচবেন না; তখন তিনি পূর্বদিকে চেয়ে দেখলেন, সূর্য উদয় হচ্ছেন। তিনি ভাবলেন সর্বনাশ—তখন তিনি 'রাম'

'রাম' উচ্চারণ করে মহাবিক্রমে সূর্যকে বগলে পুরে ফেললেন। নামের মহিমায় সূর্যের আর দগ্ধ করার ক্ষমতা রইলো না। হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় নিয়ে লঙ্কায় আসার পর, লক্ষ্মণের চিকিৎসা হলো, তিনি সুস্থ হলেন; তারপর হনুমান বগল থেকে সূর্যকে ছেড়ে দিলেন। যে সূর্য একবার তাঁকে দগ্ধ করে ফেলেছিলেন—নামের এমনই ক্ষমতা, তিনি সেই নামের আশ্রয় লাভ করে সূর্যকেই বগলের মধ্যে ধরে রাখলেন। সূর্যের দাহিকা শক্তি তখন আর হনুমানের কোন ক্ষতি করতে পারল না।

নামের মহিমা যুগে যুগে সর্বশাস্ত্রে কীর্তিত হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির রাজত্ব করবেন না বলে যখন মনস্ত করেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের কাছে পাঠালেন, তাঁর পরামর্শের জন্য। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা হরির নাম স্মরণ করে রাজ্য পরিচালনা করতে উপদেশ দিলেন। ভীষ্মদেব বলেছিলেন :

প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারোচ্ছেদভেষজম।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম॥

অর্থাৎ 'হরি' এই দুটি অক্ষর হচ্ছে জীবনরূপ দুর্গমপথের পাথেয় স্বরূপ, সংসার বুদ্ধিরূপ ব্যাধির মহৌষধ আর দুঃখশোকের একমাত্র পরিত্রাণদাতা।

শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের এই শেষ শ্লোকটি প্রায়ই তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণের মধ্যে উদ্ধার করে আমাদের শোনাতেন। তাঁর দেহাবসানের আগে কভুরে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনের সময় তাঁর শেষ ভাষণেও (১৮ জুলাই ১৯৭৬) তীর্থ মহারাজ এই শ্লোকটির উল্লেখ করেন।

নাম-সংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম॥

নাম-সংকীর্তন সর্বপাপের বিনাশক, এবং যাঁকে প্রণাম করলে সর্বপাপের অবসান হয়, আমি সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

জয়দেব "গীতগোবিন্দে" বলেছেন যে, শ্রীহরির চরণ স্মরণ করলে কলিকালের জ্বরস্বরূপ যে মহাব্যাধি তার উপশম হয়। "হরিচরণস্মরণামৃতকৃষ্ণকলিকলুষজ্বরখণ্ডনম্।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে আমরা শুনেছি, যে হরিনাম দুবার মাত্র উচ্চারণ করলেই কলির অন্নগতপ্রাণ জীবের পক্ষে যথেষ্ট।

এক কৃষ্ণ নামে তোমার ভববন্ধ যাবে।
আর কৃষ্ণনামে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

নামে রুচি হলে জীবের পূর্ব পাপ সব দূর হয়ে যায়। নাম হচ্ছেন স্বয়ং

ভগবান্। নাম চিন্তামণি। নাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। চৈতন্যরূপ বিগ্রহ হচ্ছেন নামের স্বরূপ। তাই বলা হয় যে, নাম-নামী অভেদ—'যেই নাম সেই কৃষ্ণ'। নামের সেবায় আগ্রহে চিত্তবৃত্তি উন্মুখতা লাভ করলে জিহ্বায় তখন আপনা থেকেই নামের স্ফুরণ হয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে ভাষায়:

মায়াবাদিমতে থাকে, কৃষ্ণমন্ত্র লয়।
তার পরমার্থ লাভ কভু নাহি হয়॥
ভক্তমুখে আইসে নাম গোলোক হইতে॥
আত্মা হৈতে দেহে ব্যাপি নাচে জিহ্বাদিতে॥

বঙ্কিমচন্দ্র সেন লিখেছেন: নামে উপায় এবং উপেয় এক। শ্রীভগবান্ নামের বিষয় এবং আশ্রয়ও তিনি। বিষয় এবং আশ্রয়কে পরম কারুণ্যের মহিমায় অভিন্ন করিয়া প্রেমের সর্বতোময় উদয়ে শ্রীনামের, শ্রীভগবানের সর্বশক্তির—সর্বাশ্রয় স্বরূপে তাঁহার আনন্দময় ব্যাপ্ত এবং দীপ্ত। শ্রীবিগ্রহের সম্মূর্তির পরিস্ফূর্তি।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যুগধর্ম 'নাম-প্রেম' দেশে প্রবর্তিত হলো। দিক-চক্রাবালে পরধর্মের প্রভাবজনিত পুঞ্জীভূত সব ছলধর্মের মেঘমালা তাই খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। তাঁর এক সেবক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঘোষণা করলেন: "ছলধর্ম ছাড়ি কর সত্যধর্মে মতি—চতুর্বর্গ ত্যাজি কর নিত্য প্রেমগতি"। মহাপ্রভুর ধর্মকে তিনি নবপর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি নামকে প্রতিষ্ঠা করলেন সর্বশাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত স্বরূপে। উন্মুক্ত করলেন জীবোদ্ধারণে শ্রীনামের মাধুর্যকে, প্রকট করলেন নামের বীর্যকে। তাঁকে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নানাধর্মের বিবিধ উপদেশামৃতে অভিসিঞ্চিত হয়ে বিশ্বের এক পরম বিস্ময় উৎপাদন করেছে। তাই গীতা এক শ্রেষ্ঠ সার্বভৌম ও মহান ধর্মকাব্য। সর্বশাস্ত্রময় এই ধর্মকাব্য মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। সকল বেদের সারার্থ যেমন মহাভারতে আছে, ঠিক তেমনি সকল শাস্ত্রের সার

আছে এই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়। ভীষ্মপর্বের ৩ অধ্যায় থেকে ৪৩ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবদ্‌গীতাপর্বাধ্যায় হ'লেও ২৫ অধ্যায় থেকে প্রচলিত গীতার সুরু এবং ৪২ অধ্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮ অধ্যায়ে তার শেষ। সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হবার এরূপ জনপ্রিয় গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নেই বলে তত্ত্বজ্ঞ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা সিদ্ধান্ত করেছেন। কারণ কোন রকমের সঙ্কীর্ণতার লেশ মাত্র এই মহৎ কাব্যে কোথাও স্থান পায়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাকার। ভগবদ্‌গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্য-প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়। ["কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—ভাগবত।]

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আঠারো রকমের যোগের কথা আছে বলে এই কাব্যগ্রন্থকে যোগশাস্ত্রও বলা হয়। পরমেশ্বরে যুক্ত হবার জন্য বিবিধ উপায় বা সাধনই হল যোগ। যেমন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এ ছাড়া আরও অনেক রকম যোগের উল্লেখ গীতায় আছে। তবে সেগুলি সব এদেরই অন্তর্গত বিভিন্ন উপায়মাত্র।

গীতার বাণী শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখনিঃসৃতা বাণী। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, যাঁরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁরা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদের বাক্য কেবল অনুবাদ করে দিলে সহজে বুঝতে পারেন না। ইহা তাঁদের দোষ নয়, তাঁদের শিক্ষার নৈসর্গিত ফল। গীতার তত্ত্ব যাঁরা তপস্যাহীন, অভক্ত ও অন্যাভিলাষী তাঁরা বুঝতে পারবেন না; তাঁদের কাছে বলতে নিষেধ, এ কথা স্পষ্ট করে গীতায় বলা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের কথায় "The Gita is not for those who have no faith because it is essentially addressed to the heart, and capable of being understood by the heart."

গীতা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মশাস্ত্রের, বেদান্ত উপনিষদের মথিত সারাংশ। এর উপদেশাবলীর দ্বারা জীবন শাসিত ও গঠিত করতে পারলে এবং জীবনে তা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করতে পারলে গীতাপাঠ সার্থক হয়। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে গীতাকে উপনিষদ ও ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়েছে। উপনিষদের মানে হচ্ছে—'সমীপসদন' অর্থাৎ যিনি আমার সমীপে অবস্থান

করছেন। 'উপ' মানে সমীপে, 'নি' মানে নিশ্চয়রূপে আর 'সদ' মানে অবস্থান। তাই গীতার মহিমা প্রকাশ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, উপনিষদ হতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করে গীতারূপ এই সুদৃশ্য মালা গ্রথিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: গীতা—বাজারের উপন্যাস-গ্রন্থ নহে, একবার পড়িবামাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যায় না। বিশেষরূপে অর্থ চৈতন্যচরিতামৃতের কথায়—"যাহা ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥"

এখানে দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করবো। একটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর, আর একটি স্যার চার্লস উইলকিন্সের। মহাপ্রভু ষোড়শ শতকে যখন দাক্ষিণাত্য যান, তখন তিনি শ্রীরঙ্গবাসী এক বৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসেন। সেই বৈষ্ণব সেকানকার একটি মন্দিরে প্রত্যহ সমগ্র গীতা পাঠ করতেন এবং পুলকে অবিরল ধারায় কাঁদতেন। যদিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত গীতার শব্দার্থ তিনি অনেক কিছুই বুঝতে পারতেন না, তবু তিনি ভক্তিভরে প্রত্যহ গীতা পাঠ করতেন। শরণাগত সেবোন্মুখ শ্রীরঙ্গবাসী সেই বৈষ্ণবের গীতাপাঠের বিবরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যা আছে তা এখানে উদ্ধৃত হলো—

"সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা আবর্তন॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়ে, লোক করে উপহাসে॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিল তারে, শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে—যেন শ্যামল সুন্দর॥

অর্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে,—গীতাপাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার॥
এত বলি' সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুপদ ধরি' বিপ্র করেন রোদন॥
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি—হেন মোর মনে লয়॥'

স্যার চার্লস উইলকিন্স বাঙলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করার সময় গ্রামের আটচালায় বা দেবালয়ে গীতাপাঠ-শ্রবণরত ভক্ত নরনারীবৃন্দের দরবিগলিত ধারা দেখে—এই ধর্মগ্রন্থে এমন কি জিনিষ আছে তা দেখার জন্য তিনিও গীতাপাঠ করবেন এই সঙ্কল্প করে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসের অন্যতম কর্মচারী হিসাবে কুড়ি বছর বয়সে এদেশে আসেন। তখন দোভাষীর দ্বারা কোম্পানীর সব কাজ কর্ম চলতো। তিনি সর্বপ্রথম এ দেশের ভাষা শিখে কাজ করলে ব্যবসায়ের সুবিধা হবে। এই কথা চিন্তা করে বাঙলা ও ফারসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিবলে এই ভাষা দুটি শিখতে তাঁর খুব বেশী দেরী হয় নি।[১] তারপর ভাষা ও সাহিত্যের আকর সংস্কৃতের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো। কেন দৃষ্টি পড়লো সে কথা আগে বলেছি। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় একটি ছোট ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁকে দিয়ে বাঙলা হরফ প্রস্তুত করিয়ে হুগলি থেকে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান। উহাই বাঙলাদেশের প্রথম ছাপা বই। বালী, মালদহ, হুগলী প্রভৃতি বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার সময় আপামর জনসাধারণের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণের উৎসাহ দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং মহাভারতের

১ তাঁর সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ লেখকের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ।"—১ম খণ্ডে বর্ণিত আছে।

সারতত্ত্ব গীতার ইংরাজী অনুবাদ করতে সুরু করেন।

গীতার অনুবাদ শেষ হলে ওয়ারেন হেষ্টিং উইলকিন্স-অনূদিত গীতা পড়ে মুগ্ধ হন এবং উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গীতার ইংরাজী অনুবাদ বিলাত থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[২] ইংরাজ মনীষীগণ গীতা পড়ে মুগ্ধ হন। বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী কার্লাইল, প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত এমার্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, তিনি তাঁকে উইলকিন্স সাহেব-অনূদিত একখানি গীতা উপহার দেন। গীতার প্রভাব কী রকমভাবে এমর্সন সাহেবের উপর পড়েছিল তা তাঁর রচনাবলী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন।

ইংরাজী গীতার ভূমিকায় হেষ্টিং যা লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ উদ্ধার-যোগ্য: "গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা গীতা বহু শতাব্দী ধরে মনুষ্যজাতির এক বৃহৎ অংশের কাছ থেকে পেয়ে আসছে, তার দ্বারা গীতা সাহিত্যিক-জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। গীতার সাহিত্যিক গুণাবলী জগতে অননুকরণীয়। গীতাপাঠে শুধু ইংরেজগণ নয়, সারা বিশ্ববাসী উপকৃত হবেন। গীতা-ধর্মের অনুশীলনে মানবজীবন শান্তিধামে পরিণত হবে।"

বিলাত থেকে দু'শো বছর আগে প্রথম প্রকাশিত চার্লস উইলকিন্স সাহেবের ইংরেজী 'ভাগবত গীতার' অখ্যাপত্র ছিল এরূপ :

THE BHAGABAT-GEETA ;
or dialogues of Kreeshna and Arjoon in eighteen lectures
with notes, translated from the original, in the Sanskreet,
or ancient language of the Brahmans ;
By
CHARLES WILKINS
Senior merchant in the Service of the Honoorable East
India Company on their Bengal Establishment
LONDON
Printed for C. Nourse
Opposite
Catherine Street in the Strand
MDCCLXXXV
1785

২ এই ইংরাজী গীতাই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে প্রথম মুদ্রিত বই। তখন কলকাতায় কোন ছাপাখানা হয় নি।

ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি হেষ্টিংসের ছিল গভীর অনুরাগ তাই তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'কোর্ট অফ ডিরেকটার্স' এর চেয়ারম্যান স্যাথানিয়েল স্মিথকে একটি দীর্ঘ পত্রে চার্লস উইলকিন্স অনূদিত ভগবত-গীতার প্রশংসা করে কোম্পানীর কাছে সুপারিশ করেন উক্ত অনুবাদ ছেপে প্রকাশ করতে। হেষ্টিংসের ঐ চিঠিতে ছিল চার হাজারের কিছু বেশি শব্দ আর ছিল ভগবতগীতা প্রসঙ্গে নানা কথা। চিঠির কিছু অংশের অনুবাদ এরূপ: "আমি পূর্বেও বলেছি এবং এখনও আমার বলতে কোন দ্বিধা নেই যে গীতায় যে সকল মৌলিক উপাদান সমূহ বিধৃত হয়েছে তার মধ্যে পরমানন্দের চেতনা, যুক্তিবাদ ও সর্বোপরি তার রচনাশৈলী। সঙ্গে কারও তুলনা করা চলে না। তবে আমার মতে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো এই যে, মানবজাতির আবিষ্কৃত ধর্মসমূহের মধ্যে খ্রীষ্টীয় বিধানের সঙ্গে এই গ্রন্থের কিছু কিছু যোগ-সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। গীতার যাবতীয় উপদেশাবলীর যেগুলি মূল সূত্র তাও এতো শক্তিমত্তার সঙ্গে বিধৃত যে তারও এক অর্থে যেন কোন তুলনাই চলতে পারে না।"

১৭৮৫ সালে 'ভগবতগীতা'র ইংরাজী অনুবাদ 'বাতে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি ও অনুবাদক অগাস্ট উইলহেল্ম ভন শ্লেডোম্ম ঐ অনুবাদ পড়ে বলেছিলেন: The most beautiful and perhaps the only truly philosophical poem, that the whole range of literature known to us has produced.

গীতা হিন্দুদের নৈতিক উন্নতি, সাহিত্য-সৃষ্টি ও পৌরাণিক রহস্যভেদের আশ্চর্যজনক প্রামাণিক গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যদিও ইউরোপের সভ্যতা, ধর্মাচরণ ও নৈতিক ব্যবহার গীতোক্ত শিক্ষা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি উহা আমাদের ধর্মসাধনে ও নৈতিক কর্তব্যপালনে বিশেষ সহায়ক করে। যে সাধনতত্ত্বের বিষয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকুল এক সাধকগণ অজ্ঞ, ভারতের সেই সনাতন সাধনার কথা গীতা বলেছেন। গীতার মৌলিকত্ব, ভাবের গভীরতা ও অভিনবত্ব, দার্শনিক তত্ত্বের উচ্চতা, বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্য-কৌশল অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ। গীতার উপদেশে খ্রীষ্টান ধর্মের মূলসূত্রগুলির প্রকৃত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।" (স্বামী জগদীশ্বরানন্দের গীতা দ্রষ্টব্য) প্রথম ইংরেজী গীতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। উপযুক্ত

ভাবে সম্পাদনা করে উহা পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করলে একটা ভাল কাজ হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষে রুশ ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তার-পর জার্মান, ফরাসী, ইটালী, স্পেন, পর্টুগ্যাল প্রভৃতি ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় গীতার অনুবাদ হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চল্লিশটি ভাষায় পঞ্চাশ শতাধিক সংস্করণ গীতার অদ্যাবধি হয়েছে এবং অন্যান্য ধর্মা-বলম্বী কোটি কোটি নরনারী পরম শ্রদ্ধাসহকারে ইহা পাঠ করে যে অভি-মত প্রকাশ করেছেন, তা সব সংগ্রহ করে প্রকাশ করলে গীতার চেয়ে আকারে একটি বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যাবে। নিম্নে কয়েকজন মনীষীর মতামত দিলাম।

জার্মান মনীষী উইলিয়ম হামবোলট বলেছেন: পৃথিবীর মধ্যে গীতার মতন সুলিখিত, সুললিত, সরস, সত্য ও সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ সম্ভবত পৃথিবীতে আর কোন ভাষায় নেই।

সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত গার্বে সাহেব সর্বপ্রথম বাইবেলের মত গীতারও উচ্চতর ঐতিহাসিক সমালোচনা ও গবেষণা করেন। ইনিই প্রথম জার্মান ভাষায় গীতার অনুবাদও প্রচার করেন। তাঁর শিষ্য ডক্টর রডলফ অটো গীতার উচ্চতর সমালোচনা করে যে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন, ইংরেজী ভাষায়ও তা অনুদিত হয়ে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। বইটির নাম The Original Gita।

ইংরেজ মনীষী ডক্টর এল্ ডি-বার্নেট বলেছেন: লক্ষ লক্ষ লোক গীতা পড়েছে বা শুনেছে। সকলেই গীতা-পাঠে বা শ্রবণে বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বরলাভের দুর্গম পথেও গীতা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও সহচর। জীবনের প্রত্যেক কর্মকে অনাসক্তির অনলে শুদ্ধ করে উপাসনায় পরিণত করার যে অপূর্ব কৌশল গীতা শিক্ষা দেয়, তা মানবের কর্মজীবনের অনন্য অবলম্বন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: যেমন কোন অজানা ইংরাজী শব্দ যোজনায়—উহার অর্থ না বুঝতে পারলে আমি ইংরাজী অভি-ধান খুলে দেখি, তেমনি আমার আচরণে যখন সঙ্কট উপস্থিত হয় তখন গীতাজীর কাছ থেকে সে গোলমাল সাফ করে নিই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহুবিধ ব্যাখ্যা নানা আলোকে আলোকপ্রাপ্ত। বহু পণ্ডিত, গবেষক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অনুভব ও উপলব্ধির বিভিন্ন কোন থেকে গীতার উপর বহু ভাষ্য ও টীকা রচনা করেছেন। তার মধ্যে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যই প্রাচীনতম। এ ছাড়া রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, জ্ঞানেশ্বর, নীলকণ্ঠ

মধুসূদন, শঙ্করানন্দ, শ্রীধর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, তিলক, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি বহু মনীষী বিভিন্ন ভাবধারায় গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। গীতা-ব্যাখ্যাতা চারজন বাঙালী হচ্ছেন—মধুসূদন সরস্বতী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ ও ঋষি অরবিন্দ। এঁদের স্বতন্ত্র চিন্তা ও ভাষ্য অন্যান্য আলোকিত জগতকে ইঙ্গিত দিয়েছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের আচার্য ও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পদাশ্রিত ভক্ত। তাঁর মতে ভক্তিযোগ অতিশয় গূঢ় এবং কর্মযোগে ও জ্ঞানযোগের মূলকারণস্বরূপ। ভক্তিরহিত কর্ম ও জ্ঞান উভয়ই বৃথা, তাই কর্ম ও জ্ঞান এই উভয়কে ভক্তিমিশ্রিত করে তিনি সাধন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এক কথায় খুব সুন্দরভাবে গীতা কি, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কয়েকবার 'গীতা' 'গীতা' উচ্চারণ করলে যা হয়, তাই হচ্ছে গীতার শিক্ষা। অর্থাৎ ত্যাগই গীতার বাণী। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী নিখিলানন্দকৃত গীতার ইংরাজী অনুবাদ ভারতের বাইরে খুব পরিচিত গ্রন্থ। অ্যানি বেসাণ্ট কৃত গীতার ইংরাজী অনুবাদ ও স্যার এডুইন আর্নল্ড রচিত গীতার পদ্যানুবাদ বিশ্বে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে।

এখন গীতা-প্রচারের জন্য সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মতন ধুমধাম করে 'গীতা-জয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কারণ জনগণ এখন আর কি 'গীতা' যে কি বস্তু তা প্রায় ভুলতে বসেছে। গীতার একটি শ্লোকে (৩।২১) ভগবান্ বলেছেন:

"যা যা করে শ্রেষ্ঠে, তাই সাধারণে করে।
তাঁরা যা মানেন লোকে তাই অনুসরে॥" *

সমাজে যাঁরা শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছেন যেমন গুরু, পণ্ডিত, শিক্ষক, নেতা, প্রভৃতি, তাঁরা শুভ অশুভ যেমন কর্ম করেন, সাধারণ লোক তাঁদেরই দেখে তা অনুকরণ করে থাকেন। তাঁরা লৌকিক ব্যাপারে বা বৈদিক ব্যাপারে যদি গীতাকে অর্থাৎ গীতার উপদেশবাণীকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করেন তবেই সাধারণ লোক তা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করবে এবং গীতাজয়ন্তী সার্থক হ'বে। পরিশেষে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষাভাষ্যের ব্যাখ্যায় গীতার শেষে যা লিখেছেন তা উদ্ধারযোগ্য।

* সংস্কৃতের পরিবর্তে শ্লোকটীর কাব্যানুবাদ দেওয়া হলো।

"অতএব গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত-সার সংগ্রহ-পূর্বক জীবের চরমোপায়রূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবান্ এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধজ্ঞানপূর্বক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করতঃ পরমপ্রয়োজনরূপ প্রেমলাভ কর। স্ব-স্ব-অধিকার-অনুসারে ধর্মজীবনের সহিত সর্বদা শ্রবণাদি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর। ভক্তিযোগের অনুকূল আচরণরূপ স্বধর্মাবলম্বনপূর্বক জীবন নির্বাহ কর। শ্রদ্ধাসহকারে ক্রমশঃ স্বনিষ্ঠা ত্যাগপূর্বক শরণাগতিদ্বারা ভক্তিযোগে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও স্বধর্মদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে। তাহা হইলে স্বল্পকালমধ্যেই আমি তোমাদিগকে নিরপেক্ষতাজুষ্ট বিশুদ্ধ প্রেম দান করিব। এরূপ ব্যাপারে প্রবেশমাত্র অশোক, অভয় ও অমৃতস্বরূপ মৎপ্রসাদ লাভ করতঃ আমার নিত্য প্রেমে আবিষ্ট হইবে।"

গীতার ভূমিকায় ওয়ারেন হেষ্টিংস লিখেছিলেন যে গীতার মৌলিকত্ব, ভাবের গভীরতা ও অভিনবত্ব, দার্শনিক তত্ত্বের উচ্চতা, বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যা-কৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ।

প্রখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত হুমাসন সাহেব গীতাকে চিন্তার-সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। "Empire of thought"

আর এডউইন আরনল্ড লিখেছেন যে গীতা হিন্দুধর্মের সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের গভীরতা ভারতের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে যুগ যুগ ধরে এবং আজও করছে।

"Nevertheless, it is the most popular book in Hindu religious literature, the gospel, one may say, of India. It has profoundly influenced the spiritual cultural, intellectual and political life of the country throughout the centuries and it continues to do so to-day." (Song Celestial-Bhagbad Gita By Edwin Arnold.)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মে আলোকপ্রাপ্ত ঋষি শ্রীঅরবিন্দ গীতার যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছেন তা সারা পৃথিবীতে সমাদৃত বলে তাঁর মূল ইংরাজী রচনা থেকে কিছু অনুবাদ এখানে উদ্ধার করছি।

"বাসুদেবঃ সর্বম্—ভগবানই সব; অতএব ভগবানকে যদি তাঁহার সব সত্তায় এবং সব শক্তিতে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সবই জানা যায়। কেবল শুদ্ধ আত্মাকে নহে, পরন্তু জগৎকে, কর্মকে, প্রকৃতিকেও জানা যায়।

তখন আর এখানে জানিতে বাকী কিছুই থাকে না, কারণ, সবই সেই ভগবান। আমাদের জ্ঞান এখানে এরূপ সমগ্র নহে, এখানে জ্ঞান দ্বন্দ্বময় মন ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অহঙ্কারের দ্বারা খণ্ডিত হয়। কেবল সেই জন্যই মনের দ্বারা যাহা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগকে সত্য অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; এবং ইহার দুইটি দিক আছে—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মূল তত্ত্বকে জানা—জ্ঞান; মূলতত্ত্বের বিকাশকে সর্বতোভাবে জানাই বিজ্ঞান। পরম ভাগবত সত্তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই জ্ঞান এবং প্রকৃত পুরুষ প্রভৃতি রূপে বিশ্বলীলার মাঝে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। ইহার দ্বারা যাহা কিছু হইয়াছে সকল বিনিসেরই দিব্য উৎপত্তি এবং তাহাদের প্রকৃতির চরম সত্য জানিতে পারা যায়। গীতা বলিয়াছে এইরূপ পূর্ণ সমগ্র জ্ঞান সুদুর্লভ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৭।৩

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ দুই এক জন সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হয়। আবার যাহারা এরূপ যত্ন করে এবং সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের মধ্যে কচিৎ দুই একজন তত্ত্বতঃ আমাকে জানে (knows me in all the Principles of my existence)। * *

গীতায় প্রসঙ্গক্রমে বহু দার্শনিক তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু গীতা দার্শনিক তত্ত্বালোচনার গ্রন্থ নহে, কারণ, গীতাতে শুধু আলোচনার জন্যই কোন তত্ত্বের অবতারণা করা হয় নাই। গীতা শ্রেষ্ঠ সত্যের সন্ধান করিয়াছে, যেন তাহা শ্রেষ্ঠ কাজে লাগান যাইতে পারে, কেবল তর্কবুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান পিপাসার তৃপ্তির জন্য নহে, কিন্তু যেন ঐ সত্য আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, আমাদের বর্তমান মরজীবনের অপূর্ণতা হইতে আমাদিগকে মৃত্যুহীন পূর্ণতার মধ্যে লইয়া যাইতে পারে।**

ভগবানের যে শ্রেষ্ঠতম সত্তা তাহা অব্যক্ত—কখনও প্রকাশিত হয় না। তাঁহার যে সত্য শাশ্বত মূর্তি তাহা জড়ের মধ্যে ব্যক্ত হয় না, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পারে না, মনও তাহাকে চিন্তা করিতে পারে না, অচিন্ত্যরূপ, অব্যক্তমূর্তি। আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা কেবল ভগবানের আত্মসৃষ্ট রূপ,—তাঁহার শাশ্বত রূপ স্বরূপ নহে। এমন একজন আছেন, অথবা এমন এক সত্তা আছে

যাহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, অপ্রকাশ্য, অচিন্ত্য, এক অনির্বচনীয় অনন্ত ভাগবত সত্তা অনন্ত সম্বন্ধে আমরা যতই বিরাট বা যতই সূক্ষ্ম ধারণা করি না কেন সেই সত্তা সে ধারণার বহু উর্দ্ধে।৫*

সাধারণ ধর্ম হইতেছে আংশিক দেবগণের পূজা পূর্ণ ভগবানের পূজা নহে। পুরাতন বৈদিক ধর্মের যে বহিরঙ্গ দিক তখন বিকশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই গীতা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছে; গীতা এই বহিরঙ্গ উপাসনাকে বলিয়াছে অন্য দেবতার প্রতি যজ্ঞ; অন্য দেবতা যথা দেবান্, পিতৃন্, ভূতানি। মানুষ ভগবানের আংশিক শক্তি বা ভাবসকলকে যেমন দেখে বা ধারণা করে সেই সবের নিকটেই সাধারণতঃ তাহাদের জীবন ও কর্মকে উৎসর্গ করে মানুষ বা প্রকৃতির মধ্যে যে-সকল প্রধান প্রধান জিনিষ সহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রধানতঃ সেই সবের অন্তর্দেবতারূপে অধিষ্ঠিত শক্তি ও ভাব-সকলের উপাসনা তাহারা করিয়া থাকে, অথবা যে সব শক্তি ও ভাব উচ্চ দিব্য প্রতীকের ভিতর দিয়া তাহাদের নিজেদের মানবীয়তাকেই প্রতিফলিত করে সেই সবের পূজা করিয়া থাকে। যদি তাহারা শ্রদ্ধার সহিত ইহা করে তবে তাহাদের সে শ্রদ্ধা সার্থক হয়; কারণ ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক, রূপ বা কল্পনা বর্তমান থাকে, ভগবান তাহাই স্বীকার করেন, যং যং তনুম্ শ্রদ্ধয়া অর্চতি, এবং তাহাদের মধ্যে যেরূপ শ্রদ্ধা আছে তদনুসারেই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন।৬*

সজ্ঞানে সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা, নতুবা কেবল অপূর্ণ ও আংশিক জিনিষই পাওয়া যায় এবং সে সবকে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে মহত্তর সাধনা ও প্রশস্ততর ভগবদ্ উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাহারা পরম বিশ্ব-পুরুষকেই একান্ত ও সমগ্রভাবে অনুসরণ করে, তাহারা অন্যান্য সাধনালব্ধ সমস্ত জ্ঞান ও ফল লাভ করে কিন্তু কোনও এক বিশেষ ভাবের মধ্যে বদ্ধ হয় না, যদিও সকল ভাবের মধ্যেই ভগবান সম্বন্ধে কি সত্য আছে তাহা তাহারা দেখিতে পায়। এই সাধনা পরম পুরুষোত্তমের দিকে যাইবার পথে ভগবানের সমস্ত ভাব, সমস্ত রূপকেই আলিঙ্গন করে।"

শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita হইতে অনুদিত—অনুবাদক: অনিলবরণ রায়।

গীতা এই মনোমুগ্ধকর নামটি শুনলেই আমাদের মানসপটে কুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধে পার্থসারথির অর্জ্জুনকে উপদেশের দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। গীতা ১৭৮৫ সালে বিলাত থেকে সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদক স্যার চার্লস উইলকিন্সের কথা আগে বলেছি। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস গীতার এই ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন : The Gita is a performance of great originality, of a sublimity of conception, reasoning and dictum almost unequalled. অর্থাৎ গীতার মৌলিকত্ব, ভাবের গভীরতা ও অভিনবত্ব, দার্শনিক তত্ত্বের উচ্চতা, বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যা-কৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ।

স্যার এডুইন আরনলড কৃত গীতার ইংরাজীতে পদ্যানুবাদ (Song Celestial Bhagvat Gita) তাঁকে অমর করেছে। স্যার এডুইনের অনুবাদের কয়েকটি লাইন উদ্ধারযোগ্য :

"So have I read this wonderful
and spirit-thrilling speech.
By Krishna and Prince Arjuna held
discoursing each with each ;
So have I write its wisdom here—
its hidden mystery.
For England · O our India !
as dear to me as she."

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২ অধ্যায় হচ্ছে ভগবতগীতা। বিষাদ-গ্রস্ত অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্য আঠারোটি অধ্যায়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, সেই ভগবতগীতাই সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত। তাই গীতা বললেই আমরা শ্রীমদ্ভগবতগীতা বুঝি। আত্মজীবনে অধীত যুগযুগান্তর-ব্যাপী তপস্যায় অর্জিত যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তা শিষ্যগণকে উপদেশের ছলে বর্ণনার নাম হচ্ছে গীতা। হিন্দু শাস্ত্রে আরও অসংখ্য গীতা আছে। সে কথা অনেকেই অবগত নন, তাই সেই সব গীতার বিষয় কিছু বলার প্রয়োজন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কৃত বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে আছে : গীতা=গৈ (গান করা)+ত (ষ্ণ)+আপ (স্ত্রীং) অর্থাৎ ভগবান ও ভক্ত বা গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরস্থলে আত্মবিদ্যা উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ। ভগবদগীতা, রামগীতা শিবগীতা গুরুগীতা, ভীষ্মগীতা প্রভৃতি বহুবিধ গীতা আছে। (পৃঃ ৬৭৬)

উপদেশ বিষয়ক কথা যা গাওয়া হয়েছে অর্থাৎ কীর্তিতা, বর্ণিতা, উচ্চারিতা তার নাম গীতা। আত্মজীবনে অধীত যুগযুগান্তরব্যাপী তপস্যায় অর্জিত যে জ্ঞান তা গান করার নাম গীতা। তাই শাস্ত্রানুরাগী সুধীজন ও সাধুসন্ন্যাসীগণ হিন্দুশাস্ত্রে যত গীতা আছে সবগুলি পাঠ করে ধন্য ও কৃতার্থ হন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "জ্ঞান-গৌরবদীপ্ত আচার্য শঙ্কর তাঁহার মহিমাময় শারীরকভাষ্যের বহুস্থানে "গীতাঃ" এই বহুবচনান্ত শব্দ উল্লেখ করিয়া এই সকল গীতার প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন।"

ঋষি মহর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতির মুখনিঃসৃত যে সকল গীতা শিষ্যপরম্পরায় প্রচারিত হয়ে একদা ভারতবাসীকে জ্ঞান গরিমায় পবিত্র করেছিল, সেই সব অমর উপদেশরাশি প্রচারের অভাবে আজও পুথিগত হয়ে রয়েছে। এটাই পরিতাপের বিষয়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৩৩৫ সালে গীতা গ্রন্থাবলীতে এই রকম পঁচিশটি গীতা প্রকাশ করে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হন। তাঁরা যে ২৫টি গীতা প্রকাশ করেছিলেন তাদের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

জীবন্মুক্তি গীতা, অবধূত গীতা, ষড়জ গীতা, হংস গীতা, মস্কি গীতা, ব্যাস গীতা, পাণ্ডব গীতা, শ্রীমদগীতাসার, পিতৃগীতা, পৃথিবী গীতা, শ্রীসপ্তশ্লোকা গীতা, পরাশর গীতা, উত্তর গীতা, গীতাসার, রাম গীতা, শান্তি গীতা, শিব গীতা, ভগবত গীতা, দেবী গীতা, বোধ্য গীতা, তুলসী গীতা, গর্ভ গীতা, বৈষ্ণব গীতা, যম গীতা ও হারীত গীতা।

এই গীতাগুলির মধ্যে শিব গীতা তেরটি অধ্যায়ে অবধূত ও শান্তি গীতা আটটি অধ্যায়ে পরাশর গীতা সাতটি অধ্যায়ে, ভগবতী গীতা পাঁচটি অধ্যায়ে, দেবী গীতা দশটি অধ্যায়ে, উত্তর গীতা তিনটি অধ্যায়ে এবং বৈষ্ণব গীতা, যম গীতা ও হারীত গীতা যথাক্রমে একটি করে অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে।

সমস্ত গীতাগুলির আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই ভগবতী গীতা ও বৈষ্ণব গীতা সম্বন্ধে কিঞ্চিত নিবেদন করবো। ভগবতী গীতা মুমুক্ষু অর্থাৎ জিজ্ঞাসু হিমালয়কে, ব্রহ্মময়ী ভগবতী দুর্গা স্বল্পায়াসে কি প্রকারে ভববন্ধন ছিন্ন করে, কি করে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাই সুস্পষ্টভাবে উপদেশ দিয়েছেন। এই গীতাটি সম্প্রতি নবদ্বীপের পণ্ডিত মহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তার সুললিত পদ্যানুবাদ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। সংস্কৃত শ্লোকের পরিবর্তে তাঁর অনুবাদ এখানে দিলাম। দেবী বলছেন:

সংসার দুঃখ হইতে নিবৃত্তি কামনা।
যদি কর তাত। তবে মম আরাধনা॥
কর ভক্তি সমাযুক্ত সমাহিত মনে।
আমাকেই ব্রহ্মরূপা সনাতনী জেনে॥ (৩ অঃ ৪৫ শ্লোঃ)

অতঃপর দেবী বলছেন :

মতিমান মনুষ্যের আমিই সুমতি।
পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ আমি গিরিপতি॥
আমিই অনলের বল প্রভা চন্দ্রমার।
তপস্বীর তপ আমি, তেজ ভাস্করের॥
যেই বলে, কাম ক্রোধ আদি দোষ নাই।
বলবান নরের সে বল আমি হই॥
কর্মমধ্যে পুণ্যকর্ম আমি পিতৃদেব।
ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, বীজের প্রণব॥
সকল প্রাণীর মধ্যে ধর্ম অবিরোধী।
কাম, আমি হই ইহা বুঝিবেন সুধী॥
এ ভিন্ন এ সংসারে রয়েছে অবশেষে।
পদার্থে সাত্ত্বিক আর রাজস তামস॥
সে সকলি আমা হতে উৎপন্ন হয়েছে।
গিরিবর আমারই সমাশ্রিত আছে॥
ভক্তিযোগে যে আমার ভজনা করিবে।
সে আমার এই মায়া তরিতে পারিবে॥
জগত সৃষ্টির জন্য আমি ইচ্ছামত।
স্ত্রী পুরুষ দুইরূপ হইয়াছি জিতঃ॥

(৭ অঃ ৬-১১ শ্লোঃ)

বৈষ্ণব গীতায় রাজা অম্বরীষ ও দেবর্ষি নারদের প্রশ্নোত্তর বিধৃত আছে। দশটি শ্লোকে এই গীতা সমাপ্ত। প্রথম শ্লোকে রাজা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে মহাভাগ দেবর্ষে! যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তাহলে দয়া করে কি উপায়ে ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়, তা আমায় বলুন।

নারদ রাজার প্রশ্নের উত্তরে যা বলেন, সেইগুলি হচ্ছে অবশিষ্ট শ্লোকগুলি প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি বলেন :

কৈবল্যদায়িনী গীতা শ্রীবৈষ্ণবগীতা ভিধা।
শৃণুষ পরয়া ভক্ত্যা ভববন্ধ বিমুক্তয়ে ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবগীতা নামে যে গীতা আছে, তার প্রসাদেই কৈবল্য লাভ হয়ে থাকে। তুমি ভববন্ধ মোচনের জন্য পবমাভক্তি সহকারে তা শোন। তারপব নারদ বললেন, হে নৃপসত্তম! যেখানে বৈষ্ণবেরা গমন করেন এবং যেখানে তাঁদের পাদস্পর্শ হয় সেখানে নিত্য সর্বতীর্থ অধিষ্ঠিত থাকে। "তত্র সর্বাণি তীর্থাণি তিষ্ঠন্তি"। বৈষ্ণবদের সঙ্গে আলাপ করতে তাঁদের গাত্র স্পর্শ করতে এবং তাঁদেব পদবন্দনা কবতে সব তীর্থ ইচ্ছা করে।

তারপর নারদ বললেন: হে রাজন! বিষ্ণুমন্ত্র উপাসকদের শুভপ্রদ পাদোদক পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত যাবতীয় নিখিল তীর্থকে পবিত্র করে। রাজা বললেন: আমি দীর্ঘ সংসারমার্গে বিচরণ করে প্রপীড়িত ও শ্রান্ত; পুনরায় যাতে আর এ পথে গমন করতে না হয়, হে বৈষ্ণব কৃপা করে তা বলুন। আমি দীন, ভক্তিহীন, আধিব্যাধি প্রপীড়িত, অনাথ, হে প্রভো কৃপা করে আমায় পরিত্রাণ করুন। রাজাব কথা শুনে নারদ শেষে বললেন:

গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি সত্যং শ্রীবৈষ্ণবং বিনা।
তৎপাদবজসা পুতং ত্রৈলকং সচরাচরম ॥

আমি সত্যই বলছি। বৈষ্ণব ছাড়া সংসার থেকে পরিত্রাণের আর অন্য গতি নাই; বৈষ্ণব চরণধূলিতে সকল ত্রিভুবন পবিত্র হয়। আমি তোমাকে যে বৈষ্ণব গীতা রহস্য কীর্তন করলাম তা "অভক্তায় ন দাতব্য" অভক্তকে কখনও বলবে না, যদি বলো তাহলে "দত্তে তু নারকী ভবেৎ" নরকবাস ঘটবে।

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী আর গোবিন্দ গকার যুক্ত এই চারটি কথা যাঁর হৃদয়ে অবস্থিত হন, তাঁর "পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" আর জন্ম হয় না—মহাভারতের এই কথাটি স্মরণ রাখলে আমাদের মঙ্গল হবে।

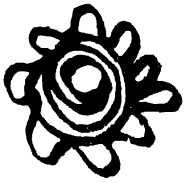

গীতা শ্লোকের ছন্দ

শ্রীমদভাগবত গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী এই দু'খানি ধর্ম-গ্রন্থের আকৃতি, প্রকৃতি ও শ্লোক সংখ্যার সাদৃশ্য নিয়ে ভাদ্র মাসের সংহতিতে (১৩৭৮) অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী যে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন, তা পড়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু তিনি "উভয় গ্রন্থই সরল সংস্কৃত ভাষায় অনষ্টুপ ছন্দে রচিত, উভয় গ্রন্থেই মাঝে মাঝে কিছু কিছু ১১ অক্ষর বিশিষ্ট 'উপজাতি' ছন্দের সংস্কৃত পদ্যও আছে" বলে যা লিখেছেন, সে সম্বন্ধে আমার মনে হয় কিছু ত্রুটি আছে!

উভয় গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা সাতশো বলে এ দুটি গ্রন্থই 'সপ্তশতী' বলে খ্যাত। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা অনুষ্টুপ ছাড়া কেবল উপজাতি নয়, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ও বিপরীতপূর্বা ছন্দে রচিত হয়েছে। লেখক কিন্তু সে কথার উল্লেখ করেন নি। গীতার সাতশো শ্লোকের মধ্যে ৬৪৫টি শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত এবং অবশিষ্ট ৫৫টি শ্লোক যে যে ছন্দে রচিত হয়েছে এখানে তা উল্লিখিত হলো। যথা:

ইন্দ্রবজ্রা:—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭, ২৯ শ্লোক, অষ্টম অধ্যায়ের ২৮ শ্লোক নবম অধ্যায়ের ২০ শ্লোক, একাদশ অধ্যায়ের ২০, ২২, ২৭, ৩০ শ্লোক এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোক।

উপেন্দ্রবজ্রা:—একাদশ অধ্যায়ের ১৮, ২৮, ২৯, ৪৫ শ্লোক।

উপজাতি:—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫, ৬, ৮, ২০, ২২, ৭০ শ্লোক, অষ্টম অধ্যায়ের ২১ শ্লোক, একাদশ অধ্যায়ের ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০ শ্লোক।

বিপরীতপূর্বা:—একাদশ অধ্যায়ের ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৪ শ্লোক।

অনুষ্টুপ ছন্দের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা হচ্ছে ৮ এবং এর প্রত্যেক চরণের বর্ণ লঘু ও ৬ষ্ঠবর্ণ গুরু এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের ৭ম বর্ণ লঘু হয়ে থাকে।

ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি ও বিপরীতপূর্বা ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১১টি ক'রে অক্ষর থাকে। অনুষ্টুপ ছন্দের সঙ্গে ইন্দ্রবজ্রাদি অপর চারটি ছন্দের

এই হচ্ছে পার্থক্য অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা এই ছন্দগুলিতে ৮ এর পরিবর্তে হয়েছে ১১। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম বর্ণ লঘু হয় এবং এর প্রতি চরণের প্রথম বর্ণটি হ্রস্ব হলে তাকে উপেন্দ্রবজ্রা বলে।

ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিলনে প্রধানতঃ উপজাতি ছন্দ রচিত হয় অর্থাৎ চারটি চারণের একটি, দু'টি বা তিনটি ইন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্ট উপেন্দ্রবজ্রা হলে অথবা একটি, দু'টি বা তিনটি উপেন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্ট ইন্দ্রবজ্রা হলে এই মিশ্রিত ছন্দটিকে উপজাতি ছন্দ বলে অভিহিত করা হয়। এই উপজাতি ছন্দটির কথাই কেবল লেখক উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া চার চরণের প্রথম চরণটি ইন্দ্রবজ্রা এবং অপর তিনটি চরণ উপেন্দ্রবজ্রা হলে উহা বিপরীতপূর্বা ছন্দ নামে কথিত হয়ে থাকে। অনুসন্ধিৎসুক পাঠক এই সব প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ছন্দের বিবরণ পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের 'ছন্দো-বোধিকা' গ্রন্থে পাবেন।

এই সপ্তশতী গ্রন্থদ্বয় পাঠ করলে যেমন যজ্ঞ সমূহের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে শ্রীহরি শ্রেষ্ঠ, ঠিক সেই রকম স্তব সমূহের মধ্যে সপ্তশতী শ্লোক শ্রেষ্ঠ বলে জানা যায়।

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুষু দেবানঞ্চ যথা হরিঃ।
স্তবানামপি সর্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ॥

তাই আবহমানকাল থেকে এই দু'টি মহাগ্রন্থ আমাদের দেশে ভক্তিমান ব্যক্তিগণ বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ ক'রে থাকেন এবং দৈব ও পৈত্র্য উভয়বিধ কার্যে সপ্তশতী স্তব পাঠ না করলে তা শুদ্ধ হয় না।

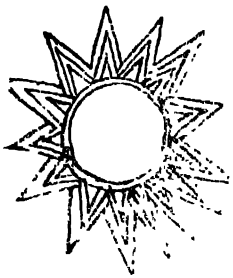

শ্রীহরির বাঙ্ময়ী মূর্তি

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ "শ্রীমদ্ভাগবত" কে বলা হয় শ্রীহরির বাঙ্ময়ী মূর্তি। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে বা কলিযুগ

আরম্ভ হবার ত্রিশ বছর পরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভাদ্র মাসের শুক্লা নবমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই সাতদিন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভারতসম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎকে যে ভাগবতী কথা শোনান তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলে খ্যাত। ভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলে কথিত হলেও, এই গ্রন্থে যে সব বিশ্বজনীন উদার ধর্মভাব নিহিত আছে, তা পাঠ করলে কেবল বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী নন, পৃথিবীর যে কোন সম্প্রদায়ের যোগী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, ভক্ত, গৃহী, কর্মী সকলেই নির্মল আনন্দ অনুভব করবেন। ব্যাসদেব-রচিত দ্বাদশটি স্কন্ধে বিস্তৃত এই মহাগ্রন্থের যে সংস্করণ অধুনা পাওয়া যায় তার শ্লোকসংখ্যা ১৪ হাজার ১ শত ৩ টি। সাধারণতঃ বলা হয়, শ্লোক-সংখ্যা ১৮ হাজার।

ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধের মধ্যে প্রধানতঃ বর্ণিত আছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও তাঁর মানবলীলার কথা। শ্রীকৃষ্ণ মানবশিশুরূপে মথুরায় জন্মগ্রহণ করলেন। গোকুলে ও বৃন্দাবনে বাল্যকাল অতিবাহিত করে মথুরায় গিয়ে কংসকে নিধন করলেন। দ্বারকায় রাজ্যস্থাপন করে প্রজাপালন করলেন, পরিশেষে মানবলীলা সম্বরণ করে তিনি তিরোধান করলেন, এই হচ্ছে মোটা-মুটি ভাগবতের মূল কথা। কৃষ্ণলীলারসে আপ্লুত ভক্তিপ্রধান এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদের কাছে তাই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহরূপে পূজিত হন। ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মত শ্রীমদ্ভাগবতকেও পূজা করেন কারণ শ্রীভাগবত-গ্রন্থ যদি কৃপা করেন তবেই ভক্তিলাভ করা সম্ভব হয়। "তেনয়ং বাঙ্ময়ী মূর্তি", কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের তেজ ভাগবতসমুদ্রে রেখে অন্তর্হিত হন, এ কথা পদ্মপুরাণে লেখা আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেরস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও শ্রবণকে ফলপ্রসূ করতে হলে বক্তা ও শ্রোতা--উভয়ের ঐকান্তিক সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। চৈতন্যচরিতামৃতে তাই আছে: "যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥" অর্থ ও যশের আশায় যাঁরা ভাগবত পাঠ করেন, তাঁদের মুখে ভাগবতশ্রবণ কখনও ফলপ্রসূ হয় না। শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণপাদোদ্ভূতা গঙ্গা স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করে থাকেন, সেই রকম ভাগবত-কথা-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন —প্রশ্নকর্তা, বক্তা, ও শ্রোতা এই তিন জাতীয় ব্যক্তিকে সমভাবে ধন্য ও পবিত্র করে থাকে।

প্রকৃত বৈষ্ণব বা শুদ্ধানুরাগী বক্তা ছাড়া, যাঁরা ভাগবতপাঠকে একটি

অর্থকরী পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ছলধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন, বলা যায়। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় :

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥
ছলধর্ম ছাড়ি' কর সত্যধর্মে মতি।
চতুর্বর্গ ত্যজি' ধর নিত্য প্রেমগতি॥ (জৈবধর্ম)

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী শুদ্ধানুরাগী বক্তা সম্বন্ধে লিখেছেন : শ্রীভাগবতের প্রতি আন্তরিক প্রীতিবশতঃ উহার আলোচনায়, উহার কীর্তনে, উহার আস্বাদনেই যাঁর প্রবল আসক্তি, অন্য কোন বস্তুতে চিত্ত আকৃষ্ট নহে, তাঁকেই শুদ্ধানুরাগী বক্তা বলা যেতে পারে। এই জাতীয় বক্তা শ্রীভাগবতকীর্তন করতে পারলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। শুদ্ধ শ্রোতাদের প্রতি কৃতজ্ঞ নিষ্কিঞ্চন ভাগবত পাঠকের উক্তি—"এই সমস্ত সাধু শ্রোতা আমার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে কত বাধা, ক্ষতি স্বীকার করেও ক্লেশপূর্বক বসে শ্রীভাগবতীয় কথা শ্রবণ করছেন। এঁরা অনুগ্রহপূর্বক শ্রবণ করছেন বলেই তো আমি শ্রীভাগবতকথা উচ্চারণ করবার সৌভাগ্য পেলাম। আমার রসনা পরম পবিত্র শ্রীভাগবতীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাকে চরিতার্থ করছে। ইঁহারাই দয়া করে আমাকে কৃতার্থ করছেন।" এই জাতীয় বক্তা কোনরূপ অর্থ বা দ্রব্যলাভ কিংবা যশ ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষায় শ্রীভাগবত পাঠ করেন না।

শ্রীব্যাসদেব মহাভারত ও ভাগবত-এর প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বর্ণনার আগে নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী ভারতীকে নমস্কার করে 'জয়' উচ্চারণ করেছেন। তৎপর লিখেছেন বিষয়বস্তু। সমস্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবার আগে এই শ্লোকটী উচ্চারণ করার রীতি তাই ধর্মসমাজে প্রচলিত। শ্লোকটি হচ্ছে :

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অর্থাৎ নারায়ণ, নরোত্তম, নর-নামক ঋষি, দেবী সরস্বতীকে ও ব্যাসাসনে উপবিষ্ট শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করে জয় উচ্চারণ করবে। 'জয়' শব্দের অর্থ—এই গ্রন্থের (মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির) দ্বারা সংসার জয় হয় এতদ্ব্যতীত জয়-শব্দের অর্থ—নমস্কার অথবা সর্বোৎকর্ষের সহিত বিদ্যমান।

ভাগবতের অসংখ্য টীকার মধ্যে শ্রীধরস্বামিকৃত 'ভাবার্থ দীপিকা' শ্রীজীব গোস্বামিকৃত 'ক্রমসন্দর্ভ' ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' বাঙলাদেশে পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। এই তিন মহাপণ্ডিত তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থের

প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ করেন, তার বঙ্গানুবাদ কিছু এখানে পাঠকবর্গের আস্বাদনের জন্য উল্লেখ করছি। গ্রন্থরচনার পূর্বে আপন ইষ্টদেব ও গুরুবর্গের বন্দনাদির নামকে বলা হয় মঙ্গলাচরণ।

শ্রীধরস্বামিকৃত মঙ্গলাচরণ

শ্রীনৃসিংহায় নমঃ। শ্রীনৃসিংহদেবকে নমস্কার করি। বিশ্বসৃষ্টি-বিসৃষ্ট্যাদি নব-লক্ষণ দ্বারা সঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণনাম—জগতের আশ্রয়—সেই বিগ্রহকে প্রণাম করি। এই নবলক্ষণের বিবৃতির জন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হলো। যথা:

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥

ইহাতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয় আছে। সর্গ থেকে মুক্তি পর্যন্ত নয়টি লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত সেই আশ্রয়-পদার্থ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। দশম স্কন্ধে যিনি আশ্রয়-বিগ্রহরূপে গৃহীত হয়েছেন এবং যিনি যদুকুলরূপ বারিধিতে ক্রীড়াকারী পরানন্দ বলে কথিত হন। তাতেই সেই দশম পদার্থ আশ্রয় লক্ষিত হচ্ছে।

দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সৎকীর্তি বিস্তারের জন্য দুষ্ট নৃপতিগণ কর্তৃক ধর্মের গ্লানি হওয়ায় তাঁদের বিনাশ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ব স্কন্ধাদিতে প্রসঙ্গীরূপ সৃষ্টি-সংহারাদি নিরূপণ দ্বারা প্রাকৃতাদি চারি প্রকার প্রলয় বর্ণিত হয়েছে। দশম স্কন্ধে নবতি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তি বর্ণনের মধ্যে—প্রথম চার অধ্যায়ের দ্বারা ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর ভার হরণ করার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম নিরূপিত আছে। শ্রীকৃষ্ণলীলা, ক্রমে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকাভেদে তিন প্রকার। গোকুলবাসী শ্রীকৃষ্ণের মহাবন ও বৃন্দাবনাদিতে দেবদুর্লভ লীলা বর্ণিত হয়েছে। পরে এক অধ্যায়ে যমুনাজলে অক্রূর কৃত স্তব, একাদশ অধ্যায় দ্বারা মথুরালীলা এবং অবশিষ্ট অধ্যায় সমূহে দ্বারকা নির্মাণাদি দ্বারাবতীলীলা বর্ণিত হয়েছে।

জীবগোস্বামিকৃত মঙ্গলাচরণ

বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল ও দীনানুগ্রহকারী শ্রীগোবিন্দকে আমি বন্দনা করি। প্রেমভক্তি বিস্তার করার জন্য যিনি গৌড়দেশে অবতীর্ণ হয়েছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি। যিনি জগতে কৃষ্ণভক্তিরূপ কল্পতরুকে অঙ্কুরিত করেছেন—সেই শিষ্যগণের সঙ্গে সন্ন্যাসীরাজ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে আমি নমস্কার করি। যিনি এই ভাগবতনিধি প্রাপ্তির জন্য টীকা প্রণয়ন করে বুঝিয়েছেন—

সেই ভক্তির একমাত্র রক্ষক শ্রীধরস্বামিপাদকে বন্দনা করি। বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য, গুরু মধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতি ও গৌড়দেশভূষণ বিদ্যাভূষণ, রসের আলয় শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র এবং উপদেষ্টা বাণীবিলাস প্রভৃতি মহোদয়গণকে আমি বন্দনা করি। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীনিত্যানন্দাবধূত ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে প্রণাম করি। যাঁহাদিগের চরণরজঃ স্পর্শমাত্রে অধম ব্যক্তিও উত্তম হয়—সেই সকল চৈতন্যপার্ষদ শ্রীদামোদর স্বরূপাদিকে, শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমুরারী গুপ্ত ও অন্য চৈতন্যসেবকদিগকে এবং বৃন্দাবনপ্রিয়গণকে বন্দনা করি। শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিত শ্রীমৎ কাশীশ্বর, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীকৃষ্ণদাসকে আমি বন্দনা করি।

যাঁদের উৎসাহে আমি অত্যন্ত সাহসে প্রবৃত্ত হয়েছি, সেই দীনানুগ্রহব্যগ্র বৈষ্ণবগণ আমার একমাত্র আশ্রয়। রাধাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিশেষে পুষ্ট প্রেমময় শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ দাস—এই দুই যাঁর সুহৃদ ও সহায়—তাঁর আবার কোন অর্থ সিদ্ধ না হয়? এই বৈষ্ণবতোষিণী টিপ্পনী, যাঁর আদেশে আমি লিখছি, সেই অখিল-গুণনিধি শ্রীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রীতির বিষয় হোক। এর কিছু আমি স্বয়ং লিখেছি, কিছু যোগ্য ব্যক্তিগণ লিখেছেন। এতে যা ছিদ্র (ত্রুটি বা ভ্রম) আছে, তা বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ দয়া করে শোধন করবেন। শ্রীচৈতন্যকৃপাদ্বারা ব্যাপ্ত যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম, সেই প্রেমের জন্য যে জনগণ ইচ্ছুক, অর্থাৎ নিরতিশয় লালায়িত, তাঁদের এই বৈষ্ণবতোষিণী উত্তম আস্বাদনের যোগ্য।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত মঙ্গলাচরণ

শ্রীমৎ নিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ও শ্রীঅদ্বৈত পৃথিবীতে প্রেমসিন্ধু বর্দ্ধন ক'রে, উত্তপ্ত স্তম্ভবিশেষে আমার ন্যায় অজ্ঞান জড়কে শীতল করতে করতে চেতন করে নিজ কৃপাকিরণদ্বারা সুখী করুন। হে শ্রীমদ্ গদাধর, শ্রীনরহরি, শ্রীরামরায়, শ্রীস্বরূপ, স্বানুগ শ্রীরূপ ও শ্রীমৎ সনাতন! তোমাদের সকলকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। শ্রীমদ্ভাগবতের দিব্য দশম স্কন্ধরূপ অমৃতসমুদ্রে যিনি খেলা করতে করতে নিজ করোদ্ধৃত রসকণাদ্বারা তটস্থিত সকল ব্যক্তিকে আর্দ্র করেছেন—যাঁর মাহাত্ম-মিলিত উৎসব শ্রীরূপ সর্বজনকর্তৃক প্রশংসিত নাটকবরে আশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ করেছে, এবং পরমহংস-পথ বলবার জন্যে যাঁরা এই জগতে প্রকাশ হয়েছিলেন, সেই সিদ্ধ সনকাদি চতুঃসনের মধ্যে যিনি তৃতীয়, অর্থাৎ সনাতনরূপে পূর্বে ছিলেন, তিনি সম্প্রতি ভক্তগনের মধ্যে অগ্রের অর্থাৎ সাধন-

ভক্তির সঙ্গে গোপ্য ভক্তিরসকে সঞ্চার করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই শুদ্ধ বিশ্বগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে আমি প্রণাম করি। যাঁর দ্বারা বৈষ্ণবতোষিণী ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, যে বৈষ্ণবতোষিণীর রস চমৎকাররূপে আস্বাদিত করিয়ে সহৃদয় ব্যক্তিদের আনন্দিত করে শোভা পাচ্ছে, সেই সনাতনের মুখ হতে নিঃসৃত ভক্তিরসের দু-তিন কণা সঞ্চয়পূর্বক আস্বাদান করে আমি নিজজনকে কৃতার্থ করবো. এই আশা আমার হৃদয়ে অতিশয়রূপে বর্তমান রয়েছে। যাঁদের করুণা-গঙ্গায় স্নাত হয়ে পাপরাশি নষ্ট করে আমি বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হতে সমর্থ হবো, সেই শ্রীগোপাল ভট্ট, ও শ্রীরঘুনাথের পদরেণু আমার মস্তকের ভূষণ। আমি শ্রীলোকনাথচরণ ও শ্রীজীবপাদকে বন্দনা করি।

অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন নষ্ট দৃষ্টি আমাদের জন্য যিনি ভাবার্থ-দীপিকা প্রণয়ন করেছেন, সেই কৃপালু শ্রীধরস্বামী আমার এই বিষয়ে একমাত্র গতি। তাঁর যা যা ভক্ত চিত্তানন্দদায়িনী ব্যাখ্যা, গোস্বামিপ্রভুদের ঐরূপ ব্যাখ্যা এবং শ্রীমদ্ গুরুকৃপায় প্রকাশিত ব্যাখ্যাই লিখবো। জগচ্চক্ষু লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ করুণা-সাগর শ্রীগুরুদেবকে পুর্নবার প্রণাম কবে শ্রীশুকদেবকে আশ্রয় করছি। অতি প্রভাবশীল গোপাঙ্গনা-প্রিয়কে তাঁর প্রিয় দাস্যের জন্য আমি আমার সমস্ত প্রদান করি।*

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ১৩৪২ বঙ্গাব্দে (১৪ আগষ্ট, ১৯৩৫ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ পর্যন্ত) ভাগবত সম্বন্ধে ষোলটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। তাঁর সেই ভাষণগুলি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ, সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকীতে "শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা" নামে প্রকাশ করেন। ভাগবতের এত সুন্দর, সরল ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় বিরল। নিম্নে সরস্বতী ঠাকুরের কয়েকটি লাইন উদ্ধার করে আমি এই নিবন্ধের উপসংহার করছি। তিনি লিখেছেন:

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সম্বন্ধ বিচারে আমরা জানতে পারি যে, সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ বহু ব্যক্তির সহিত কোন এক ব্যক্তির সম্বন্ধ। সম্বন্ধ নির্ণীত হবার পর অভিধেয়-বিচার অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার ফল প্রয়োজন। এই তিনটি তত্ত্বই ভগবান্‌কে

---

*শ্রীধরস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মঙ্গলাচরণের বঙ্গানুবাদ শ্রীভগবদ্দাসানুদাস শীতলপ্রসাদ কর্তৃক সম্পাদিত ১৩১৮ সালে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম) থেকে গৃহীত।

আশ্রয় করে আছে।

বেদশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত বেদপ্রতিপাদ্য এই ত্রিতত্ত্বের বিষয়েই বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধবিচারে সেই অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ের আলোচনা এবং অভিধেয়বিচারে তাঁর প্রতি নিষ্ঠার কথা ও প্রয়োজনবিচারে প্রেমভক্তির প্রাপ্তিকে বিচার করেছেন। বেদান্তের সার হচ্ছেন ভাগবত-গ্রন্থ। তাতে কি আছে? না 'ব্রহ্মাদ্বৈকত্ব লক্ষণং'—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ একই বস্তু, ভাগবত সেই ভগবদভিন্নবিগ্রহ।

এই গ্রন্থ যেই ক্ষণে পুণ্যবান্ জন।
মহাভাগ্যে করিবেন শ্রবণ কীর্তন॥
সেই ক্ষণে সুখঘন মূরতি শ্রীহরি।
অবরুদ্ধ হৃদে হবেন গোলকবিহারী॥

তখন "বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি—বল ভাই ধন্য হরি" এই হবে মূল মন্ত্র।

"ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্য পাটে,
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে, ধন্য হরি ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি,
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে, ধন্য হরি হাসি মুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে, ধন্য হরি ধন্য হরি।
আপনি কাছে আসেন হেসে, ধন্য হরি ধন্য হরি,
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে, ধন্য হরি ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয় পদ্মদলে চরণ আলোয় ধন্য করি।"

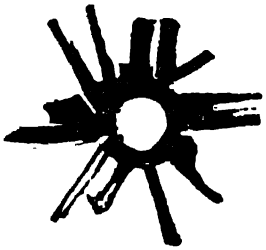

শিব মহিমামৃত

শিবের মত জনপ্রিয় দেবতা ভারতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শিবহীন কোন গ্রাম বড় একটা দেখা যায় না, কারণ বাঙালীর তিনি পরমপিতা, গৃহদেবতা ও গ্রাম্যদেবতা। তাঁর এই প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা কত যুগের কত কালের তা জানা যায় না। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে শিবপূজা সম্ভবত পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হলেও ওদেশের মত ইহা কামচর্চার সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিল না, ভারতে শিবলিঙ্গের পূজা ছিল সম্পূর্ণ ব্রহ্মবাদী অদ্বৈততত্ত্ব।

তন্ত্রবচনে দেখা যায় যে, আগে শিবপূজা করবে, তারপর করবে শক্তিপূজা আদৌ শিবং পূজয়িত্বা শক্তিপূজা ততঃ পরং। এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১৩।১৬) "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" বলে তাঁকে বলা হয়েছে পরমবৈষ্ণব। শৈবধর্মের প্রভাব আমাদের দেশে সুদূর অতীতকাল থেকে কীভাবে এখনও অটুট রয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

শিবকে বাঙালী তাদের মনের মানুষ করে নিয়েছিল বলে প্রবচনের মতন প্রচলিত হয়েছিল 'ধান ভানতে শিবের গীত'। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙলায় কৃষি ছিল একমাত্র বাঙলার সম্পদ, তাই বাঙলাকে বলা হতো 'সোনার বাঙলা'। কৃষি ও কৃষক ছিল এই সম্পদের উৎস। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে সেই জন্য কবির চোখে শিব হয়েছিলেন কৃষক। শূন্যপুরাণের রামাই পণ্ডিত থেকে শুরু করে শিবায়ণের রামেশ্বর পর্যন্ত শিবের চাষ করার কথা তাঁদের কাব্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী শিবপূজা করলে কী ফল হয়, তাও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সুন্দরভাবে লিখেছেন। যথা :

যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপূজা।
কত জন্ম অবনীমণ্ডলে হয় রাজা ॥
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় ঋণী ॥

পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম হাণ্টার বলেছেন: শিব তাঁর দু-রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য উচ্চ ও নীচ এই উভয় শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কেবল পরমেশ্বর রূপে পরিগণিত হন। তিনি হচ্ছেন আধুনিক হিন্দু সমাজের মহাদেব অর্থাৎ মহা ঈশ্বর বা মহেশ্বর। আর তাঁর সহধর্মিণী হচ্ছেন বস্তুতঃ সকলের উপর থাকে তাই বলা হয় দেবী, এককথায় পরমাপ্রকৃতি; শিব আর্য বা ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রকাশের জন্য গভীর চিন্তামগ্ন গৌরবর্ণ এক পুরুষরূপে উপবিষ্ট, মাথায় গঙ্গার উর্বরতা স্বরূপ সঙ্কেত এবং তাঁর হাতের কাছে আছে একটি ষাঁড, আর্যরা যাকে উৎপাদনের তুল্য প্রতীকরূপে মনে করেন। বন্যভাবে অনার্য চরিত্রের প্রকাশ হয়েছে তাঁর গলায় হারের মত মুণ্ডমালা, সর্প দিয়ে কণ্ঠবেষ্টিতা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং তাঁর হাতে আছে একটি মানুষের মাথা। শিবের মূর্তি চতুর্ভুজ ও তাঁর পঞ্চমুখ।*

প্রাচ্যদেশীয় শিল্পে শিবমূর্তি (A Brief History of India) কেবল লিঙ্গাকারে দেখানো হয়নি, তাঁকে ভৈরব, তাণ্ডব, বিরূপাক্ষ ইত্যাদি নানারূপে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া একমাত্র হুগলীতে তাঁকে যে কত নামে বিরাজ করতে দেখেছি, তার কয়েকটি নাম উল্লেখ্য। যথা: ঈশানেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, ব্রজেশ্বর, শীতলেশ্বর, গঙ্গাধর, দামোদর মল্লেশ্বর, অম্বিকেশ্বর, রামেশ্বর, ঘণ্টেশ্বর, মানিকেশ্বর, থানেশ্বর, বদ্রেশ্বর, শৈলেশ্বর ভূতনাথ, হরনগরেশ্বর, ষণ্ডেশ্বর, রাঘবেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন, তারকনাথ, লোকনাথ, গোপেশ্বর, কল্যাণেশ্বর, বানেশ্বর, গঙ্গানাথ, রামেশ্বর, টাটেশ্বর, জলেশ্বর, ফুলেশ্বর, সীতারাম, রামনাথ, জটেশ্বর, তারকেশ্বর, জটিলেশ্বর, গৌড়েশ্বর, নকুলেশ্বর, স্বয়ম্ভুদেব, অখিলেশ্বর, গৌরীশঙ্কর, চন্দ্রশেখর, ভুবনেশ্বর, মহেশ্বর, সর্বেশ্বর, হংসেশ্বর, পাতালেশ্বর, নেপালেশ্বর, শশীশেখর, বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর, যোগেশ্বর, চণ্ডীশ্বর ইত্যাদি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিবপূজা সম্বন্ধে সোজা কথায় বলতেন: শিব পূজার ভাব কি জান? শিবলিঙ্গের পূজা মাতৃস্থানের ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই বলে পূজা করে, ঠাকুর দেখো যেন আর জন্ম না হয়। শোনিত শুক্রের মধ্যে দিয়া মাতৃস্থান দিয়া আর যেন আসতে না হয়।**

মহাদেবের মূর্তি দুরকম—এক মূর্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্তি মঙ্গলময়। পৌরাণিক যুগে শিব-দেবতা প্রধানতঃ সংহারকর্তা বলে পূজিত হলেও তাঁর

---

* হুগলী জেলার দেব দেউল, পৃষ্ঠা ১৬৭ দ্রষ্টব্য।

** শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, ১৯শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

উপাসকদের কাছে তিনি অতীতকাল থেকে জগৎস্রষ্টা ও সকলের পিতা জগৎ-পিতা বলে আজও পরিগণিত ও পূজিত হচ্ছেন। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলে শিবের অষ্টমূর্তি ও তাঁর বিশেষ সংজ্ঞা সবিস্তারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, "জল, অগ্নি, যজমান, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী এবং বায়ু এই প্রত্যক্ষ অষ্টমূর্তি বিশিষ্ট মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তোমাদের রক্ষা করুন।" পৌরাণিক ধর্মের সূত্রপাতেই ভারতবর্ষে শিব উপাসনা আরম্ভ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ শিবের বিষয় অপূর্ব রামায়ণে বলেছেন: "আমাদের শিব শ্মশানবাসী—আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যু-নিকেতনে।" (পঞ্চভূত)

শিবরাত্রি

সারা ভারতবর্ষে শিবরাত্রি একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। শিবরাত্রি ব্রত-র মূলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা থেকে জানা যায় যে, শিব চতুর্দশীর ঘোর অন্ধকার রাত্রে চার প্রহরে চারবার শিবপূজা করলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। প্রার্থিত বরলাভ হয়। সকল বয়সের নারী পুরুষই এই শিবরাত্রি ব্রত পালন করে থাকেন। শিবরাত্রির লোককথা হল, এক ব্যাধ চললো তীর ধনুক নিয়ে গভীর অরণ্যের মাঝে। জীবনে সে ব্যাধ অনেক পশু পাখি বধ করেছে। আজও সে যথারীতি জন্তু জানোয়ার বধ করে আপন ঝোলায় ভরতি করে কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু গভীর অরণ্যের মাঝে পথ হারাল সে। এ-দিকে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল ধীরে ধীরে। শ্বাপদ সঙ্কুল জঙ্গলের মাঝে অতি কাছের জিনিসও দেখতে পেল না ব্যাধ, এমন কি অন্ধকারের মাঝে, দিশেহারা হয়ে সামনে হাতড়ে যে গাছটি পেল, তাতেই উঠে বসল শেষ

পর্যন্ত হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। মৃত জন্তু জানোয়ারে ভরতি কাঁধের থলেটা ঝুলিয়ে রাখল গাছের ডালে। বাড়িতে অনাহারী স্ত্রী পুত্র কন্যার শুকনো মুখগুলির কথা মনে পড়ল তার। সারা দিন রাত অনাহারে তারা আছে। না জানি কত কষ্ট হচ্ছে ওদের এখন ক্ষুধার যন্ত্রণায়! এই ভেবে মনের দুঃখে ব্যাধের দু-চোখ ভরে জল এসে গড়িয়ে পড়ল দু'গাল বেয়ে। সেই সঙ্গে দুটো শুকনো পাতাও ঝরে পড়ল তলায়। সে ব্যাধ জানতো না যে সেদিন ছিল শিব চতুর্দশীর রাত্রি। যে গাছে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সেটা ছিল বেলগাছ। আর তার তলায় ছিল একটা শিবমূর্তি। তাঁর মাথায় পড়ল মহাপাপী ব্যাধের চোখের জলে ভেজা দুটো বেলপাতা। ব্যাস, ব্যাধের অজ্ঞাতেই হয়ে গেল শিবরাত্রি ব্রত পালন। অনাহারে অনিদ্রায় অশ্রুসিক্ত বিল্বপত্রদ্বয় দিয়েছে সে শিবের মাথায়। তুষ্ট হয়েছেন মহাদেব। অন্তিমে তাই শিবলোকে বাস হবে এই ব্যাধের।

ব্যাধের অন্তিমকালে যথারীতি যমদূতেরা এল ব্যাধকে যমালয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। মহাপাপী ব্যাধের জন্য সেখানে প্রস্তুত রয়েছে জীবহত্যার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। এদিকে যথারীতি শিবদূতেরাও এসে উপস্থিত হল। ব্যাধের জন্য সেখানে প্রস্তুত রয়েছে নানারকম সুখের সব ব্যবস্থা। ব্যাধকে নিয়ে যাবার অধিকার নিয়ে শিবদূতদের সঙ্গে যমদূতের বাঁধল তর্ক-বিতর্ক, পরে হাতাহাতি অবশেষে রীতিমত লড়াই। কেউ কম যায় না। দু'দলেরই এক কথা। ব্যাধকে নিয়ে যাবার অধিকার থেকে কেউ নড়তে চায় না। অবশেষে শিব ও যম এলেন সেখানে। যম দিলেন ব্যাধের সব পাপের ফিরিস্তি। শিব দিলেন সে পাপ মোচনের সংবাদ। শিব বললেন: অনাহারে অনিদ্রায় শিবরাত্রি ব্রত পালন করেছে এই ব্যাধ, সে জন্য সকল পাপকে আমি ক্ষমা করেছি।

সব শুনে যমরাজ নত মস্তকে ফিরে গেলেন যমপুরীতে, পিছে পিছে ফিরে গেল সব যমদূতেরাও। আশুতোষ শিব কিন্তু নিয়ে গেলেন ব্যাধকে শিবলোকে। সেই থেকেই ত্রিভুবনে প্রচারিত হল শিবরাত্রির পুণ্য কথা।

পূর্বভারতের প্রধান শৈবতীর্থ পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের খ্যাতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে মেলা ও গাজন উৎসব এ স্থানের দর্শনীয় বস্তু। এখানকার প্রবাদ: "বাবা মক্কায় মক্কেশ্বর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, কলিযুগে জীব তরাতে নাম তারকেশ্বর।"

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ১৮৭০ সালে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে লিখেছেন: শৈবধর্ম প্রচারের যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, যে শিবের উপাসনা বিষ্ণুর উপাসনার অপেক্ষায় কোন মতেই অপ্রাচীন হইবার বিষয় নয়। পৌরানিক ধর্মের সূত্রপাতেই শিব উপাসনার আরম্ভ হয়। বেদ ও বৈদিক-ধর্মমাত্র প্রতিপাদক শাস্ত্র ব্যাতিরেকে রামায়ণ মহাভারতাদি অপরাপর সমুদায় শাস্ত্রেই শিব-প্রসঙ্গ এবং শিব ও শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। শূদ্রকের কৃত মৃচ্ছকটিক এবং কবি কলিদাসের কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল গ্রন্থ প্রায় প্রচলিত অন্য অন্য সমুদায় সাহিত্যের অপেক্ষা প্রাচীন। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের সময়ে শৈব-ধর্ম প্রচার থাকিবার বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, প্রথমেই শিব-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ সহকারে ঐ সকল নাটকের আরম্ভ হয় এবং ঐ সমুদয়ের কোন কোন গ্রন্থে শিবের অষ্টমূর্তি ও তাঁহার বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কালিদাস প্রণীত কুমারসম্ভব কেবল শিব-দুর্গারই লীলা কথন ও গুণকীর্তন মাত্র।

তারকেশ্বর

তারকেশ্বর বাংলাদেশে একমাত্র শৈবতীর্থ বলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ তারকেশ্বর। এই দশনামী শৈব-মঠ বাঙলাদেশের নিজস্ব ধর্ম প্রতিষ্ঠান নয়। ইহা অবাঙালীদের আরোপিত ধর্ম প্রতিষ্ঠান হলেও বাঙালীদের ধর্মের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ইহা এখন বাঙালীর ধর্মের সঙ্গে সুন্দরভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

শঙ্করাচার্য ভারতে উপনিষদসমূহ মন্থন করে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্বাসা প্রভৃতি মুনিদের অনুগত সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবকে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সন্ধান দেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত করে ভারতে সপ্তম শতকে হিন্দু ধর্ম পুনঃসংস্থাপন

করেন। কিভাবে তিনি ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম আবার প্রতিষ্ঠা করেন তার কিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' নামক গ্রন্থ থেকে নিয়ে উদ্ধার করছি। তিনি লিখেছেন "শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ দলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পথ সৃজন করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসীদিগকে বাহুবলে ও বিচার বলে কর্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধ বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে না পারিলেন সে স্থলে নাগা সন্ন্যাসীদল নিযুক্ত পূর্বক খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন……বৌদ্ধনাম দূরীভূত করিয়া শঙ্করাচার্য ভারতের কিয়ৎ পরিমাণে উপকার করিয়াছেন; যেহেতু পুরাতন আর্য সমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল, তাহা নিবৃত্ত হইল।"

শঙ্করাচার্য কেবলাদ্বৈত মত প্রচার করেন। তাঁর মত জীব ও ব্রহ্ম এক। ভেদজ্ঞান মিথ্যা, কেবল মায়িক প্রতীতি মাত্র। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেব শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ খণ্ডন করে প্রেমভক্তি আশ্রয় করাই সারগ্রাহী জনগনের কর্তব্য বলে সর্বত্র প্রচার করেন।

তারকেশ্বরে মঠ প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর হুগলী হাওড়া জেলায় দশনামী অবাঙালী সন্ন্যাসীগণ বৈদ্যবাটী, গুপ্তিপাড়া, ভোটানগান, প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি মঠ স্থাপন করেন বলে অনেকে কালিঘাটে নকুলেশ্বরের মতন তারকনাথও আধুনিক বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই দীন লেখক কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এক মত নন। রাঢ়ে শৈব ধর্মের প্রাধান্য বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল, তার প্রমাণ মহালিঙ্গার্চন গ্রন্থের "বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বর"—এই উক্তিটি।

পশ্চিমবঙ্গে নাথধর্ম নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আজ বৌদ্ধধর্মের মত অবলুপ্ত হলেও তারকনাথ নামটিতে "নাথ" থাকায় ইহা যে শিবের সাধারণ নাম নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। তারকনাথের পাশে আছেন লোকনাথ। অদূরে মহানাদে আছেন জটেশ্বরনাথ। সুতরাং নাথ যুক্ত দেবতাগণ যে মূলতঃ নাথদের, না জৈনদের, না বৌদ্ধদের দেবতার অবশেষ এ বিষয়ে কেউ আজও গবেষণা করেন নি। তাই প্রকৃত সত্য আজও অন্ধকারে আবৃত হয়ে রয়েছে। এত কথা বলার এখানে প্রয়োজন কেবল এই কথাটি বোঝাবার জন্য, যে 'তারকনাথ' কখনও আধুনিক দেবতা নন। বাংলার বাইরেও কাশীতে বিশ্বেশ্বর 'বিশ্বনাথ' ও দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বর যেমন 'রামনাথ' আধুনিক

নয়; তারকেশ্বরের ধামেশ্বরও সেই রকম কখনও আধুনিক হতে পারে না। উহা অতি প্রাচীন।

দশনামী সন্ন্যাসীগণ পলাশী যুদ্ধের আগে যখন বাঙলা দেশে আসেন তখন বাঙলায় চলছে রাষ্ট্র বিপ্লব। সেই সুযোগে মহারাষ্ট্র থেকে আগত বর্গীর মত এইসব অভিযাত্রী সন্ন্যাসীরা এদেশে আগমন ও অভিযান করেন। চুঁচুড়া, হুগলী ও চন্দননগরে যখন বাঙলাদেশের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল, ঠিক সেই সময় এইসব দশনামী সন্ন্যাসীর দল তারকেশ্বরে এসে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সন্ন্যাসীরাও নবাবী আমল শেষ হলে বাঙলা দেশে লুণ্ঠন অভিযান শুরু করেন বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও বর্গী দমন করতে বাধ্য হতে হয়।

ভারতবর্ষে প্রাগ্বৈদিক যুগ থেকে শিবপূজা প্রচলিত। বেদে রুদ্রের যে রূপ কল্পনার মধ্যে এই আদিম দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই বৈদিক ও অবৈদিক দেবতার সংমিশ্রনে যে দেবতা 'শিব' রূপে বিকশিত হন, উহাই শৈব ধর্মের প্রতীক দেবতা। মহাদেবের মূর্তি দুরকম। এক মূর্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্তি শান্ত মঙ্গলময়। পৌরাণিক যুগে শিব দেবতারূপে প্রধানত সংহারকর্তা বলে পূজিত হলেও তার উপাসকদের কাছে তিনি জগৎস্রষ্টা ও জগৎপিতা বলে পরিগণিত হতেন। তারকেশ্বরে প্রচলিত একটি গানের প্রথম দু'লাইনে তাই দেখি:

একবার বাবার নাম করে যেই জন।
সর্বপাপ মুক্ত হয় ব্যাসের বচন॥

আমাদের দেশে পূর্বে শিবলিঙ্গ পূজা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ আদৃত হয়নি। পরে যখন শিবলিঙ্গের বাস্তবধর্মিতা বিলুপ্ত হয় তখন থেকে ধীরে ধীরে উহা উচ্চবর্ণে প্রসার লাভ করে। তারকেশ্বর শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, তার সঙ্গেও গোপ জাতি ও গাভী সংশ্লিষ্ট থাকায়, দেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই যে শিবপূজা তৎকালে প্রচলিত ছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তারকেশ্বরে গিরি সম্প্রদায় মঠ স্থাপনের পূর্বেও যে এখানে তারকনাথ বিরাজ করতেন, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই, কারণ ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। ইনি হচ্ছেন অনাদি শিব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। এই শিব আবিষ্কৃত হবার পর এই অঞ্চলের রাজা ভারামল্ল যখন তাঁর রাজধানী রামনগরে এই

শিবকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তখন তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন যে "আমাকে তোলার বৃথা চেষ্টা করো না বরং এখানেই আমার মন্দির করে দাও"। ধর্মমঙ্গলে সহদেব গোস্বামীও এ বিষয়ে লিখেছেন :

তারকেশ্বর শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী-ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি ॥
অকারণ দুঃখ করো মোরে কেন খোঁড।
গয়া গঙ্গা বারানসী-আদি মোর জোড ॥

এখানে শিবরাত্রি ও গাজন উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। বাঙলাদেশের সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব তারকেশ্বরের গাজন উৎসব। এই মহোৎসবে তারকেশ্বরের গোপের কাহিনী ও বিবিধ লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। ইহা কিন্তু দশনামী শৈবদের দান নয় বা মোহন্তদের আচারভুক্তও নয়। রাঢ়ের প্রাচীন লৌকিক অনুষ্ঠান ধর্মের-গাজন এখানে শিবের গাজনের সঙ্গে একীভূত হয়ে বাবা তারকনাথের ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ হিসাবে এখন পরিগণিত হয়েছে।

বাবা তারকনাথের চরণে সেবার জন্য সারা চৈত্র মাস ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক গৈরিক ধারণ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বড একটা কেউ করেন না। তবে রোগমুক্তির জন্য এখানে ধর্ণা সকলেই দেন। এখানে পুণ্যালোভাতুর নরনারী প্রত্যহ ক্রিয়াকর্মাদির মাধ্যমে তাদের ব্রত উদযাপন করেন। এই যে বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা, ইহার মূলে বৈজ্ঞানিক সত্যতা কতটুকু আছে তা নিয়ে হয়তো মতভেদ থাকতে পারে। তবে অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ হিন্দুর মতে 'তারকনাথ' কলির জাগ্রত দেবতা। এবং আমার মতে বাবা তারকনাথ জাগ্রত তো বটেই, তিনি নবীন নন, বহু প্রাচীন এবং তা মনে প্রাণে বিশ্বাসও করি। তাই বলি :

তারকনাথ চরণে যার মতি না জন্মিল।
নিশ্চয় জানিবে তার বিধি বাম হইল ॥

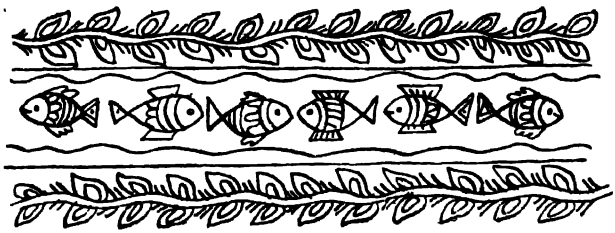

গাজন

শিবের প্রীতিকামনায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে শিব-সম্বন্ধীয় গীতগানকে বলা হয় গাজন। ইহা চড়ক পূজার সময় পশ্চিমবঙ্গে চৈত্র মাসের একটি প্রধান ধর্মোৎসব। প্রাচীন ছড়ায় আছে :

মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি।
ফাল্গুন মাসে দোল পূজো, ফাগ ছড়াছড়ি॥
চোত্তির মাসে চড়ক পূজো, সন্ন্যেসীর মেলা।
বোশেখ মাসে ভগবতী পূজো, গরুর গলায় মালা॥

অতীত কালে বৌদ্ধযুগে মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ শিব পূজা করতেন। এই শিবের স্থান ছিল বৃক্ষের নীচে। বৌদ্ধযুগের শিব ছিলেন কৃষকদের দেবতা। শিবের যে প্রশান্ত সমাধিস্ত ধ্যান মূর্তি আজ আমাদের মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সে যুগের শিবে তার কিছুই দেখা যায় না। তিনি কৃষিকার্য এবং গৃহে শিবানীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মত ঝগড়া করে দিনাতিপাত করেন। এই কৃষক শিবের গান বাংলা দেশে সেকালে এত প্রচলিত ছিল যে, পরবর্তীকালে হিন্দু কবিগণ শিব চরিত্রের এই ভাগ একবারে বর্জন করতে পারেন নি। রামেশ্বর, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ শিবের যে কৃষিকার্য ও শিব-দুর্গার কলহের আভাষ দিয়েছেন তা পূর্ববর্তী যুগের কবিগণের গীতি অবলম্বন করে রচিত এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই তিন দেবতার মধ্যে ধর্ম ছিল ডোমেদের দেবতা। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে হিন্দু ধর্ম পুনরুত্থানের পর হিন্দুগণ বৌদ্ধদের ধর্মঠাকুরকে শিবঠাকুর বলে পূজা করতে শুরু করেন। শিবের গাজন বা শিবের উৎসব সেই থেকে আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গসাহিত্যে পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন :

The literature in honour of the God Dharma was originally

Buddhistic. Dharma occupies the second place in the Buddhistic group comprised of Buddha, Dharma and Sangha. The Doms, who were originally the worshippers of Dharma, discharged priestly functions in the Budhistic temples. The people are unclean in the eye's of the Hindus, but they have still retained the priestly position in the worship of Dharma.

ধর্মঠাকুরের ওঁকার শব্দ যতদূর পর্যন্ত ধ্বনিত হয়, ততদূর পর্যন্ত গৃহস্থের পাপ বুঝি সব দূর হয়ে যায়, শূন্যপুরাণের এই গানটি তারই নিদর্শন।

যতদূর ধর্মের ওঁঙ্কার যান।
গারস্থের মহাপাপ দূরত পলান ॥
সাম যজু ঋক অথর্ব বেদ,
ওঁকার লইয়া ধর্মের পঞ্চম বেদ।
শুন শুন পণ্ডিত আগমর ভেদ ॥

শিবের উপবাসক্লিষ্ট নগ্ন দেহ এবং ভিক্ষাবৃত্তির কথা স্মরণ করে শিবভক্ত তাঁকে ধান রোপণ করতে এবং নগ্নতা নিবারণের জন্য কাপাস তুলা বুনতে উপদেশ দিচ্ছেন এরূপ একটি গান এখানে উদ্ধৃত হলো। সাধারণতঃ ভক্ত উপাস্য দেবতার কাছে নিজের অভাব অভিযোগের কথা নিবেদন করেন। কিন্তু এখানে উপাসক নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে দেবতার দুঃখে ব্যথিত হয়ে, তাঁকে যে উপদেশ দিচ্ছেন, তা জনৈক ইংরেজ মহিলার মতে "ভক্তির অপূর্ব পরাকাষ্ঠা ও কবিত্বের শ্রেষ্ঠতম উপাদান।" গানটি হচ্ছে :

আক্ষার (১) বচনে গোসাঞি তুক্ষি (২) চষ চাষ।
কখন অন্ন ছত্র গোসাঞি কখন উপবাস ॥
পুখরী কাঁদাএ (৩) লইব ভূমখানি।
আরসা (৪) হইলে যেন ছিচএ (৫) দিব পানি ॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিয়া।
পরম ইচ্ছায় ধান্য আনিব দাইআ ॥ (৬)
ঘরে ধান্য থাকিলে পরভূ সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভূ কত দুঃখ পাব ॥
--- কাপাস চসহ পরভূ পরিব কাপড়।

কত না পরিব গোসাঞি কেওদা (৭) বাঘের চড় ॥ (৮)
সকল চাষ চষ প্রভু আর রোইও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধর্ম পূজার বেলা ॥

পশ্চিমবাংলার একমাত্র শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে প্রতি বৎসর গাজন উৎসব বাঙলা দেশের সর্বাপেক্ষা বড গাজন উৎসব। গাজন দশনামী সন্ন্যাসীদের আচারভুক্ত না হলেও প্রাচীন বাঙলার এই নিজস্ব সংস্কৃতি বাবা তারকনাথের অনুষ্ঠানের মধ্যে কালক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কিভাবে এটা হলো তা ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়।

The country was at the (8th century) full of Tantric worship and Buddhistic ideas, the Buddha having been transformed to the God Dharma. Songs and festivities in honour of Dharma were the craze of the rural people. The "Dharmer Gajana" was one of the great festivities of those worshippers. The rituals of the "Gajana" which in later times had often put to Shiva in the place of Dharma.

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তারকেশ্বরে পাঁচদিন ব্যাপি মূল অনুষ্ঠান হলেও সারা চৈত্রমাস ধবে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁরা নারী পুরুষ নির্বিশেষ গেরুয়া কাপড পরিধান করেন ও ফলমূল আহার বা হবিষ্যান্ন করেন এবং প্রত্যহ গঙ্গস্নান করেন। ব্রত ধারণের ও নিয়ম পালনের কোন ধবা বাঁধা রীতি প্রচলিত না থাকলেও কেহ একমাস বা কেহ অল্পদিনের জন্যও কৃচ্ছসাধনের ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রতী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী তখন "আত্ম গোত্রং পরিত্যজ্য শিব গোত্রে প্রবিশতু" এই মন্ত্রে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন। তখন সব সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিণীগণ হয়ে যান একগোত্র। তারপর তারা "বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে মহাদেব"—এই গান করতে করতে ঢাক ঢোল কাঁসি বাজিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে পডেন। ওম্যালী সাহেব ও মনোমোহন চক্রবর্তী 'হুগলী ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ারে' কেবল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন মুসলমানদের

---

১) আক্ষার—আমার, ২) তুক্ষি—তুমি, ৩) কাদাএ—ভিজা মাটিতে, ৪) আরসা—রস বিহীন, ৫) ছিডএ—সেঁচিয়ে, ৬) দাইআ—কাটিয়া, ৭) কেওদা—কেঁদো বাঘ, ৮) চড়—চামড়া।

রমজানের মতন, একমাস দিনের বেলা তারা উপবাস করে রাত্রে আহারাদি করেন বলে লিখেছেন।

চৈত্র মাসের শেষে সাধারণতঃ চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচদিন আগে আরম্ভ হয় নীলপূজা এবং সংক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এই পূজার অবসান হয়। উৎসবকারী সন্ন্যাসী গায়কগণ ঢাকের বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে শিবের নানা রকমের গান গেয়ে থাকেন। নীলপূজা শিবপূজারই নামান্তর। চৈত্র মাস শিবের জন্মমাস বলে আমাদের দেশে চৈত্র মাসেই এই গাজনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবের গাজনের দুটি গান এখানে উদ্ধৃত হলো:

বরণ

চৈত্রমাস মধুমাস শিবের জন্মমাস।
সাধু সন্ন্যাসী লইয়া বালা চলেন শিবের বাস॥
শিব শিব বলিয়া ডাকে ঘনে ঘন।
চৈতন্য হইয়া প্রভু দিলেন দরশন॥

বিবাহ আসরে শিব

শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা।
পাড়া পড়শী দেখতে এলো বিয়ার কথা শুইনা॥
ঢিপ্ ঢিপ্ ডম্বুরা বাজে শিঙ্গায় গুণ গুণ করে।
থৈস্যা পড়লো ব্রগোচর্ম শিব ল্যাঙ্গটা হইয়া নাচে॥
মেনকা সুন্দরী এল জামাই দেখিবারে।
পাগলা জামাই দেখ্যা সবে আউয়া ছিয়া করে॥
কিবা আকৃতি জামাইর কিবা জামাইর রূপ।
দুইটা চক্ষু ফুইড্যা রইছে পঞ্চখানি মুখ॥
না দিব গৌরীরে বিয়া কার না বাপের ডর।
ডঙ্কা মাইর‍্যা পাগল জামাই বাড়ির বাইর কর॥

বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলি কিভাবে শঙ্করাচার্য ও তাঁর অনুরাগীবৃন্দ হিন্দুতীর্থে রূপান্তরিত করেন, তার একটি সুন্দর বর্ণনা শ্রীমদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা" নামক পুস্তকে দিয়েছেন। নিম্নে তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো।

"আর্যদিগের যে তীর্থ ছিল ঐ সকল স্থান বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল। এমন কি ব্রহ্মণদিগের ধর্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতে লাগিল। যখন এই প্রকার উপদ্রব অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল, তখন খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে

ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ দলবদ্ধ রূপে বৌদ্ধ বিনাশের যত্ন পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঘটনাক্রমে কৃতবিদ্য ও মহাবুদ্ধিশালী শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য কাশীনগরে ব্রাহ্মণদিগের সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। ইহার কার্য আলোচনা করিলে ইহাকে পরশুরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়। জন্ম সম্বন্ধে ইহার অনেক গোলযোগ ছিল, এ বিধায় তাঁহাকে মহাদেবের পুত্র বলিয়া তাঁহার অনুগত ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করেন……শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ দলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পথ সৃজন করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসীদিগের বাহুবলে ও বিচার বলে কর্মপ্রিয় ব্রাহ্মণ-দিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে না পারিলেন, সে স্থলে নাগা সন্ন্যাসীদল নিযুক্ত করিয়া খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন।"

তারকেশ্বরে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে গাজন মেলার অনুষ্ঠান হয় পাঁচদিন সে সময় এখানে শিবব্রতধারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ দর্শককে মুগ্ধ করে। ঢাক ঢোল সহযোগে তাঁরা যে গান করেন, তার একটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

বাবা শ্মশানে থাকে গায়ে ভস্ম যে মাখে।
দিবানিশি নয়ন মুদে রাম বলে ডাকে॥
ভক্তের জন্য কৈলাস শূন্য করে থাকেন সর্বক্ষণ।
তারকব্রহ্ম তারকনাথে ডাকলে আমার মন॥

বাবা তারকনাথের গাজন মেলা শুরু হয় ২০ চৈত্র। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে "দখনে মেলা"। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত হাজার হাজার কৃচ্ছ্রব্রতধারী ভক্তের দল গৈরিক ধারণ করে বৈদ্যবাটী থেকে বাঁকে করে গঙ্গাজল নিয়ে তীর্থধামে উপস্থিত হয়ে বাবার পূজা দেন ও শিবলিঙ্গের মাথায় ঢেলে দেন গঙ্গার পবিত্র জল। চৈত্র মাস ৩০ দিনে হলে, মেলা শুরু হয় ২১ চৈত্র।

তাবপর ২৭ চৈত্র হয় ফল উৎসব। এই দিন ফল ছোড়া ও কাঁটা ঝাঁপের অনুষ্ঠান। ২৮ চৈত্র নীল উপলক্ষে শিবের বিবাহ-বার্ষিকী বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। নীলাবতীর বিবাহপলক্ষে সন্ন্যাসীদের এক বিরাট শোভাযাত্রা সেদিন নগর প্রদক্ষিণ করে। ২৯ চৈত্র চড়ক উৎসবের জন্য ঝাঁপ খোলা হয়। এই দিন শিবের উদ্দেশ্যে কাঁটা ঝাঁপ একটি দর্শনীয় অনুষ্ঠান।

ব্রত শেষ হয় ৩০ চৈত্র; সে দিন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ গৈরিক বস্ত্র ত্যাগ করে ব্রত শেষ করেন। ব্রত উদ্‌যাপনের পর শিবগোত্র পরিত্যাগ করে ভক্তবৃন্দ আবার স্বীয় গোত্রে তখন প্রত্যাবর্তন করেন। পুণ্যলোভাতুর হাজার হাজার নরনারী শিবক্ষেত্র তারকনাথে মিলিত হয়ে পূজা, অর্চনা, মন্দির প্রদক্ষিণ দণ্ডী করা ও বাবার মাথায় গঙ্গাজল বর্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়া কর্মাদির দ্বারা ব্রত উদ্‌যাপন করেন। ভক্তদের বিশ্বাস বাবা তারকনাথ সর্বত্র বিরাজিত, তিনি কেবল তারকেশ্বরেই সীমাবদ্ধ নন। তাঁরা বলেন :

বাবা মক্কায় মক্কেশ্বর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর।
কলিযুগে জীব তরাতে নাম তারকেশ্বর ॥

আর বাবা বলেন তিনি আশুতোষ। তাঁর মাথায় যিনিই জল ও বিল্বপত্র দেবেন, তিনিই তারকনাথের শ্রীচরণে স্থান পাবেন।

ভক্তিভাবে দিবে মোরে এক বিল্বদল।
অন্তিমকালে চরণ-কমলে পাইবে স্থল ॥

বাবা তারকনাথ সম্বন্ধে বহু গান এখনও রচিত হয়। নিম্নে পণ্ডিত দীঘাপতি ভট্টাচার্য রচিত প্রভাতকালীন একটি গান উল্লেখ্য। গাজন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডে আছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা থেকে অনেক তথ্য জানতে পারবেব।

প্রভাতকালীন গান

ধন্য হবে মানব জীবন,
গাওরে শিবের নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে
পিওরে ভাই অবিরাম ॥
নাম কর ধ্যান, নাম কর জ্ঞান,
নামেই হবে পরিত্রাণ।
নামের প্রভাবে দেখতে পাবে,
হৃদয় মাঝে স্বর্গধাম ॥
জীব তরাতে এসেছে নাম,
পাপী তাপীর প্রাণারাম।
দেবতার বাঞ্ছিত এ নাম,
নামে বাসনার বিরাম ॥

দীঘাপতি বলে সদা কর,
পশুপতির নাম।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের
পাবি রে সন্ধান ॥

পশ্চিমবঙ্গে শিবের মন্দির সর্বাধিক এবং সর্বত্রই গাজন উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় নকুলেশ্বর মন্দিরে, চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বরের মন্দিরে, খানাকুলে ঘণ্টেশ্বরের মন্দিরে, বর্ধমান কুড়মনা ঈশানেশ্বরের মন্দিরের গাজন তন্মধ্যে উল্লেখ্য। স্থান কাল পাত্র ভেদে এই উৎসবের সঙ্গে কোথাও কোথাও নরমুণ্ড নিয়ে সন্ন্যাসীদের নৃত্য শৈবতান্ত্রিক মিলন বলে মনে হয়। এই সব দৃশ্য বীভৎস ও ভয়াবহ হলেও শিবের গাজন নিয়ে গবেষণা করলে সেকালের বঙ্গসমাজের অনেক অলৌকিক তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

শিবের সন্ন্যাসী বেশে গৌরীকে ছলনার একটি গানের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

আজানু লম্বিত জটা কপালে রুধির ফোটা
রুধিরের অর্ধচন্দ্র ভালে।
খুলে ফেলে বাঘাম্বর পরিলেন রক্তাম্বর
রুদ্রাক্ষের মালা পরে গলে ॥

কপট সন্ন্যাসী গৌরীকে শিবপূজা করতে দেখে শিব নিন্দা করতে শুরু করলেন :

ব্রহ্মচারী বলে ছি ছি কি কথা কহিলে।
শিব পুজিবারে তোরে কে শিখাই এ দিলে ॥
কি ফল পাইবে তুমি শিবপূজা করে।
কেন দুঃখ পায় চলে যাও নিজ ঘরে ॥

গৌরী কিন্তু শিব ছাড়া কাউকে বিবাহ করবেন না, শিবনিন্দা সত্ত্বেও তিনি সাধুকে বললেন :

আমার মনের আশ অন্যতে নাঞি পিয়াস
ত্রিভুবনে আছে যত জন ॥
অনুগ্রহ করি মোরে শিব যদি বিভা করে
তবে বিভা করিব এখন ॥
সে পদ মনে ভাবিএ শিবলিঙ্গ নির্মাই এ
সদা করি শিবের সাধন ॥

শিব বিনে অন্য জনে না দেখি না জানি মনে
কালী নাম করি এ বচন ॥

হুগলী জেলার সদর শহর চুঁচুড়া। এখানে ভাগীরথী তীরে ষণ্ডেশ্বর জীউর মন্দির। চৈত্রের গাজন পর্ব এখানে তিনশো বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২১শে চৈত্র (৩১ দিনে মাস হলে ২২শে) থেকে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। অতি দীর্ঘ এই গাজন সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসব্রত পালন। বহু আচার অনুষ্ঠানে উৎসবটি বৈচিত্রপূর্ণ, যেমন—খাটা-খাটুনি অর্থাৎ দেবতার সম্মুখে নাচ গান। ষণ্ডেশ্বর জীউর অভিষেক; ষণ্ডেশ্বর, কামাখ্যাদেবী, কালভৈরব আর সিদ্ধেশ্বরী কালীর গাজন পূজা; মাত্র তিনটি চালের ভাত রেঁধে একটি হাতে, একটি পাতে আর একটি দাঁতে কেটে সন্ন্যাসীদের শুরু হয় মহাহবিষ্য পালন এবং ১লা বৈশাখ মধ্য রাত্রিতে হয় ছাগ বলি।

গাজনোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে যে মেলা বসে তার নাম কিন্তু বৈশাখী মেলা। হাজার দশেক নরনারীর সমাগমে প্রাঙ্গন তখন অন্য রূপ ধারণ করে। নবনির্মিত মন্দির ও ষণ্ডেশ্বরের নানা কথা পরে নিবেদিত হলো।

ঘণ্টেশ্বর

তারকেশ্বর পূর্বভারতের প্রধান শৈবতীর্থরূপে বঙ্গেলাদেশে পরিচিত হবার অনেক আগে ঘণ্টেশ্বর ও চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর ছিল সর্বজনবিদিত। পথঘাটের সুব্যবস্থা না থাকলেও দেশদেশান্তর থেকে জলপথে তখন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হবার জন্য আসতো অসংখ্য নরনারী। সেকালে "একবার বাবার নাম করে যেই জন—সর্ব পাপে মুক্ত হয় ব্যাসের বচন" এই ছিল প্রবাদ। কিন্তু সে বিশ্বাস এখন আর নেই বলে পূর্বের খ্যাতি লুপ্তপ্রায় হলেও রত্নাকর নদের তীরে ঘণ্টেশ্বরদেবের প্রাচীন মন্দির স্থানটিকে এখনও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রেখেছে।

আরামবাগে খানাকুল থানার উবিদপুর গ্রামে ঘণ্টেশ্বর মন্দির-এর গঠন পরিকল্পনা একটু বিচিত্র রকমের। রেখ দেউলের সঙ্গে চারচালা শৈলীর সংযোগ হুগলীতে পাণ্ডুগ্রামে গোস্বামীদের মন্দির ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। অবশ্য ঘণ্টেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ রেখের প্রভাবযুক্ত চারচালা আচ্ছাদনযুক্ত মন্দির মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুর, আউরিমির্জাপুর, বিশ্বনাথপুর প্রভৃতি অনেক গ্রামে দেখেছি, তবে তমলুকের বর্গভীমা দেবীর মন্দির এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। পাণ্ডুগ্রামে গোস্বামীদের দেউল মন্দিরে জগমোহন রূপে আছে কিন্তু আটচালা মন্দির। আর ঘণ্টেশ্বরে আছে সামনে জগমোহন হিসাবে বাঙলার ঘরোয়া স্থাপত্যের প্রতীকরূপে একটি চৌচাল মন্দির। ১৯৬১ সালে হুগলী জেলার হ্যাণ্ডবুকে ঘণ্টেশ্বর শিব মন্দিরকে এ অঞ্চলের প্রখ্যাত মন্দির বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘণ্টেশ্বর মহাদেব অনাদি স্বয়ম্ভু—এই বিরাট শিবলিঙ্গ কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বয়ম্ভু ঘণ্টেশ্বরের কথা "মহালিঙ্গার্চনতন্ত্রে" লেখা আছে। যথা: 'ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশী রত্নাকর নদীতটে।' আগে রত্নাকর নদ যখন খুব বেগবান ছিল তখন এখানে অর্থাৎ উবিদপুর ছিল বন্দর এবং এই অঞ্চলের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য যাতায়াত করতো এই জলপথে। কথিত আছে, পঞ্চদশ শতকে কৃষ্ণনগরে গোপীনাথজীউর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ অভিরাম গোস্বামী মহারাজের কৌপীন ভেসে যাওয়ায় তাঁর অভিশাপে রত্নাকরের বেগ কমে যায় এই প্রবাদ ও তখন থেকেই এই নদ কানা-রত্নাকর বলে খ্যাত হয়। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিক বলয়াকারে রত্নাকর বেষ্টন করে রেখেছে বলে এই দেবস্থানের প্রাকৃতিক শোভা ছিল একদা অপরূপ।

প্রাচীন কীর্তিমালায় সুশোভিত ঘণ্টেশ্বর মন্দিরে বিশালাক্ষী, অন্নপূর্ণা, শ্মশানকালী, ষষ্ঠীঠাকুরাণী, ধর্ম্মঠাকুর, ক্ষুদিরায় এবং নিতাই-গৌর প্রভৃতি দেবদেবীর ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে অবস্থান স্থানটিকে করেছে ভক্তদের কাছে মনোরম। এই রমণীয় স্থানকে তাই বলা হতো গুপ্তকাশী ও ঘণ্টেশ্বরদেবকে বলা হোত গুপ্তকাশীর পতি, তাই তাঁকেই কেবল ভজনা করো "গুপ্তকাশীধামপতিং ভজ ঘণ্টেশ্বরম্", এই ছিল সুপ্রাচীন রীতি।

ঘণ্টেশ্বরের গাজন এ অঞ্চলের একটি প্রধান উৎসব। মন্দির শ্রীমদ বটুক বাবাজীর নির্দেশে উবিদপুরের মটুক কারক মন্দির প্রথমে নির্মান করতে করেন, কিন্তু শেষ করেন উবিদপুরের কানাইলাল দে। অষ্টাদশ শতকে গুরু

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপর ১৭৩৫ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে আলোচ্য মন্দির তৈরি হয়েছিল। সামনের চৌচাল জগমোহন পতনোন্মুখ হলে ১৯৪৫ সালে তার আকার ও গঠন বজায় রেখে তা পুনঃ নির্মান করা হয়। এই সুপ্রাচীন মন্দির সম্পর্কে হুগলী জেলায় গেজেটিয়ারে (১৯৭২) যা লেখা আছে তা উল্লেখ্য :

"Ubidpur contains the temple of Ghanteswara Siva whose emblem is supposed to be self-grown and is highly revered by the local People. The present temple, a Sikhara, structure with a Char-chala Jagamohana attached to the eastern wall was built in 1945 closely imitating the original structure on the verge of collapse."

পাঁচ শতক আগে মাঘ মাসের এক অকাল বন্যায় রত্নাকর নদ থেকে প্রাপ্ত হল কালভৈরব বলে কথিত সপ্তাশ্ববাহিত রথারুঢ় একটি পাথরের সূর্যমূর্তি, তৎকালীন সেবায়েৎ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি যেটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভৈরব বলে তিনি আজও পূজিত হচ্ছেন। মাঘ মাসে দশমীর পরদিন ভৈমী একাদশীতে ভৈরবের আবির্ভাবের দিন বলে ও শিবরাত্রিতে অনুষ্ঠিত দুটি এখানকার মেলা চলে আসছে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে। এবং কথিত আছে এখানে সিদ্ধি লাভ করেছেন বহু সাধক।

মন্দিরের পাশে নদী তীরে শ্মশান অবস্থিত। দাহকার্যের জন্য দুটি শ্মশান এখানকার বৈশিষ্ট্য। একটি শ্মশান ব্রাহ্মনদের, আর একটি অ-ব্রাহ্মণদের। ঘণ্টেশ্বর মন্দিরের ডান দিকের শ্মশানের নাম ব্রহ্মা-শ্মশান ও বাঁ দিকেরটি হচ্ছে সাধারণ শ্মশান। শ্মশানে জাতিভেদের এ ধরণের ব্যবস্থা হুগলী জেলায় আমি সহস্রাধিক গ্রাম পরিভ্রমণ করে আর কোথাও দেখিনি।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, "এইখানে (শ্মশানে) আসিলে সকলেই সমান হয়" বলেছেন। তিনি লিখেছেন: "পণ্ডিত, মূর্খ ধনী, দরিদ্র, কুৎসিৎ, মহৎ, ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইংরেজ, বাঙালী সকলেই সমান।" কিন্তু তিনি এই শ্মশানের কথা জানলে হয়ত এ কথা লিখতেন না। আর রবীন্দ্রনাথ শ্মশানে জাতিভেদের কথা জানলে কী "মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্ম সবার সমান" একথা গীতাঞ্জলিতে লিখতেন? হয় তো লিখতেন, কারণ তাঁর মতে :

"ইতিহাস বুড়ো, বেড়াজলে তার পাতা,
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা
ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে।
হয় আর নয়, খোঁজ রাখে শুধু এই,
ভালো মন্দর দরদ কিছুই নেই।
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।" (নবশতক)

ষণ্ডেশ্বরের গাজন

শিব নেই বা শিবমন্দির নেই এমন গ্রাম ভারতে বিরল। ভারতের গ্রাম্য সমাজে শিব আদি পিতা ও উমা বা অম্বিকা আদি মাতা বলে তন্ত্রবচনে লেখা আছে। 'আদৌ শিবং পূজয়িত্বা' আগে করবে শিবপূজা 'শক্তিপূজা ততঃপরং' তারপর করবে শক্তি পূজা। এই শাস্ত্র-বাক্য বলে সুদূর অতীত কাল থেকে আমাদের দেশে শিবপূজা প্রচলিত হয়েছে।

প্রাক্ বৈদিক যুগ থেকে শিবপূজা হচ্ছে বলে এই পূজার প্রাচীনত্ব আমাদের দেশে সমধিক। বেদে রুদ্রের কল্পনার মধ্যে এই আদিম দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৈদিক ও অবৈদিক দেবতার সংমিশ্রণে যে দেবতা শিবরূপে বিকশিত হন, তিনিই হচ্ছেন শৈবধর্মের প্রতীক দেবতা শিব। পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বলেছেন যে, শিব তাঁর দুরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য উচ্চ ও নীচ এই উভয় শ্রেণীর হিন্দুর কাছে মহা ঈশ্বর বলে পরিগণিত। চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর এইরূপ ঈশ্বরযুক্ত একটি প্রাচীন দেবতা। যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল ষোড়শ শতকে চুঁচুড়ায়—সম্রাট আকবারের রাজত্বকালে।

চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর ছাড়া হুগলি জেলার ইতিহাস রচনার জন্য যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ আমায় করতে হয়েছিল, তখন তিনশোর মত ঈশ্বরযুক্ত শিবলিঙ্গ দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কয়েকটির নাম

এখানে উল্লেখ করছি। উবিদপুরের ঘণ্টেশ্বর, পোলের মানিকেশ্বর, কেটদলের শীতলেশ্বর, সাহানপুরের সানেশ্বর, রাজহাটীর বজ্রেশ্বর, ভাণ্ডারহাটির শৈলেশ্বর, হারপুরের হারনগরেশ্বর, দিগপুরের হটেশ্বর, বৈদ্যবাটীর রাঘবেশ্বর, গুড়োপের গোপেশ্বর, কোন্নগরের কল্যাণেশ্বর, উত্তরপাড়ার থানেশ্বর ও রামেশ্বর, পাউনানের টাটেশ্বর, আঁটপুরের ডালেশ্বর, শিমলার জটিলেশ্বর, মহানাদের অখিলেশ্বর, সুগন্ধ্যার মহেশ্বর, দীঘানেশ্বরের সর্বেশ্বর, বংশবাটীর হংসেশ্বর, ত্রিবেণীর রামেশ্বর ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে তারকেশ্বর একমাত্র শৈবতীর্থ বলে এখানকার গাজন উৎসব বৃহত্তম। কিন্তু চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর বা আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত উবিদপুরের ঘণ্টেশ্বর শিবের গাজনও বৃহৎ বললে অত্যুক্তি হয় না। শিবের প্রীতি কামনায় সন্ন্যাস গ্রহণ করা বিধি, তাই শিব সম্বন্ধীয় গানকে বলা হয় গাজন। এটি চৈত্র মাসে চড়ক পূজার সময় অনুষ্ঠিত একটি প্রধান ধর্মোৎসব। চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বর জীউর গাজন উৎসব আরম্ভ হয় ২২ চৈত্র এবং শেষ হয় ১ বৈশাখ। এই উৎসব চলে এগারো দিন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন বর্ণের হিন্দু ষণ্ডেশ্বর জীউর প্রীতি কামনায় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। কোন স্ত্রীলোক যদি সন্ন্যাস নেন, তাঁকে বলা হয় ভট্টাসিনী। গাজন উৎসবে থাকেন একজন মূল সন্ন্যাসী এবং তিনিই অন্যান্য সন্ন্যাসীদের পরিচালনা করেন।

ষণ্ডেশ্বরের গাজনে মূল সন্ন্যাসী হন পাঁচুগোপাল ঘোষ। এঁরা পুরুষানুক্রমে ষণ্ডেশ্বরের গাজনে মূল সন্ন্যাসীর ব্রত পালন করে আসছেন। মূল সন্ন্যাসীকে সারা চৈত্র মাস সংযম পালনপূর্বক একবেলা হবিষান্ন করতে হয়। তিনি প্রতি বৎসর ২২ চৈত্র থেকে সন্ন্যাস গ্রহনেচ্ছু ব্যক্তিদের শিবমন্ত্রে গোত্রান্তরিত করে সন্ন্যাস দেন। সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণকারীরা তখন নতুন গেরুয়া বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করেন।

চুঁচুড়ার দেবতা ষণ্ডেশ্বরের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তা থেকে জানা যায় যে প্রায় পাঁচশো বছর আগে রথযাত্রার পরের দিন স্বপ্নাদেশ পেয়ে চুঁচুড়ার দিগম্বর হালদার নামে জনৈক যাত্রিক জেলেদের জালে অবস্থিত ষণ্ডেশ্বর শিবকে গঙ্গা থেকে উদ্ধার করে গঙ্গার ধারে শ্মশানে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। ষণ্ডেশ্বরের সঙ্গে সেই জালে উঠেছিল সাতটি ভৈরব, দুটি ত্রিশূল, একটি করে বান ও একটি লিখিত তাম্রফলক। এই তাম্রফলকে উৎকীর্ণ ছিল ষণ্ডেশ্বরের সিদ্ধিমন্ত্র, যে মন্ত্রে আজও তাঁর পূজানুষ্ঠান সুসম্পন্ন

হচ্ছে। দিগম্বরের স্বপ্ন বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, বণ্ডেশ্বর আগে ছিলেন মগধের পিপুলীয়—রাজবংশের গৃহদেবতা। রাজবংশের পতনের পর তাঁর আবির্ভাব হয় চুঁচুড়ায়। সেখানে বণ্ডেশ্বর জীউর ভক্ত ছিলেন সাতজন, তাঁদের প্রতিনিধি মনে করে আজও গাজনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ বিষয়ে দিগম্বর হালদারের অন্যতম বংশধর ফণীভূষণ হালদার লিখেছেন: এখনও দিগম্বর হালদারের বংশীয়েরা তাম্রফলকের লিখিত নিয়ম অনুসারে গাজন পূজা করিয়া থাকেন। তাম্রফলকে লিখিত মন্ত্র অতি গোপনীয়। ইহা বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র নহে। ইহা ৺বণ্ডেশ্বরের নিজস্ব সিদ্ধ-মন্ত্র। এই মন্ত্র বিধি অনুসারে পুরোহিতকেও দেওয়া যায় না। এ কারণে হালদার বংশীয় বয়োজ্যেষ্ঠ বংশানুক্রমে ব্রতী থাকিয়া গাজন পূজা সামাধা করেন।' বণ্ডেশ্বরের গাজন শুরু হয় ২২ চৈত্র সকাল সাতটায়। প্রথমে হয় অভিষেক তৎসহ বণ্ডেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গনে অবস্থিত অসিতাঙ্গাদি সপ্ত-ভৈরবের পূজা ও মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গের পশ্চাতে প্রোথিত ত্রিশূলের কাছে ঘটে হয় কামদাত্রী কামাখ্যাদেবীর পূজা। দুপুর বেলা বণ্ডেশ্বর, কামাখ্যদেবী, কালভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরী কালীর গাজন পূজার শেষে সন্ন্যাসীরা মন্দির প্রাঙ্গনে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে করেন নানারূপ নৃত্যগীত। তারপর হোম পূজা ও পায়স ভোগ নিবেদন করে তা সর্বসাধারণের মধ্যে বিতারিত হয়। সন্ধ্যায় হয় ঘণ্টেশ্বরের আরতি। এইভাবে চলে এগার দিন গাজন উৎসব। বলা বাহুল্য একমাত্র গাজন পূজা ছাড়া অন্য কোন সময়ে পায়স ভোগ বণ্ডেশ্বরের হয় না। স্বপ্নাদিষ্ট দিগম্বর হালদারের কাছে তিনি বলেছিলেন: 'একমাত্র গাজনের সময় পায়স ভোগ দিবে, অন্য সময় পায়স হইবে না। কারণ আমি ভোগী হইয়া এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি না।'

বণ্ডেশ্বরের গাজন দেখতে আজও বহু জনসমাগম হয়। বণ্ডেশ্বর খুব জাগ্রত দেবতা বলে কথিত। ওলন্দাজ গভর্নর এ্যানটনি ওভারবেকের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় বলে তিনি দুটি পিতলের ঢাক বণ্ডেশ্বরকে দেন। গাজন উৎসবের প্রধান বাদ্য হিসাবে সেই ঢাক দুটি প্রতি বৎসর বাজান হয়। চড়ক পূজা এখানে এক অভিনব প্রথায় সম্পন্ন হয়। একটি কাঠের ওপর বিদ্ধ করে রাখা হয় লোহার একটি খুব ধারাল ফলা। এবং মঞ্চ থেকে সন্ন্যাসীরা সেই ফলার উপর মহাদেবের নাম স্মরণ করে ঝাঁপ দেন, এবং বলা বাহুল্য তাঁরা অক্ষত থাকেন। একে বলা হয় 'পাটভাঙা।'

১ বৈশাখ সন্ন্যাসীরা ক্ষৌরকর্ম করে, গেরুয়া কাপড় ছেড়ে সাদা কাপড়

পয়েন। এদিন রাত্রে সপ্ত ভৈরবের হয় বিশেষ পূজা। এ বিষয়ে সেবায়েতরা লিখেছেন, ভৈরবের বিশেষ পূজা অন্তে দুইটি ছাগ বলি দিয়ে ছাগলের রক্তে স্নান করান হয় ভৈরবদের। পরে সাত হাঁড়ি ভাত, সাত মালসা মুসুর ডাল, ছাগলের সাতটি পা ও সাতটি শোলমাছ পুড়িয়ে ভোগ দেওয়া হয় ভৈরবদের এবং ভৈরবদের পূজার পর গঙ্গায় কামাখ্যার ঘটটি বিসর্জন দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এই বিশেষ পূজা ঘণ্টেশ্বরের তাম্রফলক অনুসারে দিগম্বর হালদারের বংশধরগণ সুসম্পন্ন করেন। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মত চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বরের অবস্থান গঙ্গার পশ্চিম কূলে বলে 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল' বলে প্রসিদ্ধ প্রবাদটি প্রচলন হয়েছে। গঙ্গার ধারে পূর্বে ষণ্ডেশ্বর একটি মাটির কুঁড়ে ঘরে ছিলেন। পরে সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী সেখানে একটি সমতল ছাদবিশিষ্ট পাকা ঘর করে দেন। সেই ঘর ভগ্ন হলে স্থানীয় জমিদার গৌরীকান্ত রায় করে দেন আর একটি মন্দির। তারপর কাল প্রবাহে প্রাচীন সব মন্দিরের মত ষণ্ডেশ্বরের মন্দিরও পতনোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ এগিয়ে এলেন প্রাচীন এই ঐতিহ্য-মণ্ডিত গ্রাম্য দেবতার মন্দিরটি সংরক্ষণ করতে এবং প্রতিষ্ঠা করলেন ষণ্ডেশ্বরজীউ মন্দির সংস্কার সমিতি।

চুঁচুড়ার অধিবাসীগণ ডাঃ মুরারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি, অমরনাথ পাল ও অধ্যাপক চন্দ্রকুমার দে যুগ্মসম্পাদক, যোগীন্দ্রনাথ দাস ও অরুণকুমার মণ্ডল সহকারী সম্পাদক এবং গোপীনাথ পালকে কোষাধ্যক্ষ করে একটি শক্তিশালী পরিচালকমণ্ডলী করে দেন এবং তাঁরা স্থপতি উপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদারের পরামর্শ মত বর্তমান মন্দিরের ওপরে আর একটি নবপরিকল্পিত সাতাশী ফুট উচ্চ ত্রিতল সাদা মার্বেল পাথরের মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কুড়ি বৈশাখ ১৩৮১ সালে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তারকেশ্বর মঠের মোহান্ত মহারাজ হৃষীকেশ আশ্রম এবং সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র। মন্দিরের পুনর্নির্মাণ কার্য শুরু হয় ছাব্বিশ অগ্রহায়ণ ১৩৮২ এবং শেষ হয় ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ সালে।

ষণ্ডেশ্বরজীউ মন্দির সংস্কার সমাপ্তির কর্ণধার ডাঃ মুরারীমোহন মুখোপাধ্যায় মন্দির নির্মাণের জন্য পাঁচ লক্ষ দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন এবং সর্বসাধারণের দানে আধুনিক স্থাপত্য শিল্পকলায় সুসমৃদ্ধ শ্বেত পাথরের যে নয়নাভিরাম মনোহর মন্দির ১ বৈশাখ ১৩৮৬ সালে নির্মিত হয়েছে যা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। মন্দির সংস্কার সমিতি পশ্চিম বঙ্গের এই প্রাচীন দেবস্থানটি

রক্ষা করে এ যুগে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা সকলের অনুকরণযোগ্য। মন্দির উদ্বোধন করেন সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ এবং প্রধান অতিথি, সভাপতি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, শম্ভু ঘোষ এবং সুধীর কুমার মিত্র। বেদব্যাস বলেছেন :

ব্রহ্মমুরারী সমর্চ্চিত লিঙ্গং
নির্মল ভাসিত শোভিত লিঙ্গং
জন্মজ দুঃখ বিনাশন লিঙ্গং
তং প্রণামামি সদা শিবলিঙ্গম।

অর্থাৎ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যাঁর অর্চনা করেন যিনি বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ও শোভিত এবং জীবেন জন্মজনিত দুঃখ নাশকারি সেই শিবলিঙ্গকে আমি সর্বদা প্রণাম করি। বেদব্যাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ষণ্ডেশ্বর জীউর উদ্দেশে আমরাও বলি প্রণামামি সদা ষণ্ডেশ্বরম্।*

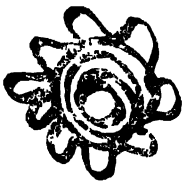

দেব সেনাপতি কার্তিক

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পানিনি তাঁর মহাভাষ্যে [৭।৩।৯১] "শিবঃ স্কন্দ বিনাশ ইতি" অর্থাৎ শিব ও কার্তিক প্রতিমূর্তির প্রসঙ্গ থাকায়, বাইশশো বছর আগেও শিব ও কার্তিকের উপাসনা ভারতবর্ষে যে প্রচলিত ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। কার্তিক অপরূপ দর্শন দেবতা। রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতীক তিনি। আর তার বাহন ময়ূর।

সুদূর অতীতে আমাদের এই ভারতবর্ষে বীরসন্ততিরূপ সমৃদ্ধ লাভের জন্য "বীরাপত্যাবিভূতয়ে" দেব সেনাপতি কার্তিকেয় দেবের বন্দনা প্রচলিত

*লেখকের "চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর" সংহতি, আষাঢ় ১৩৮৫ ও "হুগলী জেলার দেব দেউলে" অন্যান্য কাহিনী দ্রষ্টব্য।

ছিল। স্কন্দপুরাণে দেবর্ষি নারদের নির্দেশে বসুদেব ও দেবকী কার্তিকব্রত ক'রে মহাবীর্যবান পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। তাই বীর্যশালী ও ভারতের মুক্তিসাধক বীর পুত্রের জন্য (ভবন্তু বীরপুত্রাশ্চ ভারত মোক্ষসাধকাঃ) কার্তিকেয় পূজা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে আমাদের দেশে। পঞ্চম শতকে স্কন্দগুপ্তের সময়েও কার্তিক পূজার উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীনকালে মানুষ যে জন্তুকে পোষ মানাতে পেরেছে তারই পিঠে চড়ে বসেছে। এ ভাবেই সেকেলে তার যাওয়া আসার সমাধান হয়েছে। মানুষের কল্পনায় তাঁদের আরাধ্য দেবদেবীরাও চলাফেরা করেন তাদের নিজস্ব বাহনে। কার্তিকের বাহন ময়ূর।

শাস্ত্রে থাকলেও দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রীর মতো প্রতিমা নির্মাণ ক'রে কার্তিক পূজা বাঙলাদেশে খুব বেশীদিন থেকে প্রচলিত হয়নি। প্রথম দুর্গাপূজা মূর্তি ক'রে অনুষ্ঠিত হয় তাহেরপুরে রাজা কংসনারায়ণ রায়ের বাড়ি। তার আগে প্রতিমা নির্মাণ ক'রে কালী পূজা করেন নবদ্বীপের তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। জগদ্ধাত্রী পূজায় মূর্তি ক'রে পূজা করেন প্রথমে নদীয়াধীপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। আর কার্তিকের প্রতিমা প্রথম নির্মাণ ক'রে পূজা করেন চুঁচুড়ার সোম বংশের বলভদ্র সোম ১৭৮০ সালে। তারপর কয়েকটি প্রাচীন পরিবারে বিশেষ ক'রে জমিদার বংশ থেকে এই পূজা বাঙলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রবর্তিত জগদ্ধাত্রী পূজার মতো চুঁচুড়া-হুগলী-বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে কার্তিক পূজা যে রকম সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এই রকম কার্তিক পূজা আর কোথাও হয় না। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ শাসনকর্তা এই বীর-পূজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে কার্তিক পূজা তাঁদের শাসনাধীন এই অঞ্চলে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। আগে ছিল এই পূজা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক, অপুত্রকগণ পুত্র লাভের জন্য মহাধুমধামের সঙ্গে করতেন কার্তিক পূজা, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলোকমালায় সুসজ্জিত মণ্ডপ, বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্রময় বেশ কিছু সার্বজনীন পূজা। এমন কি চুঁচুড়ায় তোলা-ফটকের কাছে সম্পূর্ণ মহিলাদের উদ্যোগে পরিচালিত দুটি সার্বজনীন কার্তিক পূজাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। এইসব ঠাকুরের উচ্চতা হয় ২০ থেকে ৩০ ফুটের মধ্যে। আগে আরও উঁচু হতো, বর্তমানে বৈদ্যুতিক তারে ঠাকুরের মাথা ঠেকে যায় বলে উচ্চতা কিছু কমান হয়েছে।

দেবসেনা কার্তিকের আবির্ভাব আর দশজনের মতো হয় নি। মহাভারতের

কথায় "লোকহিত হেতু মহাদেব অগ্নি হৈলা—উমা ধরি স্বাহা মূর্তি তোমা উৎপাদিলা।" তিনি আবির্ভূত হলেন অনিন্দ্যকান্তি ষড়াননরূপে। ছ'টি মাথা বার হাত, বার কান, একটি জঠর দেখে ঋষিগণ তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ব্যাসদেব লিখেছেন :

তেজোময় স্কন্ধ রেতে জন্মিল নন্দন।
স্কন্দ নামে খ্যাত পূজা করে ঋষিগণ ॥
ছয় শির, দ্বাদশাক্ষি দ্বাদশটি কর ॥
বার কর্ণ এক গ্রীবা একটি জঠর ॥

তিনি জন্মগ্রহণ করা মাত্রই "পৃথিবী স্পন্দিত হইতে লাগিল ভীষণ—ভয়ঙ্কর উৎপাত হইল আরম্ভন।" দেবতারা তখন এই শিশুকে বিনাশ করার জন্য ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন : "যদ্যপি বিনাশ নাহি করহ তাহারে—ইন্দ্রত্ব লইবে সে জিনিয়া তোমারে।" ইন্দ্র বললেন : এই শিশু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে পর্যন্ত বিনাশ করতে পারে, আমি তো কোন ছার, তাকে কি ক'রে আমি বিনাশ করবো? তখন দেবতগণ লোকমাতাগণকে তাকে বিনাশ করার জন্য পাঠাতে বলায় ইন্দ্র তাই করলেন। ছয় কৃত্তিকাসুন্দরী গঙ্গায় শরবনে ভাসমান নবজাতককে দেখে তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপে "তনয়বাৎসল্যে মোরা হয়েছি কাতর" বলে, তাকে বিনাশ করার পরিবর্তে নিজ নিজ স্তন্যদানে তাকে সঞ্জীবীত করেছিলেন।

সেই শিশুই একদিন হয়েছিলেন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, মহাবীর্যবান অপরূপদর্শন সমরকুশলী কার্তিকেয়। ইন্দ্র তাঁকে ত্রিলোক শাসন করার জন্য ইন্দ্রত্ব পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা নেননি। তিনি বলেছিলেন, "কিঙ্কর হইয়া আমি রহিব তোমার—ইন্দ্রত্ব বাঞ্ছিত কভু না হয় আমার।" অতঃপর কার্তিকেয় দেবসেনাপতিত্ব গ্রহণ করে অস্ত্রের আশ্চর্য বিক্ষেপণে অসুরশ্রেষ্ঠ তারকাকে নিহত ক'রে তিনি উড্ডীন করেছিলেন যৌবন শক্তির বিজয় পতাকা। দেবতা গণের কাতর প্রার্থনায়, দেশের সেই ঘোর দুর্দিনে দৈবনির্দেশে হয়েছিলেন অযোনিসম্ভব কার্তিকের জন্ম। অসুরকুল ধ্বংস হবার পর দেবতারা মিলে তাঁর যে স্তব করেন, সেটির অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ্য :

দেবসেনাগণের তুমিই অধিনেতা।
তুমিই প্রচণ্ড প্রভু শত্রুগণজেতা ॥
গঙ্গা স্বাহা মহা আর কৃত্তিকা নিচয়।

হে দেব তোমার মতো এরা সব হয়।
হে দেব কুকুট তব হয় ক্রীড়ানক।
ইচ্ছামতে রূপ তুমি ধর অসংখ্যক॥
তুমি দক্ষ তুমি সোম তুমি সমীরণ।
তুমি ধর্ম গিরীশ্বর সহস্রলোচন॥
কৃপা কর ষড়ানন তুমি অন্তর্যামী।
তব সূক্ষ্মগতি কিছু নাহি জানি আমি॥[১]

প্রজাপতি কন্যা দেবসেনা হচ্ছেন কার্তিকের সহধর্মিণী, আর তাঁদের পুত্রের নাম বিশাখা। দেবী ভাগবতের মতে এই দেবসেনাই হিন্দুগৃহজননীদের পূজিতা মা ষষ্ঠী। দেবসেনা বীরাঙ্গনা বলে কার্তিকের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল। কার্তিক মাসের শেষ দিন সায়ংকালে সূর্য বৃশ্চিক রাশিগত হলে বীর পুত্র লাভের জন্য দেবসেনাপতি কার্তিকেয় দেবের পূজা চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া পৌর এলকায় বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশটি পূজা হয়।[২] তার মধ্যে চুঁচুড়ার কামারপাড়ায় ও বাঁশবেড়িয়ার দক্ষিণাঞ্চল খামারপাড়ার ষড়ানন কার্তিক পূজা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো। যে ষড়াননের কথা আগে বলেছি, এ হচ্ছে সেই মূর্তি। এই ধরনের কোনো মূর্তি অন্যত্র পূজিত হতে দেখা যায় না। ষড়ানন কার্তিকের পায়ের কাছে থাকে ময়ূর, তিনি ডান পা উঁচু ক'রে, হাতে তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতে যাবেন—এই ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। হাত কিন্তু তাঁর চারটি নয়, হাত হচ্ছে মাত্র দুটি। মহাভারতের বর্ণনা থেকে এইটুকু মাত্র তফাৎ। তবে বীরত্ব্যব্যঞ্জক এই মূর্তি দর্শককে মুগ্ধ করে।

চুঁচুড়া-হুগলী ও বাঁশবেড়িয়ায় কার্তিকের বহু রকমের মূর্তি দেখা যায়। তার মধ্যে রাজা কার্তিক, বাবু কার্তিক, লড়ায়ে কার্তিক, অর্জুন কার্তিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোথাও কোথাও আবার পূজা হয় জোড়া কার্তিকের। আবার কোথাও বা কার্তিকের সঙ্গে বিরাটাকৃতি দেবাদিদেব মহাদেব ও সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা হয়। তবে বাবু কার্তিক, রাজা কার্তিক ও লড়ায়ে কার্তিকের সংখ্যাই সর্বাধিক। বাবু কার্তিক বসে থাকেন বাবুর মতো তার বাহন ময়ূরের উপর আর তাঁর পরণে থাকে ফরাসডাঙার কালোপাড় ধুতি ও কাঁধে থাকে দামী

১। রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক মহাভারতের পদ্যে বাংলা থেকে অনুবাদ হতে গৃহীত।
২। চুঁচুড়ায় তোলাফটক, রায়ের বেড় ও মল্লিক কশেম হাটে এই পূজা হয়।

একটি কাশ্মীরী শাল। রাজা কার্তিক বসে থাকেন দুটি ময়ূরের ওপর বাবু হয়ে, পরণে কোঁচান ধুতি, আর গায়ে জরির জমকালো জামা ও মাথায় জরির সামলা। তাঁর দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন দু'জন অপ্সরা। কেউ কেউ বলেন, এঁরা দুজন হচ্ছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সাহাগঞ্জ নূতন পোস্ট অফিসের কাছে রাজা কার্তিকের মূর্তি খুবই সুন্দর। লড়ায়ে কার্তিক থাকেন দাঁড়িয়ে, ভঙ্গিমাটি খুবই বীরত্বব্যঞ্জক, ময়ূর থাকে পাশে ও তাঁর দু'হাতে থাকে তীর ও ধনুক। দেবসেনাপতি কার্তিকের এই সব বিভিন্ন ধরণের মনোমুগ্ধকর মূর্তি যে শিল্পের দিক থেকে কিরূপ সুষমামণ্ডিত তা না দেখলে বোঝা যাবে না।

কার্তিক পূজার দিন কার্তিক ছাড়া আরও বহু দেবদেবীর পূজা চুঁচুড়া-বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের দারুণ দুর্দিনে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কাতর প্রার্থনায় দেবসেনাপতি কার্তিকেয় কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে অসুর নিধন ক'রে শান্তি এনেছিলেন বলে এই শুভ দিনটিতে যে কোনো দেবদেবীর পূজা বুঝি শাস্ত্রসম্মত। তাই এখানকার অধিবাসীরা অন্য দেবদেবীর পূজাও সমারোহের সঙ্গে ক'রে থাকেন। এরূপ আর কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই। এই ধরনের আমার দেখা কয়েকটি পূজার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

রায়গলি নেতাজী সঙ্ঘ কর্তৃক পূজিত নটরাজ পূজা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সতীর ওপর নৃত্যরত নটরাজ মূর্তি অদ্ভুত বললে অত্যুক্তি হয় না। এর শিল্পী শ্রীভজহরি সাহা। আর একটি বাঁশবেড়িয়া জুনিয়ার বয়েজ ক্লাবের নারায়ণ পূজা। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের বিরাট মূর্তি যে কত সুন্দর হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। এ-ছাড়া দেবী কমলার পূজাও উল্লেখ্য। বরাভয়দাত্রী দেবী কমলা পদ্মের উপর বসে আছেন আর তার দু'পাশে দুপায়ে শুড় ওপরে তুলে সামনের দু-পা উপরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি শ্বেত হস্তি। এই অপূর্ব মূর্তি দর্শককে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। এ সবই হচ্ছে সার্বজনীন পূজা। এখন ব্যক্তিগতভাবে অপুত্রক বন্ধ্যা নারীগণ কেবল পুত্র-লাভের আশায় কার্তিক পূজা ক'রে থাকেন। তবে সংখ্যায় তা নগণ্য।

প্রখ্যাত অধ্যাপক সিল্‌ভান লেভী বলেন যে, গ্রীকদের অনুপ্রেরণায় ভারতে কার্তিক পূজা শুরু হয়। এই পূজার আছে দুটি দিক। একটি হচ্ছে, কার্তিক হচ্ছেন সাহসের প্রতীক, তাঁকে আরাধনা করলে লোকে হয় সহসী। আর একটি মতবাদ হচ্ছে, ফারটিলিটি বা প্রজননের জন্য কার্তিক পূজা করা হয়। ওলন্দাজরা প্রজাবৃদ্ধির জন্য তাই চুঁচুড়ায় কার্তিক পূজার ছিলেন প্রধান

পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের জন্যই এ পূজা চুঁচুড়ায় প্রসার লাভ করে।

সুতপ্রদ কার্তিক, যাঁরা তাঁর পূজা করেন, তিনি তাঁদের সেই পুত্রই দেবেন, যে পুত্র কেবল তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নয়, সে পুত্র হবে দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত সৌন্দর্যে বীর্যে গরীয়ান। কার্তিক পূজার মন্ত্রে তাই দেখতে পাই: ময়ূর যাঁর বাহন,—তপ্তসোনার মতো যাঁর গায়ের রঙ, হাতে যাঁর শক্তি-অস্ত্র, সেই বরদাতা মহাভাগ কার্তিকেয় দেবকে, দ্বিভুজ শত্রুনাশকারী, নানা অলঙ্কারে শোভিত, প্রসন্ন বদন, পুত্রদায়ক দেবকুমারকে, দেবগণের সেনাপতি শঙ্কর ও পার্বতীর আত্মজকে বীর সন্ততিরূপে সমৃদ্ধিলাভের জন্য সংযতচিত্তে বন্দনা করি।

পতঞ্জলি পানিনি ভাষ্যের মধ্যে শিব ও কার্তিক প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন [পানিনি সূত্র ৫।৩।৯৯] বলে অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২য় খণ্ড) নামক গ্রন্থে লিখেছেন। পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তাঁর মহাভাষ্য প্রস্তুত করেন। সুতরাং বাইশশো বছর আগেও শিব ও কার্তিকের উপাসনা যে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তা এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কবি মনোমোহন বসু কার্তিক সম্বন্ধে তাঁর আগমনী কবিতায় যে সুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন, তার চারলাইন এখানে উদ্ধৃত হলো:

আর সুত ষড়ানন সুতরুণ সুদর্শন,
সুবসন,সুভূষণ, দেহে শোভন
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, শৌর্য্য, একত্রে মিলন ;
কোমল করে ভীষণ খর শর শরাসন, সুবাহন—
ময়ূরে বিহরে।

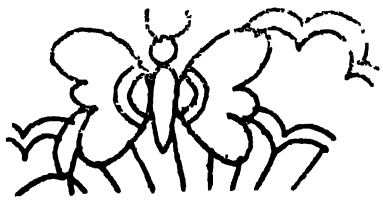

সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ

আকারে বিরাট বীরত্বব্যঞ্জক অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মাধুর্যের প্রতীকরূপী দশপ্রহরণধারিণী দুর্গমে দুর্গতিহারিণী জগজ্জননী দেবী দুর্গার সঙ্গে মহাপূজার

চিত্রিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি চালচিত্রের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশের মধ্যে একমাত্র দেবতা চতুর্ভুজ গণেশজীউর হস্তিমুখ বলে তিনিই সকলের আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গণদেবতাদের অধিপতি কামনাপূরক গণেশজীউ সর্বসিদ্ধিদাতা বলে তাঁর পূজা হয় সর্বাগ্রে এবং এই পূজা চলে আসছে আমাদের এই ভারতবর্ষে দীর্ঘ দিন ধরে। তাঁকে স্মরণ মনন ও পূজা করলে, তিনি তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন এবং তার কৃপায় ভক্ত সিদ্ধিলাভ করেন। শরৎকালে বাঙলা দেশে তিন দিন ধরে শারদীয়া পূজার মত মহারাষ্ট্রে বার দিন ধরে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে যে গণেশ পূজা হয় এবং বিসর্জনের সময় তার গীতবাদ্য সহকারে ভক্তবৃন্দের শোভাযাত্রায় সকলের একত্র গমন প্রকৃতই এক দর্শনীয় ব্যাপার।

দেবগণের মধ্যে গণেশ সূর্য অগ্নি বিষ্ণু শিব ও দুর্গা এই ছ'জন প্রধান হলেও গণেশের নাম কিন্তু আছে সর্বাগ্রে। শাস্ত্রে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের এই ছ'জন প্রধান দেবতাকে পূজা ও প্রণাম করা অবশ্য কর্তব্য বলে বলা হয়েছে।* শাস্ত্রের শ্লোকটি এই ;

"গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম।
দেব ষটকঞ্চ সংপূজ্য নমস্কৃত্য বিচক্ষণ॥"

তারপর লেখা আছে যে দেবতার প্রীতির জন্য যদি জপ পূজাদিতে তৎপর হয়ে মনুষ্য বিষ্ণু রুদ্র গণেশ ও সূর্যের নিত্য পূজা করেন, তাঁরা কখনও অবসন্ন হন না (সা কদাচিন্ন সীদতি)।

আমাদের দেশে ব্যবসাবাণিজ্য যাঁরা করেন, তারা রোজ সকাল বেলা ও সন্ধ্যার সময় অজ্ঞানের জ্ঞানগুরু গণেশকে সর্বসিদ্ধির জন্য ধূপ ধুনা দিয়ে স্মরণ করেন। এ ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলেও তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি। তাই লেখকবৃন্দ তাঁদের রচনা যাতে রসোত্তীর্ণ হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে তাই তাঁরাও স্মরণ করেন সকলের আগে গণদেবতাদের অধীশ্বর গণেশজীউকে। কথিত আছে ব্রহ্মার উপদেশে ব্যাসদেব গণেশকে প্রসন্ন করে মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের লেখক হয়েছিলেন। গৌরী পার্বতীর দুই কন্যা লক্ষ্মী সরস্বতী ও দুই পুত্র কার্তিক গণেশ দুর্গা পূজার সময় চার জনেই মায়ের সঙ্গে অবস্থান করলেও গণেশই পূজা গ্রহণ করেন সকলের আগে।

---

* হুগলী জেলার দেবদেউল—সুধীরকুমার মিত্র। পৃষ্ঠা ২৬ দ্রষ্টব্য।

আশ্বিন মাসে শুক্লাষষ্ঠীর দিন গণেশের জন্ম হয়। তাঁর অকস্মাৎ আবির্ভাব সম্বন্ধে পুরাণে যে কাহিনী আছে তা থেকে জানা যায় যে, অতীতে একবার শুক্লাষষ্ঠীর দিন জগৎ জননী মা দুর্গাকে শুয়ে থাকতে দেখে মহাদেব তাঁকে ডেকে সাড়া না পেয়ে, তিনি তাঁর কাছে গেলে তিনি অভিমান সুরে বল্লেন ঘরে আমার ছেলে নেই, তাই মন খারাপ বলে শুয়ে আছি। কার্তিককে তুমি এখুনি নিয়ে এসো। দুর্গার কথা মত মহাদেব কার্তিককে আনতে চলে গেলেন।

দুর্গার স্নানের সময় তাঁর দুই সহচরী জয়া ও বিজয়া তখন এলেন তাকে সুগন্ধী তেল হলুদ মাখাতে। তেল মাখাতে মাখাতে মাদুর্গার অঙ্গ থেকে বেশ কিছু ময়লা পড়লো এবং দেবী সেই ময়লা দিয়ে খেলার ছলে তৈরি করলেন একটি ছোট পুতুল। সুন্দর পুতুলটি দেখে নারায়ণ তার মধ্যে প্রবেশ করে দেবীকে 'মা মা' বলে ডাকতে লাগলো।

মহাদেব এদিকে কার্তিককে নিয়ে এসে হাজির হলেন। তিনি সব শুনে দেবতাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং দুর্গাও দুই ছেলেকে নিয়ে তখন খুবই খুশি। দেবতারা সব মহাদেবের আহ্বানে তাঁর আলয়ে এসে উপস্থিত হলেন। চোখে চাপা দিয়ে শনিও এলেন। শনিকে এই অবস্থায় দেখে মহাদেব খুবই অসন্তুষ্ট। শনি তখন চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে চোখ খুলতেই নব জাতকের মুণ্ডু খসে পড়লো।

দুর্গা বহু দিন আগে বর দিয়েছিলেন—শনি যার দিকে দৃষ্টি দেবে অমনি তার মস্তক খসে পড়বে। দুর্গা তাঁর ছেলের মুণ্ডু এভাবে খসে যাওয়ায় ক্রোধে তাকে কাটতে গেলেন। দেবতারা তখন দুর্গার স্তব করতে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্রোধ সংবরণ করে শান্ত হলেন। অতঃপর দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব নন্দীকে পাঠালেন একটি ছোট মুণ্ডুর খোঁজে এবং বলে দিলেন যে, উত্তরদিকে মাথা করে যে শুয়ে থাকবে আনতে হবে তার মুণ্ডু। নন্দী সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে মহাদেবের নির্দেশ মত উত্তরমুখী কোন মস্তক দেখতে না পেয়ে একটি ছোট সাদা হাতীর মুণ্ডু দেখতে পেয়ে সেটিকেই নিয়ে এলেন। মহাদেব সেই হাতীর মুণ্ডুটি ছেলের কাঁধে বসিয়ে দিতেই ছেলে 'মা মা' বলে ডাকতে লাগলো। দুর্গা এই দৃশ্য দেখে দুঃখ করতে লাগলেন। দেবতারা বললেন দেবী দুঃখ করবেন না, আজ থেকে এর নাম হবে 'গণপতি'। আর এঁকে পুজা দেবার পরই আমরা সকলে পূজা গ্রহণ করবো।

কার্তিক ও গণেশ এঁরা দুজনেই মহাবীর্যশালী যোদ্ধা। দেবসেনাপতি কার্তিক অমিতবল তারকাসুরকে নিহত করে স্বর্গরাজ্য পুনরায় দেবতাদের ফিরিয়ে দেন। সিদ্ধিদাতা গণেশও বিঘ্নাসুরকে বধ করে দেবতাদের পুনঃ পুনঃ পীড়ণের হাত থেকে রক্ষা করেন। গণেশের ধীশক্তি ও মাতৃভক্তির কাহিনীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একবার পার্বতী তাঁর দুই পুত্রকে বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যে আগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে, তাকে আমি একটা খুব ভাল জিনিষ উপহার দেবো। মায়ের কথা শোনা মাত্রই কার্তিক পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়ে গেলেন। গণেশ কিন্তু কোথাও গেলেন না, তিনি মায়ের কাছে বসে গল্প করতে লাগলেন। খানিক পরে কার্তিককে হস্তদন্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে আসতে দেখেই, গণেশ তাঁর মায়ের চারদিকে কেবল একবার ঘুরে নিয়ে বললেন—'মা তোমাকে প্রদক্ষিণ করাই আমার কাছে হলো পৃথিবী পরিক্রমা'। এই রকম ছিল বাল্যকাল থেকে গণেশের মাতৃভক্তি। গণেশ জননী মৃদু হেসে গণেশকে সমর্থন জানালেন।

গজমুণ্ড সম্বন্ধে আগে বলেছি যে, একবার শনির কোপে গণেশের মস্তক ছিন্ন হলে, নন্দী তৎক্ষণাৎ একটি হস্তিমুণ্ড এনে তাঁর কাঁধে জুড়ে দেন। পরে দুটি গজদন্তের মধ্যে একটি আবার ভেঙে যাওয়ায় তিনি হয়ে যান একদন্ত। দেবতাদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই মুখ হচ্ছে 'গজেন্দ্রবদনং' ও উদর হচ্ছে 'লম্বোদরং'।

কবি মনোমোহন বসু গণেশ বিষয়ক একটি সুন্দর বর্ণনা তাঁর আগমনী নামক কবিতায় দিয়েছেন। সেই কবিতার পাঁচটি লাইন এখানে উদ্ধারযোগ্য :

"একপুত্র গজমুণ্ড, কি প্রচণ্ড শ্বেতশুণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড তায় লণ্ড ভণ্ড করিতে পারে ;
লম্বোদর, কলেবর মন্ত্রিত সিন্দুরে ;
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ চতুষ্করে শোভা করে।
একদন্ত বসি মূষা পরে।"

গণেশের একদন্ত হওয়া সম্বন্ধে কথিত আছে যে, শিবের বিশেষভাবে অনুগৃহীত পরশুরাম বহু ক্ষত্রিয়কে বধ করে বিশেষ গর্বিত ও অহংকৃত হন। ধরাকে তিনি সরার মত জ্ঞান করতেন, এমনি ছিল তাঁর অহংকার। একবার তিনি শিবের সঙ্গে দেখা করতে যান। শিব ও পার্বতী তখন ছিলেন নিদ্রিত। তাঁদের নিদ্রার যাতে কোন ব্যাঘাত না হয়, তাই পিতা মাতার প্রতি

বিশেষ শ্রদ্ধাশীল গণেশ তখন পুরদ্বারে অবস্থিত ছিলেন। গণেশ পরশুরামকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। পরশুরাম কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না; গণেশও পিতামাতার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে বলে দরজা ছাড়ছেন না দেখে পরশুরাম তখন ক্রোধভরে গণেশকে অনেক কটু কথা বলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি চলে যাবার উপক্রম করলে, গণেশ তখন তাঁকে দুহাতে শূন্যে তুলে ধরে ত্রিভুবনচক্র দেখিয়ে তারপর ছেড়ে দিলেন। পরশুরাম এরকম অপমানিত ও লাঞ্ছিত তাঁর জীবনে কখনও হননি। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হয়ে গণেশের প্রতি নিক্ষেপ করলেন তখন তার অস্ত্র 'পরশু' তাতে গণেশের একটি দাঁত গেল ভেঙ্গে—তিনি সেই থেকেই হয়ে গেলেন 'একদন্ত'।

সমস্ত পূজায় সকলের আগে গণেশের ধ্যান করা হচ্ছে শাস্ত্রীয় বিধি। তাঁর ধ্যান মন্ত্রে যে রূপ বর্ণনা আছে তার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে এরূপ: "যিনি খর্ব, স্থূলদেহ, হস্তিমুখবিশিষ্ট, লম্বোদর, সুন্দর, ক্ষরিতমদগন্ধেলুব্ধ ও মধুমক্ষিকাগণের দ্বারা ব্যালোল হয়েছে যাঁর দন্তস্থল, দন্তাঘাতে বিদারিত শত্রুর রক্ত যাঁর অঙ্গে সিঁন্দুরের মতন শোভা পাচ্ছে সেই সিদ্ধিদাতা কামনাপূরক গণদেবতাগণের অধিপতি পার্বতীপুত্র শ্রীশ্রীগণেশজীউকে বন্দনা করি।"

হুগলীর প্রাচীন কবি পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রায় দেড়শো বছর আগে ১২৫২ সালে ১৮ বৈশাখ "সারজ্ঞানতত্ত্ব" নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। সেই কাব্যে গণেশের ত্রিপদী ছন্দে সুন্দর একটি শাস্ত্রানুবাদিত বন্দনা তিনি রচনা করেছিলেন। সংরক্ষণের জন্য উহাও উল্লেখ্য:

গণেশ বন্দনা

নম দেব গজানন, সর্ব বিঘ্ন বিনাশন,
বাঞ্ছাসিদ্ধি তোমার স্মরণে।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, অজ্ঞানের জ্ঞান গুরু
স্বত্ব রজতম তিন গুণে॥
তরুণ অরুণ প্রায়, সিন্দুরে মণ্ডিত কায়।
ইন্দুর বাহনে কর গতি।
খর্বঅঙ্গ লম্বোদর, সুশোভন চারি কর,
সকল অমরে কর স্তুতি॥
আমি দীন ক্ষীণ অতি, নাজানি ভকতি স্তুতি,
দীননাথ তুমি দীনবন্ধু।

করিয়াছি অভিলাষ, পূর্ণ কর মম আশ,
কৃপাময় তুমি কৃপাসিন্ধু ॥

পার্বতীর প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে কল্পে কল্পে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র গণেশরূপে জন্মগ্রহণ করেন এ কথা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ গ্রন্থে গণেশখণ্ডে উক্ত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত অবিরাম এই কৃষ্ণলীলা ভারতে চলে আসছে। ইনি হন বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুদগণ প্রভৃতি সমস্ত গণদেবতাদের অধীশ্বর। ইনিও কার্তিকের মত মহাবীর্যশালী বলে শাস্ত্রে কথিত ভারতের সর্বত্র তাঁর মতন সর্বশ্রেণী ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে পূজিত দেবতা দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

সেকালে সব দেবদেবীর মত গণেশ ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করে অনেক ছেলে ভোলানো ছাড়া প্রবাদের মতন আমাদের দেশে শিশুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল বাল্যকাল থেকেই সিদ্ধিদাতা গণেশের নামটি তাদের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া। আমরাও এরূপ অনেক ছড়া বাল্যে শিখেছিলাম। এখন আর সেই ঠাকুরের নামাঙ্কিত সমস্ত ছড়া বড় একটা শোনা যায় না। ছড়াগুলি হালকা ধরনের হলেও আমার বাল্যকালে মুখস্থ করা মাত্র দুটি ছড়া এখানে উদ্ধৃত হলো। যথা :

গণেশ দাদা পেটটি নাদা,
মিটি মিটি চায়,
যা কিছু দাও হাসি মুখে,
চেটে পুটে খায়।

•

গণশা করে মনসা পূজো,
কার্তিক বাজায় ঢোল,
আয় গণশা ভাত খাবি আয়,
মাগুর মাছের ঝোল।

পরিশেষে গণেশজীউর দেবভাষায় যে মন্ত্রটি শত শত মুনি ঋষি সাধু সন্ন্যাসী অবহমান কাল থেকে তাঁর প্রণাম মন্ত্র উচ্চারন করেছিলেন এবং আজও আমাদের যাবতীয় পূজায় সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্তানগণ যে সর্বসিদ্ধিদাতার নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করেন, সেই মন্ত্রটির বাংলা অনুবাদ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ আমার কোটি প্রণাম নিবেদন করে এই নিবন্ধের উপসংহার করছি। নম গণেশায় নমঃ ॥

গণেশের প্রণাম মন্ত্র

দেবেন্দ্রশিরে সুশোভিত মন্দার পুষ্পের মধুকণার মত অরুণবর্ণ গণেশজীউর চরণকমলের রেণু সকল হরণ করুক আমাদের সব যাবতীয় বিঘ্ন। একদন্ত-মহাজয়-লম্বোদর-হস্তিমুখ-বিঘ্ননাশক-হেরম্বকে করি সশ্রদ্ধ প্রণাম। সিদ্ধিদাতা গণাধিপতি সর্ববিঘ্নের শান্তিকারক লেখক দেবগণের অগ্রে যিনি দেবভাগ প্রাপ্ত হন, আমি নিজের হিতের নিমিত্ত করি তাঁকে আবার নমস্কার। তাঁর জয় হোক ॥ নম নম গণেশায় নমঃ ॥

গাণপত্য

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের লেখক পণ্ডিতপ্রবর অক্ষয়কুমার দত্ত 'গাণপত্য' সম্পর্কে লিখেছেন: গণপতির অর্থাৎ গণেশের উপাসকদিগের নাম গাণপত্য। শৈব-শক্তিদিগের ন্যায় ইহাদিগকে একটি পৃথক সম্প্রদায় বলা যায় কিনা সন্দেহ। হিন্দুমাত্রেই গণেশকে সিদ্ধিদাতা জ্ঞান করিয়া বিঘ্ন-নিরাকরণ প্রার্থনায় তাঁহার উপাসনা করে। শিব-দুর্গাদি অন্য দেবতার পূজা করিতে হইলে, অগ্রে গণেশের অর্চনা করিতে হয়। কিন্তু কতকগুলি লোকে অন্য দেবতা অপেক্ষায় তাঁহার বিশিষ্ট রূপ উপাসনা করিয়া থাকে। এইরূপ উপাসকদিগকে গাণপত্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহারা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় অন্য দেবতার উপাসনা এক কালে পরিত্যাগ করেন না।

গণেশ অনেক প্রকার। লোকে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ গণেশের নাম ধরিয়া পূজা করে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বক্রতুণ্ড ও চুণচিরাজ এই দুই গণেশ নাকি প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাদেরই উপাসনা অধিক প্রচলিত।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা

শিল্পবিজ্ঞান-এর নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মাদেবের পূজা বহুদিন ধরে বাঙলা দেশে প্রচলিত আছে। পূর্বে পূজা হতো বটে।

এখন প্রতিমা তৈরী করে খুব ধুমধামের সঙ্গে এই দেবশিল্পীর পূজা সমস্ত কলকারখানায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পকলার উদ্ভাবক এবং ঋগ্বেদে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে বিশ্বকর্মণ।

বিশ্বকর্মা হচ্ছেন সৃষ্টিবাসনাধর, নির্মাণনৈপুণ্যধর ও শাসনদণ্ডধর। তাই তাঁর পূজায় হয় শিল্পবিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি; কারণ তিনিই হচ্ছেন সমস্ত শিল্পকলার উদ্ভাবক। তিনি নির্মাণ করেছেন পুষ্পক নামে বিমান ও হাজার হাজার আকাশযান এবং অসুরদের নিধনের জন্য তিনিই নির্মাণ করেছেন বজ্রপাশ ও শতঘ্নী নামক সব মারণাস্ত্রসমূহ। তিনি দৃঢ়াঙ্গ, প্রতিভাবান ও মহাবীর্যশালী দেবতা। তাই শিল্পবিজ্ঞানে দক্ষতা ও প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য জানবার জন্য (প্রকৃতিরহস্যজ্ঞানং শিল্পবিজ্ঞানদক্ষতাম্) বিশ্বকর্মার আরাধনা বিশ্বে প্রথম প্রচলিত হয়। তাঁর বন্দনাতে আছে: বিশ্বকর্মাদেব দেবগণের মহান আশ্রয়, মহা-প্রভান্বিত, শিল্পীদের ইন্দ্র স্বরূপ এবং সন্তানসন্ততিদের আশ্রয়স্থল।

বিশ্বকর্মা পূজার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, বিশ্বকর্মাদেবের পূজার আগে গণেশ প্রভৃতি দেবতাদের পূজা না করলে তাঁর প্রীতিলাভ করা যায় না। "গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক" বিশ্বকর্মা পূজা করা শাস্ত্রের বিধি। শ্রীবিশ্বকর্মণে নমঃ তাঁর জপমন্ত্র এবং শিল্পাচর্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্মণে হচ্ছে তাঁর গায়ত্রী মন্ত্র। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন ধর্মপাল, মহাবীর ও সুচিত্রকর্মকারক এবং তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করতে করতে বিরাজ করছেন। তাঁর চোখ, মুখ হাত-পা দিয়ে তাঁর নিজ সৃষ্ট লোকসকলকে তিনি নিক্ষেপ করছেন অনন্তব্যোমে।

বিশ্বকর্মাদেবের প্রণামমন্ত্র হচ্ছে:

দেবশিল্পিন্ মহাভাগ জগতাং কর্মসাধক।
বিশ্বকর্মণ নমস্তভ্যাং সর্বাভীষ্টফলপ্রদ॥

অর্থাৎ আমার সব অভিষ্ট ফললাভের জন্য আমি দেবশিল্পী, মহাভাগ, জগতের শিল্পকর্মসাধক বিশ্বকর্মাদেবকে নমস্কার করি।

যুবকবৃন্দের বিশ্বকর্মা পূজার দিন উনিশ শতকে ঘুঁড়ি ওড়ানো ছিল একটা প্রধান অঙ্গ। সেকালের ধনী বাঙালী বাবুরা দশ টাকার ও একশো টাকার নোট ঘুঁড়িতে বেঁধে ঘুঁড়ি ওড়াতেন। সেই নোট বাঁধা ঘুঁড়ি ধরবার জন্য চলতো ভীষণ প্রতিযোগিতা। এখনও সেই ঘুঁড়ি ওড়াবার দিন হিসাবে বিশ্বকর্মা পূজার দিনটি ছেলেদের কাছে খুবই প্রিয়। এই ঘুঁড়ি ওড়ানো চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও সমধিক প্রচলিত আছে দেখা যায়।

আমাদের দেশে ঘুঁড়ির প্রকারভেদে ভোমরা, ঘয়লা, দ্যে-ঘয়লা, চাউস, চিলে, পতঙ্গ (খুব ছোট ঘুড়ি), তেলাঈ, বামনা প্রভৃতি নানা নামাঙ্কিত ঘুড়ি এখনও বিশ্বকর্মা পূজার দিন আকাশে ওড়ে।

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল কাব্যে "নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্বতাপ্রমেয়" বলে লিখেছেন কারণ "চারি পাড়ে বিশ্বকর্মা নির্মায় উদ্যান" আর কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অনবদ্য ভাষায় "অট্টাই লাটায়ে বিশ্ব করিল প্রণাম" বলে যা লিখেছেন সাহিত্যে তা বিরল। বিশ্বকর্মা শব্দের উৎপত্তি আভিধানিক অর্থে বিশ্বকর্মন্ শব্দ থেকে হয়েছে। বিশ্বের কর্ম যার অর্থাৎ শিল্পাদি কর্ম যার, তিনিই হচ্ছেন বিশ্বকর্মা—দেবশিল্পী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানে লিখেছেন যে, পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরষে যোগ-সিদ্ধার গর্ভে জাত। বেদে ইনি "ত্বষ্টা" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি স্থাপত্য বেদবক্তা বলে তাই সুপরিচিত।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিশ্বকর্মা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার কয়েকলাইন উল্লেখনীয় :

বিশ্বকর্মা, বিশ্বকর্মা, কীর্তিকর কারু।
যে চতুর চেতনের, চতুরালি চারু॥
সকলেই মুগ্ধ আছে, অখিল সংসারে।
করুণার কার্য তাঁর, কে বুঝিতে পারে?॥
যেরূপ কৌশল ইথে, কহিবার নয়।
মানবের বুদ্ধিপথে প্রবেশ কি হয়?॥
স্বভাবত যিনি হন, শিবের আধার।
শিবময় সমুদয় কার্য হয় তাঁর॥
অজ্ঞান যে সব জীব, মত্ত মোহ মদে।
পদে পদে, পড়িতেছে, বিপদের পদে॥

ইত্যাদি।

শনি ঠাকুর

প্রাচীনকাল থেকে অমঙ্গল নাশ করার জন্য শনিগ্রহের ভোগ্য দিন, সপ্তাহের শেষ দিন শনিবার সায়ংকালে শনিপূজা বাঙলা দেশে প্রচলিত আছে। অশুভ নাশ করে গ্রহগণ শুভফল দান করেন বলে গ্রহপূজা করা আমাদের শাস্ত্রীয় বিধান। গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি ও শনি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। বৃহস্পতি বারোশো পৃথিবীর সমান এবং শনি গ্রহ সাতশো পৃথিবীর সমান। ফলিত জ্যোতিষের মতে মানুষের জন্মকালে এই দুই মহাগ্রহের অবস্থানের উপরই তার জীবনের ফলাফল সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। তাই অশুভ নাশ করে শুভফল দান করবেন এই প্রার্থনা করার জন্য শনিবার এই গ্রহের পূজা ঘরের বাইরে করা হয় এবং তাঁর প্রসাদও ঘরে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে প্রসাদ বাইরে থেকেই নিতে হয়। পূর্বে শনির কোন মূর্তি হতো না, মানসপূজা হতো। এখন রাস্তার ধারে অসংখ্য মূর্তি তৈরী করে শনিঠাকুরের পূজা হয় দেখা যায়।

শুভ বা অশুভ ফলদায়িনী যে ব্রহ্মশক্তি তাই শনিগ্রহরূপে বিরাজিত এবং তাঁর পূজাই হচ্ছে শনিপূজা। শনি আশ্রয় করলে লোক শ্রীভ্রষ্ট, ধনে বঞ্চিত ও বিপন্ন হয়। পুরুষ বা নারী যিনিই শনিব্রত করবেন, তিনিই সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে সর্ব অভিষ্ট লাভ করবেন। ব্রাহ্মণ সাঙ্গবেদ অধ্যয়নে সমর্থ হবেন, ক্ষত্রিয় রাজ্য প্রাপ্ত হবেন, বৈশ্য বিত্তলাভ করবেন এবং শূদ্র সুখশান্তি লাভ করবেন এ কথা হচ্ছে স্কন্দপুরাণের। কিন্তু এখন যথাবিহিত রূপে এই পূজা বা ব্রত উদযাপন করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। তাই দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য শনিবার সন্ধ্যাবেলা ঘরের উঠানে বা রাস্তার ধারে তাঁর অর্চনা করার নিয়ম প্রচলিত হয়েছে।

শনি হচ্ছেন সূর্যের পুত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মা হতে উৎপত্তি হয়েছেন

মহর্ষি মারীচি তাঁর পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র বিবস্বান সূর্য। সূর্যের পুত্র মনু, যম ও শনি। কথিত আছে, সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা তাঁর নিজের ছায়া পতির কাছে রেখে তিনি তাঁর পিতা বিশ্বকর্মার কাছে চলে যান। তখন ছায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন শনি। তাই তাঁর প্রণাম মন্ত্রে আছে: নীলকজ্জল রাশিসদৃশ, সূর্যপুত্র ছায়ার গর্ভসম্ভূত মহাগ্রহকে ভক্তির সঙ্গে বন্দনা করি। (ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্)।

সূর্যসদৃশ মুখ বিশিষ্ট, বৃহদকায়, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবস্ত্রধারী, চতুর্ভুজ সূর্যতনয়কে তদ্রূপ বানধারীকে শূল ও ধনু যে হাতে ধারণ করেন, যম যাঁর আধিদেবতা এবং প্রজাপতি যাঁর প্রত্যভিদেবতা সেই শুভ মঙ্গলময় দেবই হচ্ছেন শনি। এই তাঁর ধ্যান মন্ত্র।

শনি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। এখানে একটি মাত্র শাস্ত্রীয় উপাখ্যান দেওয়া হলো। রঘুবংশে সপ্তদ্বীপাধিপতি মহাবলী এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম দশরথ। তিনি সুখে শান্তিতে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। এমন সময় দৈবজ্ঞগণ রাজাকে একদিন জানালেন যে, শনিগ্রহ কৃত্তিকা নক্ষত্রের অন্তভাগে গেছে, শীঘ্রই রোহিনী নক্ষত্র ভেদ করে যাবে এবং যদি ভেদ করে, তাহলে বারো বছর রাজ্যে হবে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও বহু লোক তখন মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

রাজা দৈবজ্ঞদের কথা শুনে এর প্রতিকার করার জন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। দেশের সব লোক তখন খুব ভয় পেয়ে গেল এবং বলাবলি করতে লাগলো সে যুগের পরিবর্তন হবে বলে সর্বলোকের ক্ষয়কাল বোধ হয় আসছে। ভীত সন্ত্রস্থ প্রজাদের আকুলতা রাজাকে বিশেষভাবে ব্যথিত করলো। তিনি মুনিসত্তম বশিষ্টকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই দারুণ বিপদে প্রাণরক্ষার কোন উপায় আছে কি না?

বশিষ্ট রাজাকে বললেন যে, রোহিনী নক্ষত্রে শনি যাচ্ছেন, এতে প্রজারক্ষা দূরের কথা, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই ভয়াবহ যোগের প্রতিকার ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণেরও অসাধ্য।

রাজা তখন গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে সাহস অবলম্বন করে তিনি দিব্য আয়ুধযুক্ত দিব্য ধনু নিয়ে রথে চড়ে নক্ষত্রমণ্ডলে গমন করলেন। এবং রোহিনী নক্ষত্রকে পশ্চাতে রেখে কৃত্তিকা নক্ষত্রের সামনে হংসবর্ণ অশ্বযুক্ত, মহাধ্বজ সমন্বিত, মণিরত্নবিভূষিত দিব্য স্বর্ণ রথে কেয়ুর ও

মুকুটে শোভিত এবং মহারত্নে দীপ্যমান হয়ে মহাকাশে বিরাজ করতে লাগলেন। তারপর ধনুর জ্যা আকর্ষণ করে তাতে যোজনা করলেন সংহারাস্ত্র।

কৃত্তিকার অন্তে অবস্থিত শনি রোহিণীতে যেমন প্রবেশ করবেন, ঠিক সেই সময় সামনে রোষদীপ্ত ভ্রুকুটিমুখ রাজা দশরথকে এবং তাঁর সেই সুরাসুর নিধনের ভয়ঙ্কর সংহারাস্ত্র দেখে ভীত হয়ে শনি রাজাকে বললেন: হে রাজেন্দ্র! তোমার পৌরুষ অতীব শত্রুভয়প্রদ; আমার দ্বারা দৃষ্ট হলে দেব অসুর মানুষ সিদ্ধ বিদ্যাধর নাগ প্রভৃতি সকলেই ভস্মীভূত হয়ে যায়, কিন্তু তোমার পৌরুষ দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি তুমি বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে অভীষ্ট বর দান করবো।

রাজা বললেন: হে শনিদেব! যতদিন চন্দ্র সূর্য পৃথিবী নদ নদী সাগর পাহাড় বর্তমান থাকবে ততদিন তুমি রোহিণী ভেদ করে যেতে পারবে না, এই বর মাত্র আমি চাই, অন্য বর ইচ্ছা করি না। শনি বললেন: তাই হোক।

এই বর পেয়ে রাজা কৃতার্থ হলেন এবং বারো বছর ধরে দুর্ভিক্ষ আর কখনও হবে না ও আমার এই কীর্তি ত্রিলোকে অনশ্বর হয়ে থাকবে। তারপর রাজা দশরথ পুলকিত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে শনিদেবের উপাসনা করতে লাগলেন। যথা:

কৃষ্ণনীল শিতিকণ্ঠসদৃশ তোমাকে নমস্কার, ঘোরদর্শন রুদ্রভীষণ, করাল-দন্তবিশিষ্ট তোমাকে নমস্কার, সর্বভক্ষণকারী তোমাকে নমস্কার, হে বলীমুখ, হে ধীরগতি তোমাকে নমস্কার, হে কৃষ্ণবর্ণ তোমাকে নমস্কার তপস্যাদ্বারা দগ্ধদেহ এবং সতত যোগরত তোমাকে নমস্কার, হে জ্ঞাননেত্র তোমাকে নমস্কার কশ্যপপুত্রের পুত্রকে নমস্কার।

তুমি তুষ্ট হলে রাজ্য দান কর, আর রুষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তা হরণ কর, দেব অসুর মনুষ্য শস্ত পক্ষী মহানাগ প্রভৃতি সকলেই তোমার দৃষ্ট হলে তখনই হয়ে যায় শ্রীভ্রষ্ট। ইন্দ্রাদি সকল দেবতা, মরীচি অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও সপ্ততারকা তোমার দৃষ্টপথে পড়লে হয়ে যায় স্থানভ্রষ্ট। দেশ নগর গ্রাম দ্বীপ ও মহাবৃক্ষসকল তোমার দৃষ্টিতে বিনষ্ট হয় সমূলে।

হে সূর্যপুত্র! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বরলাভের জন্য তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। "প্রদাদং কুরু মে সৌরে বরার্থং ত্বামুপাগত।"

শনি দেবতার ক্রুর বা প্রতিকূল দৃষ্টির ফলে পার্বতীপুত্র গণেশের মাথা

উড়ে যাওয়ার কাহিনী পূর্বে লিখিত হয়েছে। দুর্গা একটি সুন্দর পুতুল তৈরী করলেন, নারায়ণ সেই পুতুলের মধ্যে প্রবেশ করে 'মা 'মা বলে ডাকতে লাগলেন। মহাদেব এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে দেবতাদের সব আমন্ত্রণ করলেন। দেবতাদের সঙ্গে শনিও এলেন তাঁর চোখ চাপা দিয়ে। শনিকে এই অবস্থায় দেখে মহাদেব চটে উঠলেন। তখন শনি চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে চোখ খুলতেই ছেলেটির মুণ্ড উড়ে গেল। বলা বাহুল্য দুর্গাই একবার শনিকে বর দিয়েছিলেন—শনি যার দিকে দৃষ্টি দেবে, অমনি তার মুণ্ড খসে পড়বে।

দুর্গা তখন শনির উপর রেগে তাকে কাটতে গেলেন। দেবতারা তখন দেবীর স্তব করতে দেবী তখন নিজের ভুল বুঝে শান্ত হলেন। মহাদেব নন্দীকে পাঠালেন মুণ্ডুর খোঁজে ও তাকে বলে দিলেন উত্তর দিকে মাথা করে যে শুয়ে থাকবে, তার মাথা নিয়ে আসতে। নন্দী ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আনলো একটি শ্বেতহস্তির মুণ্ড। সেই মুণ্ড ছেলের কাঁধে বসিয়ে দিতেই ছেলে 'মা' 'মা' বলতে লাগলো। ছেলের প্রাণ ফিরে আসায় দুর্গা আনন্দিত, কিন্তু হস্তিমুখ বলে তাঁকে বিষন্ন দেখে দেবতারা বললেন: দেবি; ইনি হবেন গণের (প্রমথ গণের) অধিপতি—গণপতি বা গণনাথ এবং সব দেবতার আগে হবে এঁর পুজা; তখন হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে। শিবায়ণের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ভাষায় "গড় করি গৌরীর নন্দন গণনাথে"। দেবতারা সকলে প্রস্থান করলেন।

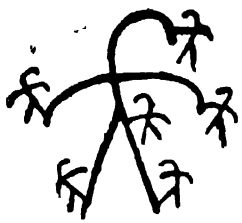

ধর্মশিক্ষা ও ভজনস্থলি

হুগলী জেলায় কৃষ্ণপুরে বৈষ্ণবকুলতিলক রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাঠকে বলে কেষ্টপুরের আখড়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরাহনগরে রঘুনাথ আচার্যের

শ্রীপাঠকে বলে পাঠবাড়ী। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের এই দুই প্রতিমূর্তি ছিলেন বাঙলার জাতীয় গৌরব। দুই রঘুনাথই তাঁদের অমর লেখনীর দ্বারা সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেছেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন সপ্তগ্রামের রাজপুত্র ও ষড়গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী। তাঁর পিতা পিতৃব্য গোবর্দ্ধন দাস ও হিরণ্য দাসের অর্থ সাহায্যে সেকালের বাঙলা তথা নবদ্বীপের পণ্ডিতরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। চৈতন্য চরিতকারের ভাষায় :

নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥

সেই রাজবংশের রাধাকৃষ্ণের প্রাচীন মন্দির ধর্মদ্বেষী আক্রমণকারীর অভিযানে পঞ্চদশ শতকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। পরে সেই বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় কেষ্টপুরের এই আখড়ায় ষোড়শ শতকে।

রঘুনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড যা মুসলমান রাজত্বকালে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল, তিনি তা নিজ ব্যয়ে ক্রয় করে শ্রীজীব গোস্বামীর নামে দানপত্রের দলিল করে দিয়ে উক্ত কুণ্ড দুইটি পুনরুদ্ধারের জন্য বৈষ্ণব জগতের আশীর্বাদ লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের দিনটি ছিল ১ মাঘ। তিনি সেই দিন স্মরণীয় করার জন্য কৃষ্ণপুরে একটি মেলার প্রবর্তন করেন যা আজও চলেছে। এটি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম মেলা।

রঘুনাথ আচার্য বর্ধমান থেকে নিভৃতে ভজন করার জন্য বরাহনগরে গঙ্গার ধারে এসে বাস করেন এবং সেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রত্যহ পূজা করতেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠে ভাগবত পাঠ শুনে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে ভাগবতাচার্য উপাধি দেন এবং বাংলাভাষায় ভাগবতের অনুবাদ করতে বলেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী" নামে সাড়ে ষোল হাজার পয়ারে বাঙলায় প্রথম ভাগবতের কাব্যানুবাদ করেন। দুই রঘুনাথের ভজনস্থান ও বাঙলার দুটি প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ দেবস্থান হিসাবে দুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো। বলা বাহুল্য এই ধরনের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীপাঠ বা পাঠবাড়ী বাঙলা দেশে তখন সর্বত্রই ছিল।

কেষ্টপুরের আখড়া

আজ থেকে প্রায় তেত্রিশ বছর আগে হুগলি জেলার ইতিহাস রচনার

তাগিদে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে ঘুরতে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর থেকে একদিন শীতের বিকেলে কেষ্টপুরের আখড়া দেখতে গিয়েছিলাম। গ্রামের আসল নাম কৃষ্ণপুর। অতীতে যে সাতটি গ্রামের সমন্বয়ে সপ্তগ্রামের সৃষ্টি, এই কৃষ্ণপুর তারই একটি। কিন্তু লোকে এই গ্রামের নাম বলে কেষ্টপুর। তাই দেবস্থানের নাম হয়েছে এখন কেষ্টপুরের আখড়া। মানিক গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গলে লিখেছেন :

অতঃপর আখড়ায় প্রবেশী শুভক্ষণে ॥
মল্লবিদ্যা আরম্ভ করিল দুইজনে।

ঐ কিন্তু সে আখড়া নয়। এ আখড়া হচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীদের শিক্ষা ও সাধন ভজনের আলোচনা স্থান। ইংরেজীতে যাকে বলে 'মনেসট্রি'। প্রাচীনকালে এখানে ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর ও রাজার প্রাসাদ। লঙ সাহেব বলেছেন প্লীনির সময় থেকে পোর্তুগীজদের আগমনকাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম ছিল রয়াল পোরট অর্থাৎ রাজকীয় বন্দর। আর বিপ্রদাস লিখেছেন "অভিনব সুরপুরী দেখি সব সারি সারি। প্রতি ঘরে কণকের ঝারা।" কালপ্রবাহে আক্রমণকারীর অভিযানে প্রাচীন সব কিছু নিদর্শন অবলুপ্ত হলেও রাজবংশের বিগ্রহ মদনমোহন এখনও কেষ্টপুরের আখড়ায় বিরাজ করছেন বলে তাঁকে দেখতে সেখানে যাই। পুণ্যতোয়া সরস্বতী তীরে এই আখড়ায় আমার সঙ্গী বিষ্ণুপদ করের সঙ্গে যখন উপস্থিত হই, তখন তিনটে বেজে গেছে। বিষ্ণুবাবু রসিক ব্যক্তি। সম্পর্কে আমার ভায়রাভাই ও বন্ধুস্থানীয়। গ্রাম দেখতে তিনি খুব ভালবাসেন ও আলোকচিত্র শিল্পে বিশেষ পারদর্শী বলে আমার পরিক্রমায় প্রায়ই তাঁকে সঙ্গে নিতাম। আজ তিনি ইহলোকে নেই।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে এই আখড়াবাড়িকে মুরারিপুর অখড়া বলেছেন এবং লিখেছেন পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ঠিক কথাই লিখেছেন, কারণ সপ্তগ্রামের রাজকুমার রঘুনাথ দাসগোস্বামী ছিলেন মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য এবং পাঠকীর্তনের জন্য তিনি ছিলেন এই আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা। বৈষ্ণব জগতে তাই এর নাম রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাঠ। শরৎচন্দ্র এই স্থানের নবনামকরণে অর্থের কোন পরিবর্তন করেননি। কৃষ্ণ ও মুরারি এক বলে তিনি কৃষ্ণপুরকে মুরারিপুর বললেও ঠাকুরঘরে কাল পাথর ও পিতলের রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি আজও বিদ্যমান। বিজনগ্রাম কৃষ্ণপুরে উচ্চ প্রাচীর

বেষ্টিত আখড়ায় ঢুকতেই বেরিয়ে এলেন গৈরিক বসন পরিহিত শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধ মোহান্ত। নাম গৌরগোপাল অধিকারী। তখন পঞ্চাশের মন্বন্তর চলছে। গ্রামে আট-দশ ঘর হিন্দু ও কয়েকঘর মুসলমান থাকলেও আখড়ায় বড় একটা কেউ আসে না। দূরের যাত্রী আসা তো স্বপ্নাতীত। তাই অসময়ে আমাদের দেখে আশ্চর্য হলেও তিনি সাদর সম্ভাষণে আমাদের আসার কারণ শুনে মন্দিরের রোয়াকে বসবার আসন দিলেন। মন্দির মানে তিনখানি বড় বড় অর্ধভগ্ন ঘর। আর তার মধ্যে বিরাজ করছেন কাঠের সিংহাসনে চার হাত লম্বা নিতাই-গৌরের দারু বিগ্রহ। আর তার পশ্চিমে রয়েছেন রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। অন্য একটি ঘরে রয়েছেন কাল কষ্টি পাথরের সুন্দর একটি বাল-গোপাল মূর্তি। পাশে রয়েছে ভগ্ন রন্ধনশালা, আর সামনে ছিল অতিথি-শালা ও রাধাকৃষ্ণের নবরত্ন মন্দির এখন তা সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, রয়েছে কেবল পাহাড় প্রমাণ ইটের ধ্বংসস্তূপ। মোহান্ত বললেন, প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে পাঠান রাজত্বে রঘুনাথের বাড়ি ধ্বংস হলে, মন্দিরের পূজারী বিগ্রহগুলি অপবিত্র হবার ভয়ে নদীর ধারে ঠাকুরগুলিকে সব পুতে রেখে পালিয়ে যান। রঘুনাথ তখন বৃন্দাবনে বাস করছেন, তিনি তাঁর কুলদেবতার দুর্দশার কথা শুনে তাঁর শিষ্য কৃষ্ণকিঙ্কর গোস্বামীকে এখানে পাঠান। তিনি নবাবের অনুমতি নিয়ে বিগ্রহ সমস্ত পুনরুদ্ধার করে অভিষেকের পর তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের মত উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে তিনি আবেগের সঙ্গে সব পুরানো কথা বলতে লাগলেন। মুড়কি নারকেলনাড়ু প্রসাদ দিলেন। বিষ্ণুবাবু কথা একটু বেশি বলেন। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, আর মোহান্তজী সমানে জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। শেষে বিষ্ণুবাবু যখন বল্লেন যে, আপনাকে দাঁড় করিয়ে মন্দিরের একটি ছবি তুলবো, তখন বৃদ্ধ চাদর গায়ে দিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।*

অতঃপর মোহান্তজী আর একটি ঘরে রঘুনাথ যে পাথরের বেদীতে বসে সাধনভজন করতেন সেই পবিত্র পাথরখানি ও তাঁর ব্যবহৃত খড়ম এবং লাল কাপড়ে বাঁধা আঠারখানি পুঁথি আমাদের দেখালেন। আমি কয়েকটি পুঁথি খুলে দেখলাম। অযত্নে অবহেলায় ধুলোভর্তি পুঁথিগুলি সব কীটদষ্ট। এই পুঁথিগুলির যে কয়খানি আমি দেখলাম, সেগুলি হচ্ছে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, হরিভক্তিবিলাস ও বাংলা শ্রীচৈতনচরিতামৃত গ্রন্থ। সংস্কৃত পড়তে

* সেই ছবিটি 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

পারলাম না, বাংলা চৈতন্যচরিতামৃতের শেষে "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং দোষনাসকং" শ্রীমাধব দাস কর্তৃক ১৫৩৭ শকাব্দে (১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ) নকল করা হয় বলে লেখা রয়েছে দেখলাম।

এরপর তিনি নিয়ে গেলেন প্রাঙ্গণের বাইরে—সেখানে দেখি প্রবাহিত হচ্ছে সরস্বতী নদী, যার বিশাল বক্ষের ওপর দিয়ে একদা বাণিজ্যপোত পৃথিবীর সব রত্নরাজি বহন করে আনতো। এখন তাকে সঙ্কীর্ণশরীরা দেখে মনে হল—"কাল সৃষ্টি, কাল স্থিতি, কাল করে লয়। সুখ দুঃখ সব সেই অতিক্রম্য নয়॥"

নদীর ধারে রয়েছে পূর্বতন মোহন্তদের কয়েকটি ভগ্ন সমাধি! সমাধিক্ষেত্র ও সাধনক্ষেত্রের একই অবস্থা দেখে আমার মন যখন ভারাক্রান্ত, তখন মোহান্তজী বললেন, কি করবো বলুন, কেউ দেখেন না, কেউ এখানে আসেন না—ঠাকুরের জমি ছিল ১০১ বিঘা, সব এখন প্রায় বেদখল হয়ে রয়েছে। মাত্র ২৫ বিঘার মত জমি থেকে এখন যা ধান পাই, তা থেকে কায়ক্লেশে ঠাকুরের সেবা চালাই। এবারে ধান হয়নি, চলছে তাই অর্ধাহার অনাহার। তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে আমার লজ্জা হল কত নূতন মঠ-মন্দির হচ্ছে—আর বড গোস্বামীর মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেছিলেন, যিনি 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য আর স্ত্রী-অপ্সরাসম' ছেড়ে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচারে সহায়তা করেছিলেন। সেই বৈষ্ণব কুলতিলক রঘুনাথের বিগ্রহের সেবা হয় না? এর চেয়ে আর দুঃখের কি হতে পারে?

তিনি বলতে লাগলেন: এই যে বাড়ি দেখছেন। এটি তৈরী করে দেন প্রায় দেড়শ বছর আগে মতিলাল শীলের ঠাকুরমা। তারপর কায়স্থ সভার চেষ্টায় কিছু সংস্কার হয়, শেষ সংস্কার হয় ১৩৩০ সালে! দেবসেবার জন্য রামদাস বাবাজী তাঁর এক ভক্তকে বলে দেন। তাঁর ৪০ টাকা দানে এতদিন পূজা চলতো, কিন্তু সেই ভক্তের মৃত্যুর পর তাও বন্ধ।

কলকাতায় ফিরে রামদাস বাবাজী মশায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব বলায় তিনি তাঁর এক শিষ্যকে বলে পুনরায় মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। প্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতি, দেবেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক কোষাধ্যক্ষ ও শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত ও আমি হই তার সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠান থেকে

পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করে মোহান্ত মহারাজকে আখড়া মেরামতের জন্ত প্রথম দেওয়া হয়।

কৃষ্ণপুরে তারপর বহুবার গিয়েছি, বহু সভা সমিতি সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একবার ইটের ধ্বংস্তূপের ভিতর থেকে মন্দিরের একটি ইটে অঙ্কিত কারু-কার্যযুক্ত পদ্মফুল সংগ্রহ করি। ইটটির আয়তন ছিল নয় বর্গ ইঞ্চি এবং ওটি পঞ্চদশ শতকের বলে সকলে সিদ্ধান্ত করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে (৯ মাঘ ১৩৬৮) প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্ত তাই লেখা হয়।

দেবানন্দপুর পল্লী সেবক সমিতির পক্ষে শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত, দেবানন্দপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের পক্ষে জনাব সেখ আবদুল সোভান, কায়স্থ সভার পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বসু ও হুগলী জেলা সমিতির পক্ষে আমার স্বাক্ষরে যে আবেদন-পত্র বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্টকে দেওয়া হয়, তার ফলস্বরূপ কয়েক বছর তদ্বির করার পর, তাঁরা ৭০ হাজার টাকা মন্দির সংস্কারের জন্য অনুমোদন করেন এবং ১৯৭০ সালে কেষ্টপুরের আখড়া আবার নবরূপ ধারণ করে। সেই বছর শ্রীপাঠে ১ মাঘ মোহান্ত মহারাজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় রঘুনাথ দাস গোস্বামীর একটি তৈল চিত্র এবং চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন সুধীরকুমার মিত্র।

উত্তরায়ণ মেলা

কৃষ্ণপুরের উত্তরায়ণ মেলা বাঙলা দেশের প্রাচীনতম মেলা। ১ মাঘ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণকে স্মরণীয় করার জন্য উত্তরায়ণের দিন সপ্তগ্রামের রাজকুমার শ্রীমদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী কৃষ্ণপুরে রাধারুষ্ণের মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচশো বছর আগে এই ঐতিহ্যবাহী মেলার প্রবর্তন করেন। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম কৃষ্ণপুর এখন একটি পরিত্যক্ত বিজন গ্রাম হলেও প্রাচীনকালে এই ত্রিবেণী সঙ্গমস্থল অঞ্চলই ছিল মুক্তবেণী—হিন্দুদের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র। কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় "মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে—আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে" আর সপ্তগ্রাম মহানগর ছিল পূর্ব ভারতের একমাত্র রাজকীয় বন্দর। পূণ্যতোয়া সরস্বতী নদী এই মহানগরের পাদমূল ধৌত করে তখন প্রবাহিত হত। আর বহন করে আনতো সব দেশ-বিদেশের রত্নরাজি। বহু লোকের বসতিপূর্ণ সপ্তগ্রামে বানিজ্যালয়, ধনীদের বিরাট বিরাট প্রাসাদ, ধর্মমন্দির, বিস্তৃত রাজপথ ও রাজপথের অবিরাম জনপ্রবাহ তখন এখানকার শ্রী ও

সজীবতা রক্ষা করতো। এখানে রঘুনাথ প্রবর্তন করেন ১ মাঘ এই উত্তরায়ণ মেলা।

মকরসংক্রান্তির পরের দিন ১ মাঘ উত্তরায়ণ—এই শুভদিনে সূর্যদেব কর্কট-ক্রান্তির দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হয় বলে দিনও ক্রমশ বাড়তে থাকে। আর মানুষ পায় কাজ করার অফুরন্ত সময় তাই এই আনন্দোৎসব। এর আর একটি আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। মৃত্যুর পর মানুষ দুটি মার্গের মধ্যে যে কোন একটি মার্গে যায়। এটি হচ্ছে আমাদের শাস্ত্রবাক্য। একটি উত্তরায়ণ মার্গ অর্থাৎ দেবযান, আর একটি দক্ষিণায়ণ মার্গ বা পিতৃযান। উত্তরায়ণে আত্মার গতি হলে হয় মুক্তি লাভ, আর দক্ষিণায়ণে গেলে হয় আত্মার পুনর্জন্ম। মহাপ্রভু তাই ১ মাঘ উত্তরায়ণের দিন সন্ন্যাস নেন ও রঘুনাথও সেই জন্য প্রবর্তন করেন উত্তরায়ণ মেলা। ষড়গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ গোস্বামীর পুণ্য স্মৃতি ও তাঁর পবিত্র জীবনের আকুতি ও সম্প্রাপ্তি স্মরণের জন্য কৃষ্ণপুরের মেলায় রাধাকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেবার জন্য রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাটে হাজার হাজার নরনারী দূরদূরান্ত থেকে ধর্মের প্রেরণায় আজও সমবেত হন। রবীন্দ্রনাথের কথায়:

এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।

বাঙলাদেশে গ্রামে গ্রামে মেলা। পথে ঘাটে মেলা, দেবতাদের নামে মেলা, মহাপুরুষদের নামে মেলা, এটি বাঙালী সংস্কৃতির একটি মনোরম বিকাশ। এই মেলা কথাটি যেন উৎসারিত হয়েছে শ্যামলা বঙ্গমাতার অন্তর থেকে, তাই মেলার নাম শুনলেই বাঙালী হয় চঞ্চল। মানুষ যেখানে একক বিচ্ছিন্ন সেখানে সে হয় ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্রতার প্রাচীর ভেঙে যখন সে দেশের সঙ্গে মিলতে পারে তখন সে হয় বৃহৎ, সে হয় মহৎ। মেলা মিলন ঘটায়, সকলকে মিলিত করে। এক কথায় বিচ্ছিন্নকে ছিন্ন থাকতে না দিয়ে, তাকে বহুর সঙ্গে মালায় গাঁথে, স্নান করায় রসসমুদ্রে। তাই মেলার আকর্ষণ যুগ যুগ ধরে চলছে আমাদের দেশে।

মেলার মধ্যে কেবল যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানই বাঙালীকে আকৃষ্ট করেছে তা নয়। আবালবৃদ্ধবনিতার বহু সমস্যাভারাক্রান্ত প্রাত্যহিক জীবনে মেলা আনে

নতুনের স্পন্দন ও পরিবর্তনের স্বাদ। তাই বাঙলাদেশের মেলা বাঙালীর কাছে এত জনপ্রিয়! সমাজ জীবনের পারস্পরিক আনন্দ বিনিময়ের কেন্দ্র হিসাবেও মেলার একটা বিশিষ্ট স্থান অনস্বীকার্য। সেকালের বাঙালী আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ ও সেই সঙ্গে সংসারের প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র কিনতেন এই মেলায়। ছড়া, কবিগান, পাঁচালী, তর্জা, ঝুমুর, কীর্তন প্রভৃতি আনন্দবিধানের যাবতীয় জিনিস ছিল মেলার প্রধান অঙ্গ।

সেকালে মেলাই ছিল শ্রেষ্ঠ প্রচারক্ষেত্র। এ দেশে যত সাধুসন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছে, যত পুণ্য তীর্থের সৃষ্টি হয়েছে, লোকের মুখে মুখে মেলার মাধ্যমে সেই সব কাহিনী দেশ থেকে দেশান্তরে প্রচারিত হয়েছে। সেই সৌধমালা সুশোভিত মহানগর সপ্তগ্রাম একদা আধুনিক হাওড়া-হুগলী-বর্ধমান, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালের কঠিন হস্তাবলেপে সে সব এখন লুপ্ত হয়ে গেলেও রঘুনাথের উত্তরায়ণ মেলা আজও ১ মাঘ এক দিনের জন্য জনকোলাহলে সজীব হয়ে ওঠে। হাওড়া থেকে কৃষ্ণপুরের দূরত্ব ত্রিশ মাইল। সপ্তগ্রামের শেষ চিহ্ন এখন বহন করছে আদিসপ্তগ্রাম পূর্ব রেলপথের একট ছোট্ট রেল স্টেশন। ব্যাণ্ডেলের পরের স্টেশন। স্টেশন থেকে পশ্চিমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হয়ে মাইল দেড়েক হেঁটে গেলে কৃষ্ণপুর। এই মহানগর কালপ্রবাহে এখন শেয়াল কুকুরের আবাসভূমি।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাটকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে এসে মেলার জন্য কয়েক হাজার দোকান, আর যে ভয়াবহ নির্জনতা সারা বছর কৃষ্ণপুরকে করে রাখে স্থবির গম্ভীর একদিনের জন্য সে রূপকথার সোনার কাঠি ছোঁয়ার মত হঠাৎ জেগে ওঠে, স্থানটি উপচে ওঠে সেদিন জনকোলাহলে। ১ মাঘ এখানে হয় পঞ্চাশ হাজার লোকের মেলা। মেলার উপলক্ষ কেউ জানে, কেউ জানে না। কেবল ধর্মের জন্য মিলতে হয়, তাই আসে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা। ওই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয়, তাহারা হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে।

মেলার দিন শ্রীপাটের রাধাকৃষ্ণ, নিতাই গৌর ও বাল গোপালকে ভক্তদের দর্শনের জন্য নিয়ে আসা হয় বাইরের বারান্দায়, আর হাজার হাজার নরনারী দেন তাদের প্রণামী আর শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসে অসংখ্য কীর্তনের দল, তারা পালা করে সেখানে কীর্তন করেন অষ্টপ্রহর। ভগ্ন শ্রীপাট সম্প্রতি জনকল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক সুসংস্কৃত হওয়ায় শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। মেলায় খাবারের দোকান, চুড়ির দোকান, মনোহারী দোকান, বই-এর দোকান প্রভৃতি কত যে দোকান হয় তা বলা যায় না। সেখানে রামায়ণ মহাভারতের পাশে থাকে কোরাণ। গীতার পাশে পীরের কথা, লক্ষ্মীর পাশে শোভা পায় শনির পাঁচালী। রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারদের শিব-দুর্গা-কালী প্রভৃতি দেবদেবীর ছবি কেনার ভিড় দেখে গ্রাম বাঙলার নরনারী যে এখনও কী রকম ধর্মে অনুরক্ত তা বোঝা যায়।

মেলায় ছুরি কাঁচি বঁটি কাটারি কোদাল কুড়ুল হাতা খুন্তি চাটু কড়া কিছুই বাদ নেই। চাল ডাল আলু বেগুন কুমড়ো সবই আছে। যাত্রীরা সরস্বতী নদীর তীরে মেলায় এসে করেন বনভোজন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কুমড়ো, বেগুন যে কত বড় হতে পারে মেলায় না দেখলে তা বিশ্বাস হবে না। কালের অমোঘ বিধানে সপ্তগ্রামের সব কিছু লুপ্ত হলেও শ্রীভগবানের অংশসম্ভূত ষড়গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ যার নাম স্মরণ করলে বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূরণ হয়, তাঁর রাধাকৃষ্ণ বালগোপাল শ্রীপাটে আজও বিদ্যমান রয়েছে, আর রয়েছে তাঁর প্রবর্তিত মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত পাঁচ শতকের উত্তরায়ণ মেলা যা এখনও সকলকে ধর্মসমুদ্রে স্নান করাচ্ছে। এখানে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রঘুনাথের তৈলচিত্র।

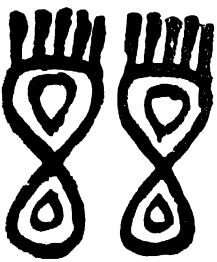

পাটবাড়ী

বরাহনগরের "পাটবাড়ী" মহাপ্রভুর চরণচিহ্নিত একটি প্রসিদ্ধ ও পবিত্র পীঠস্থান; কারণ শ্রীচৈতন্যদেব এই পাটবাড়ীতে সন্ন্যাস নেবার পর নীলাচলে

যাবার পথে চৈত্রমাসের প্রথম দ্বাদশী তিথিতে পানিহাটী শ্রীরাঘবভবন থেকে বরাহনগরে মালীপাড়া গ্রামে পণ্ডিত রঘুনাথ উপাধ্যায়ের ভজন কুটিরে ভাগবত পাঠ শুনতে আসেন। বর্দ্ধমান জেলার তান্দুলী পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত ঘোড়ানাসী গ্রামে রঘুনাথের আদি নিবাস ছিল; কিন্তু সংসারে অনাসক্ত হবার পরে পতিতোদ্ধারিণী সুরধনী তীরে নির্জনে নিভৃতে ভজন করার জন্য রঘুনাথ বরাহনগরে এসে বসবাস করেন। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় আমাদের দেশের অবস্থা ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায়:

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

হিন্দু সমাজের পরিচালক তৎকালীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই তখন ভোগবাদী শাক্ত ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ত্যাগবাদী কৃষ্ণোপাসক সে সময় প্রায় কেউই ভাল ছিল না। বরং "জগৎ প্রমত্ত—ধন-পুত্র বিদ্যা-রসে; বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে।" এমতাবস্থায় শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন রঘুনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণই যে জীবের একমাত্র পরতত্ত্ব এবং সাধ্যবস্তু তা শ্রীমদ্ভাগবত পড়ে তিনি বুঝতে পারেন এবং গ্রামে তাঁর ভাগবত পাঠের বিঘ্ন হওয়ায় সেই পরমভাগবত বৈষ্ণব সাধক গঙ্গার ধারে নির্জনে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং বরাহনগরে এসে সব সময় শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্য করতে লাগলেন ভাগবত পাঠ।

শ্রীচৈতন্যদেব নৌকাযোগে পানিহাটী থেকে যাত্রার সময়ে মধুস্রাবী কণ্ঠে রঘুনাথের ভাগবত পাঠের কথা ভক্তবৃন্দের কাছে শুনে তিনি বরাহনগরে তাঁর কুটিরে এসে উপস্থিত হন। শ্রীভাগবতাচার্যের লীলা প্রসঙ্গে শ্রীহরিদাস ঘোষাল লিখেছেন: শ্রীএকাদশীর দিন সুরধুনী তীরে বট-বৃক্ষতলে [শ্রীচৈতন্যদেব] প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যকীর্ত্তন করে দ্বাদশীর দিন মধ্যাহ্নে পানিহাটী হতে যাত্রা করলেন এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বরাহনগরে শ্রীরঘুনাথের কুটিরে মহাপ্রভু এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীবৃন্দানিকুঞ্জে শ্যামসুন্দরের সুমধুর বংশীধ্বনি শুনে শ্রীরাধিকা যেমন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই ধ্বনি অভিমুখে ধাবিতা

হয়েছিলেন সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনের নিমিত্ত আকুল প্রাণে চলতে চলতে বরাহনগর গ্রামে অতি সুললিত কণ্ঠে কেউ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করছেন শুনে প্রেমোন্মাদে উদণ্ড নৃত্য করতে করতে শ্রীরঘুনাথ-অঙ্গনে উপস্থিত হলেন। এদিকে যিনি পাঠ করছিলেন, সেই রঘুনাথ আত্মহারা হয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে সমবেদনা অনুভব করতে করতে শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীগীত পাঠে বিভোর হয়েছিলেন।

রঘুনাথ হঠাৎ চেয়ে দেখেন যে, যাঁর শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করে তিনি আত্মহারা হয়ে পাঠ করছেন, সেই গোপীমনোহারী বংশীধারী আজ শ্রীরাধা ভাবদ্যুতি-সুবলিত হয়ে মহাতেজঃ-পুঞ্জশালী এক নবীন সন্ন্যাসীবেশে এসে তার কুঠিরাঙ্গনে নৃত্য করছেন। কিছুই বুঝতে না পেরে, অশ্রুকম্প পুলকাদি অষ্টসাত্বিকভাবে তিনি বিভাবিত হয়ে পড়লেন। একটু প্রকৃতস্থ হয়ে যেমন রঘুনাথ সন্ন্যাসীর চরণে প্রণিপাত করতে যাবেন, অমনি ভাবে বিভোর সন্ন্যাসী "বোল বোল" বলে তাঁকে ভাগবত পাঠ শেষ করতে নিষেধ করলেন। তারপর "সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া, প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া।"

চৈতন্যভাগবতকার শ্রীমদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা উদ্ধারযোগ্য :

তবে প্রভু আইলেন বরাহ নগরে।
মহা ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিল পড়িতে॥
শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্টা হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিল গুণ নিধি॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বলেন ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
এতেক তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।

ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য ॥
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সবে করিলেন মহা মহা হরি হরি ধ্বনি ॥

তারপর শ্রীচৈতন্যদেব মহানন্দে তিনদিন রঘুনাথের কুটিরে বরাহনগরে অবস্থান করেন এবং রঘুনাথকে যাবার সময় শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible]লিত ছন্দে বাঙলায় একটি অনুবাদ করবার কথা বলে যান। যাবার সময় ভক্ত রঘুনাথের সনির্বন্ধ অনুরোধে মহাপ্রভু তাঁর নিজের ব্যবহৃত খড়ম জোড়াটি তাঁকে দিয়ে যান। অতঃপর পরমভাগবত ভাগবতাচার্য শ্রীমদভাগবতের কাব্যানুবাদে মনোনিবেশ করেন এবং দু'বছরের মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী" নাম দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বাঙলা অনুবাদ প্রচার করেন। ১৩১২ সালে প্রাচ্য-বিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি এই সম্বন্ধে লিখেছেন: "শ্রীরঘুনাথ আচার্য কেবল পণ্ডিত নহেন, শ্রেষ্ঠ কবিও ছিলেন। তাঁহার ভাষার লালিত্য, মাধুর্য ও ভাবগ্রহিতা শক্তি আলোচনা করিলে সকলেই বিমুগ্ধ হইবেন।"

১৩১৭ সালে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় এই গ্রন্থ 'বঙ্গবাসী' থেকে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। তারপর বসুমতী সাহিত্য মন্দিরও একবার ইহা প্রকাশ করেন। এই দুঃপ্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্য মঠ" সম্প্রতি মায়াপুর থেকে আবার ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীর ভাষ্য সহ প্রকাশ করেছেন। শ্রীমদ ভক্তি-বিলাস-তীর্থ মহারাজ বর্তমান সংস্করণের সম্পাদক।

ভাগবতাচার্য শ্রীমদ রঘুনাথের "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী" মহাকাব্য ১৬,৫০০ সুললিত পয়ারে লিখিত। তাঁর সরস ও সরল অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য বলে এখানে তার নিদর্শন স্বরূপ কলিকালে নরনারীর অবস্থা কেমন হবে, সেই অংশের কয়েকটি পঙক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

"ক্ষুদ্র দৃষ্টি ক্ষুদ্রভাগ্য বিস্তর আহার।
ধনহীন মহাকামী নিন্দিত আচার ॥
সতী কুলবতী নারী হৈব দোচারিণী।
পাষণ্ড দুঃশীল বেদপথ বেদবাণী ॥
প্রজাভুক রাজা ধন-দার অপহারী।
ব্রহ্মচর্য ব্রতহীন হৈব ব্রহ্মচারী ॥
দ্বিজগণ হৈব শিশ্নোদর-পরায়ণ।

লোলুপ সন্ন্যাসী হব কুটুম্ব-সঙ্গম ॥
বানপ্রস্থ হৈব গ্রামবাসী মন্দাচার।
হ্রস্বকায় হৈব সব লোক মহাহার।
কুলবতী কপটিনী কুবাক্য-ভাষিণী
নানা মায়া উচ্চহাস বিবাদকারিণী ॥
কপটি কিরাট লোক হৈব কুটকারী।
করিব নিন্দিত কর্ম কুলধর্ম ছাড়ি ॥
নির্দ্ধন দেখিয়া পতি তেজিব কিঙ্করে।
দুর্গত দেখিয়া ভৃত্য ছাড়িব ঈশ্বরে ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু জ্ঞাতি পরিজন।
সকল তেজিব নারী সুরতি-কারণ ॥
দীন হীন স্ত্রী-জিত হইব কলিকালে।
শূদ্রে প্রতিগ্রহ লৈব তপস্বীর ছলে ॥
সভাতে কহিব ধর্ম অধার্মিক জনে।
বসিব অধিক হেয়া উত্তম আসনে ॥
কিঞ্চিত কারণে লোক ত্যজিব জীবন।
অল্পধন কারণে বধিব বন্ধুগণ ॥
বাপে পুত্র তেজিব তেজিব পুত্রে পিতা।
পতি কুলবতী ভার্যা পুত্রে বৃদ্ধ মাতা ॥
কলিযুগে দীন হীন হৈব সর্ব নর।
তেজিব সকল ধর্ম শিশ্নোদর পর ॥
কলিযুগে কেহ না ভজিব শ্রীহরি
পাষণ্ড খণ্ডিত-মতি ভেদবুদ্ধি ধরি ॥*

শ্রীহরিদাস দাস "শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য" নামক গ্রন্থে এই প্রাচীন মহাকাব্য সম্বন্ধে লিখেছেন: শ্রীমদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীপাদের শিষ্য (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৭৯) শ্রীমদ ভাগবতাচার্য্য 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' নাম দিয়া শ্রীমদভাগবতের বঙ্গভাষায় সরস, সরল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু পাণিহাটি হইতে যখন বরাহনগরে শুভ বিজয় করিয়াছেন, তখন রঘুনাথ একমাত্র শ্রীমদভাগবত শুনাইয়াই সেই শ্রীভাগবতরস মূর্তিমান

* ১৪৯৮ শকাব্দের (১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) পূর্বে রচিত—১২শ স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গের আতিথ্যবিধি করেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুও প্রেমাবেশে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নৃত্যাদি করত রঘুনাথের গুণকীর্তনপূর্বক তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে এই অনুবাদটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর, ভাষাটি সরল, মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল। তাই শাখানির্ণয়ামৃতে শ্রীযদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্রকম্।
যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী॥"

পূর্বকালে এই গ্রন্থের যে বহুল প্রচার ছিল এবং ইহা যে গীত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতি অধ্যায়ে বহুবিধ রাগরাগিনীর উল্লেখই ইহাকে সঙ্গীতা-কারে ব্যবহারের সাক্ষ্য দিতেছে।

নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে' যে চৌষট্টিজন মহান্তের নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ভাগবতাচার্যের নামও উল্লিখিত আছে। যথা:

ভাগবতাচার্য বাণীনাথ ব্রহ্মচারী।
চৈতন্যবল্লভ দাস ভক্তি অধিকারী॥

পণ্ডিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় জানা যায় না। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু যে কোন সময় হয়েছিল তার সঠিক সাল তারিখ আজও অজ্ঞাত রয়েছে। তিনি নিজের স্বল্প পরিচয় মহাগ্রন্থে যা লিখেছেন তা হচ্ছে:

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুক্ত গদাধর নামে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে॥
ক্ষিতিতলে কৃপায় কেবল অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার॥
বৈকুণ্ঠ নায়ক কৃষ্ণ চৈতন্য মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তেঁহ সহজে শকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুইচরণ।
দেহ মোর কার্য্য মোর সেই সে শরণ॥

বন্ধুবর ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লেনিনগ্রাডে লোক সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য ১৯৭৩ সালে রাশিয়া যান। সেখানে তিনি প্রাচ্যভবনের পুঁথিশালায় কয়েকটি বাংলা পুঁথির মধ্যে ভাগবতাচার্যের "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী" দেখে "সোভিয়েত দেশে বাংলা পুঁথি" শীর্ষক যে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রভুপাদ ভক্তি

সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে (১৯৭৪) প্রকাশ করেছেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধার করছি :

"পুঁথিগুলি এক একটি করিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া রাখা হইল। প্রথমেই একখানি সুবৃহৎ পুঁথি খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, তাহা ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিত রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী'র পুঁথি। পুঁথিখানি সম্পূর্ণ, অখণ্ডিত। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে'র মত কেবলমাত্র দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র নহে। তবে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত মর্মানুবাদ। অবশিষ্ট তিন স্কন্ধ আক্ষরিক অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতের মত একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থের আদ্যো-পান্ত অনুবাদের কাজ যে কি পরিমাণ পরিশ্রম সাপেক্ষ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার রচয়িতা একান্ত কৃষ্ণভক্তি বশতঃ এই দুরূহ কার্য অতি সহজেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।...লেলিনগ্রাদ প্রাচ্যবিদ্যাভবনের প্রাচীন পুঁথিশালায় যে পুঁথিখানা সংরক্ষিত আছে, তাহা কি ভাবে কখন বাঙলাদেশ হইতে সেই সুদূর দেশে গিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় না।"

ভাগবতাচার্যের অপ্রকটের পর তার নির্দেশানুযায়ী যে প্রাঙ্গনে মহাপ্রভু একদিন কীর্তন করেছিলেন সেখানে তাঁকে বৈষ্ণব রীতিতে সমাধিস্ত করা হয়। কালক্রমে সেই কুঠির নিঃশ্চিহ্ন ও স্থানটি বোম্বেটে পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে জঙ্গলে আবৃত হয়ে যায়। তার শতবর্ষ পরে কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী নামক জনৈক ভক্ত বাবা তারকনাথ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই স্থানটি পুনরুদ্ধার করেন এবং তাঁর সমাধি স্থানে একটি স্মৃতি মন্দির ও নিতাই-গৌরের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩৩৪ সালে নামসাধক শ্রীমদ রামদাস বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণবতীর্থ পাঠবাড়ীর পরিচালনভার গ্রহণ করেন ফলে পাঠবাড়ী আজ বাংলার গৌরব।

রামদাস বাবাজী মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় ভাগবতাচার্যের পাঠবাড়ীতে 'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির' প্রতিষ্ঠা (২২ চৈত্র ১৩৪১) বৈষ্ণব জগতের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই গ্রন্থ মন্দিরে বহরমপুরের গোপেন্দ্রভূষণ মৈত্রের সংগৃহীত দেড় হাজার পুঁথি এবং পানিহাটির অমূল্যধন রায়ভট্টের সংগৃহীত দু'হাজার পুঁথি দ্বারা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত অসংখ্য প্রত্নদ্রব্য মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে। অসংখ্য ভক্ত ও সেবকের দানে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান আজ বাঙলার গৌরবের বস্তু। পুরীর বঙ্কিমচন্দ্র দাস জমির জন্য এবং পোস্তার

রাণী তার স্বামী স্বর্গত হরিপ্রসাদ রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এই মন্দির ও প্রত্নশালা নির্মাণ করে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। এ ছাড়া বংশীধর রায়ের স্ত্রী স্বামীর স্মৃতি রক্ষা কল্পে নিতাই-গৌরের নূতন মন্দির ১৩৩৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নন্দলাল শেঠের স্ত্রী ও স্বামীর আত্মার তৃপ্তির জন্য ১৩৩৯ সালে নাটমন্দির ও ভাগবতাচার্যের পাঠ মন্দির তৈরী করে দিয়ে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এখানে অখণ্ড হরিনাম ও পাঠ চলছে এবং বাবাজী মহাশয়ের নির্দেশে তা যুগ যুগ ধরে চলবে। মহাপ্রভুর কৃপায় এবং শ্রীল ভাগবতাচার্য ও রামদাস বাবাজীর ইচ্ছায় পাঠবাড়ীর আজ যে ক্রমোন্নতি ঘটেছে তা অক্ষয় হোক। এটি কলকাতার একটি দর্শনীয় দেবস্থান।

সত্যনারায়ণ

আমাদের দেশে প্রাচীনতম পূজা লক্ষ্মী পূজার মত অষ্টাদশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয়ে উদ্ভূত সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ পূজা বাঙলাদেশে এখন খুব প্রসার লাভ করেছে। যে সময় পীর, গাজী, ফকির প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকদের দিয়ে বঙ্গদেশে ইসলামের সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযান চালানো হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে হিন্দুদের দেবতাদের মত পীরের মাহাত্ম্য কাহিনী জনসমাজে প্রচার করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের প্রলুব্ধ করে ধর্মপ্রচার কল্পে ইসলাম ধর্মে তাদের দীক্ষা দেন। ধর্মান্তর ছাড়া পীর গাজীদের বিজয় অভিযানে বহু যুগসমৃদ্ধ নগর ধ্বংস ও হিন্দু মন্দির ধূলিস্যাত করে সেখানে সেই সব উপকরণে নির্মিত হয় মসজিদ না হয় পীর-গাজীদের সমাধি। সপ্তগ্রামের মসজিদ, ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজীর দরগা ও পাণ্ডুয়ার মিনার এই সব অভিযানের চাক্ষুস নিদর্শন।

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় "সর্বাপেক্ষা প্রাচীন

হর্ম্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় হুগলী জিলার অন্তঃপাতী ত্রিবেণী ও ছোট পাণ্ডুয়া গ্রামে। ত্রিবেণীতে জাফর খান গাজির সমাধিভবন ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই বিভিন্ন অংশ ও খোদিত কারুকার্য জোড়াতাড়া দিয়া নির্মিত হইয়াছিল। ত্রিবেণীতে একটি বিশাল মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাও জাফর খানের নির্মিত ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা দৈর্ঘে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রস্থে ৩৫ ফুট। ইহাতে খিলান যুক্ত পাঁচটি দরজা ও ছাদে পাঁচটি গম্বুজ ছিল। এ গুলির ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দুমন্দিরের কারুকার্যখোদিত ও মূর্তিযুক্ত বহুসংখ্যক ফলক পাওয়া গিয়াছে। ছোট পাণ্ডুয়াতে একটি মসজিদ ও একটি মিনার আছে।" (বাংলা দেশের ইতিহাস ২য় খণ্ড, মধ্যযুগ)।

পীর-এর আভিধানিক অর্থ—মুসলমানদের মধ্যে ঈশ্বরজনিত পুরুষ বা এক কথায় মহাপুরুষ। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডী কাব্যে তাই "পীরের মোকামে দেয় সাঁড়া" বলে উল্লেখ করেছেন। নারায়ণের অর্থ হচ্ছে—নার (জল)+অয়ন (আশ্রয়) যার! অর্থাৎ যিনি নরনারীর আশ্রয়—বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। প্রাচীন কবি গিরিধর প্রণীত গীতগোবিন্দে আছে: রাধা এক তিল ভজ মোরে! আমি নারায়ণ শরণ লইনু তোর॥ (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান, পৃঃ ১১৮৬)।

মুসলমান শাসনে পীর-গাজী ফকিরেরা ভয়ে বা ভক্তিতে হিন্দু সমাজে বরেণ্য হয়েছিলেন। নামাজের পর পাত্রের জল মন্ত্র বা ফুঁ দিয়ে 'জলপড়া' স্পর্শে সে সময় অনেকে ব্যাধিমুক্ত হয়েছিল বলে তাঁরা সঠিক হিসাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করেন। রমেশচন্দ্রের উদ্ধৃতিতে ছোট্ পাণ্ডুয়ার নাম আছে। সেই পাণ্ডুয়া থানার অসংখ্য গ্রাম পরিক্রমার সময় দেখি শতাধিক পীরস্থানে (দ্রষ্টব্য 'হুগলী জেলার দেব দেউল', পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭) এখনও রোজ প্রদীপ সব পীরস্থানে জ্বালান হয়। এ ছাড়া ১লা মাঘ থেকে এক মাস ব্যাপী পাণ্ডুয়ার মাঘ মেলা বাঙলার অন্যতম উভয় সম্প্রদায়ের সুপ্রাচীন উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে মুসলমানদের পীর আবির্ভূত হন আমাদের নারায়ণ তথা সত্য-নারায়ণ রূপে।

ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে বাংলাদেশে সত্য-নারায়ণ ও সত্যপীরের মধ্যে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয় অষ্টাদশ শতকে। তিনি লিখেছেন পীরের কথা ও পীরের ব্রত কথা রীতিমত-রচনা সুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দে।...তাহার পর শতাব্দের শেষ দুই দশক হইতে পীর নারায়ণের একাত্ম মূর্তি যাহা কৃষ্ণরাম

দেখাইয়াছিলেন—ইহা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে সত্যনারায়ণ অথবা সত্যপীর রূপে আবির্ভূত হইল। (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড।

মুসলমানদের সত্যপীর হচ্ছে হিন্দুসংস্করণ রূপে সত্যনারায়ণ। এ থেকেই উদ্ভব হয়েছে 'সত্যনারায়ণের পাঁচালি'। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর দেবানন্দপুরে দত্ত বাড়ীতে বসে পনেরো বছর বয়সে ত্রিপদী ছন্দে তাঁর প্রথম কাব্য সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখে প্রশংসা অর্জন করেন। এ ছাড়া ভৈরবচন্দ্র ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, ফকিররাম দাস, তারিফ, মহীউদ্দীন, ফয়জুল্লা প্রমুখ কবির সত্যনারায়ণের পাঁচালি পাওয়া গেছে। ষোড়শ শতকে রূপরাম চক্রবর্তী, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক তখন মধুর হয়েছিল বলে তাঁর ধর্মমঙ্গল রচনার প্রারম্ভে তিনি হিন্দু দেব-দেবীর সঙ্গে পীর-গাজীদেরও বন্দনা করেছেন :

মান্দারণ গড়ে বন্দি পীর ইসমাইলি।
পীর ইসমাইলি সঙরিয়া পথ চলি যায়।
মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায়।
বন্দির বড়খাঁ গাজী রিসিবাটী গাঁ।
নিজবাটী বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ॥

হিন্দুরাও মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য পীরস্থানে প্রদীপ দেন।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য বাঙলা দেশে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সমন্বয় হচ্ছে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পূজা যা আগে ছিল অসাম্প্রদায়িক। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন পীর গাজীদের আশীর্বাদ লাভের জন্য চাঁদা তুলে মুসলমানেরা তাঁদের মসজিদে ও হিন্দুরা তাদের নিজের বাড়িতে পাঁচালী পাঠ করে 'সিরনি' বিতরণ করতেন। কালক্রমে পীর পরিণত হয় সত্যনারায়ণে। অর্থাৎ তিনি প্রাচীন কালের মত কারণবারিতে ভাসতে ভাসতে বর্তমানে এসে এখন কলিযুগে হিন্দুদের উদ্ধারের জন্য পীরেদের কল্যাণে আবার উপস্থিত হলেন। ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন :

"Originally it was a non communal affair. Later on the noble idea behind this common worship was lost, when the Muslims in their own congregation offered worship in the name of Pir in their mosques, and the Hindus, though begging in the name of pir, performed

Brahmanical Puja in which Pir became translated into Satyanarayan". (Islam and Its Impact in India, p. 152)

ষোড়শ শতকে রামাই পণ্ডিত ধর্মমঙ্গলে বলেছেন :

ধর্ম হইলা যবনরূপী মাথায় এত কাল টুপি
হাতে শোভা তিরুচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।

কথিত আছে যে, রাজা গণেশের কন্যা উত্তরবঙ্গে সর্বপ্রথম সত্যনারায়ণের পূজা করেন। সত্যনারায়ণ হচ্ছেন বিষ্ণু বা নারায়ণের অন্য এক মূর্তি। বিষ্ণুর মত রূপকল্পনায় তিনিও হচ্ছেন পীতাম্বর, নীলবর্ণ, কৌস্তুভমণি শোভিত—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী শ্রীহরি। হিন্দু-ধর্মে অনুপ্রবেশের পর সত্যপীর সত্যনারায়ণ রূপে পরিগণিত হলেও হিন্দু দেবদেবীর মত ওঁর পূজায় নৈবেদ্যের কোন ব্যবস্থা নেই। মুসলমানদের মতন সুরু থেকেই সিরনি দেওয়ার প্রথা চলে আসছে। এ সিরনি হচ্ছে—ঘি, কলা, ময়দা, চিনি (বা গুড), কিসমিস বাদাম প্রভৃতি দুধে একসঙ্গে মিশিয়ে একটি বৃহৎ পাত্রে রাখা হয় এবং পাঁচালী পাঠের উপর উক্ত খাদ্যদ্রব্য ভাল করে একত্রে মিশিয়ে সিরনি বলে সকলকে দেওয়া হয়। এ পূজা হয় রাত্রিকালে। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে ২৩৪ অধ্যায়ে সত্যনারায়ণের ব্রত ও তাঁর মাহাত্ম্যের কথা বুঝি লেখা আছে বলেছেন আমায় এক পণ্ডিত। কিন্তু আমি তা খুঁজে কোথাও পাইনি।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মুসলমান পীর-গাজীর সঙ্গে কলির দেবতা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা ও তুলসীরও বন্দনা করেছেন তাঁর চণ্ডীকাব্যে। যথা :

পাজোয়ায় বন্দিয়া যাবো শুভ খাঁ পীরে।
জাফর খাঁ গাজিরে বন্দো ত্রিবেণীর ধারে॥
গঙ্গা তুলসী বন্দো কলির দেবতা।
যাহার গুণ গাহে ভাই ভগবত কথা॥

সত্য-নারায়ণ ও সত্য-পীর এই মিশ্র দেবপরিকল্পনায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস একদা একসূত্রে মিলিত হয়েছিল, যদিও স্মৃতিশাস্ত্র বহির্ভূত সত্য-নারায়ণকে দেশের অগণিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বহির্মুখতা বশতঃ তা গ্রহণ করেছিল। অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ডে লিখেছেন :

"কোন কোন সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে বিশুদ্ধ রূপকথা ধরণের গল্পও পাওয়া যায়। ইহাতে ব্রতকথার অংশ অল্প। আরব্য রজনীর গল্পের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যই অধিক। দুই একজন মুসলমান কবি সত্যপীরের কাহিনী বলিতে বসিয়া ধর্মসম্প্রদায়গত মানসিক ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। সেখ্ ফয়জুল্লা সত্যপীরের বন্দনায় হিন্দুর দেব-দেবী এবং চৈতন্যদেবের বন্দনা করিয়াছেন, কোথাও বা তিনি আল্লাহ ও ব্রহ্মা বিষ্ণুকে এক করিয়া বলিয়াছেন, কোন কোন হিন্দু কবি সত্যপীরের কাহিনী লিখিতে বসিয়া মুসলমানি কাহিনী মুসলমানি ঢঙেই লিখতেন।" (পৃঃ ১১৯) হিন্দু ও মুসলমানদের মানসিক ঔদার্যের একটি ঘটনা হুগলী জেলার গ্রাম পরিক্রমার সময় এই লেখক গোঘাট থানার অন্তর্গত দামোদরপুরে কোন মুসলমান এখন সেই গ্রামে বসবাস না করলেও চাঁদা তুলে হিন্দুরা চাঁদশাহ ফকিরের নামে দুশো বছর ধরে বৈশাখী পূর্ণিমায় যে পীরের মেলা দামোদরপুরে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠান করছেন তা দেখছেন।

সত্যনারায়ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাঁচালীতে আছে :

নারায়ণ দেখা দিলা ধরি পীর বেশ।
নূতন পূজার রীতি দিলা উপদেশ॥
জয় সত্যনারায়ণ সত্যরূপী হরি।
তোমার কৃপায় যেন ভবসিন্ধু তরি॥
জয় জয় সত্যপীর সত্যনারায়ণ।
চরণ-রেণুতে পূত কর তনু-মন॥

অসিতবাবু আরও বলেছেন যে, মুসলমান শাসনের চণ্ডযুগে হিন্দুগন ভয়ে ভক্তিতে মুসলমান পীর-ফকির মুর্শিদের দরজায় যাতায়াত করিত। উপরন্তু সুফী মতবাদ বাঙালী হিন্দুর কাছে নিতান্ত বিধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় নাই। পীর-ফকিরের কেরামতের প্রতি অশিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণের বিস্ময়মুগ্ধ আকর্ষণ ছিল। ফলে ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজ সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে এক মিশ্র দেবতার পরিকল্পনা রাঢ়ভূমিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

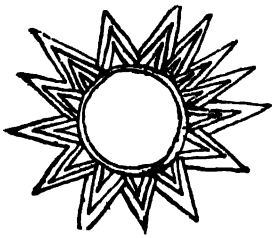

ধর্ম-সমাজ-মন্ত্র

ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে সুদূর অতীতকাল থেকে প্রবহমান আছে দুটি ধারা। একটির নাম বৈদিক আর একটির নাম তান্ত্রিক। বৈদিক-ধারার ভিত্তি বেদ ও তান্ত্রিকধারার ভিত্তি তন্ত্রগ্রন্থ। উভয়ই নিখিল জ্ঞানসত্তার ও আপৌরুষের। বেদকে বলা হয় নিগম ও তন্ত্রকে বলা হয় আগম। যা থেকে পৃথিবীর সকল জ্ঞান নির্গত হয়েছে, তারই নাম হচ্ছে নিগম বা আগম। মানে দুটিরই এক। যার কখনও পরিবর্তন হয় না, তাই বেদান্তের আলোচ্য আর যা পরিবর্তনশীল তা তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচ্য। জগতের সব জিনিস পরিবর্তনশীল বলে এ সবই হচ্ছে তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মানুষের কাছে যা অশ্লীল একজন তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে তা অমূল্য বস্তু বলে পরিগণিত হয়।

শক্তি উপাসনা বাঙলা দেশের সুপ্রাচীন একটি বিশেষ সম্পদ। প্রাচীনকালে চেতনার মূর্তবিগ্রহস্বরূপিনী শক্তিকে জানবার জন্য আত্মস্থ হয়ে মহাশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নির্জনে সাধক করতেন সাধনা। কারণ শক্তির সঙ্গে যুক্ত না হলে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী কখনও হওয়া যায় না, এই ছিল তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কালক্রমে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা-রাজ্যে প্রবহমান প্রাচীন ধারা সব শুষ্ক হয়ে যখন বিপথে সেগুলি ধাবিত হলো, তখন নানারকম কাল্পনিক ছলধর্ম, উপধর্ম ও কাপট্যের আবরণে আবৃত হয়েছিল আমাদের দেশের সব ধর্ম। তখনকার ধর্মের অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবতে" পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
সকল সংসার মত্ত সংসার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥

বাশুলী পূজায় কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থা তখন ছিল খুবই শোচনীয়। এককথায় বাঙলা-দেশ ছিল তখন অরাজকতার রঙ্গভূমি। পঞ্চদশ শতকে কাপট্য, ষড়যন্ত্র, ব্যাভিচার, নরহত্যা, ধর্মবিদ্বেষ এই ছিল যখন বাঙলার অবস্থা, তখন ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ নানাপ্রকার বিদ্রোহ, নরহত্যা ও তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে বাঙলা দেশ শাসন করতেন। সেই সময়ে নবদ্বীপ কিন্তু ছিল বিদ্যা ও সাহিত্য সাধনার অন্যতম পীঠস্থান। তখন সেখানে, সেই দুর্যোগের দিনে আবির্ভূত হলেন দুজন মহাপণ্ডিত একজন যুগাচার্য শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) আর একজন তাঁরই সহাধ্যায়ী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। সেই সময় বাঙলার সুলতান ছিলেন ফিরোজ শাহ।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আগে ও তাঁর সমসাময়িক যুগে আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড যে বর্ণাশ্রম ধর্ম তা, কি রকম বিকৃত হয়েছিল, তার প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের ধর্মাচরণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে। তখন মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চ-মকার ছিল ধর্ম সাধনার একমাত্র অঙ্গ। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে যা লিখেছেন, তার কয়েক লাইন মাত্র এখানে উদ্ধৃত হলো:

"তন্ত্রের মধ্যে লতা সাধনাদি অধিকতর লজ্জাকর ও ঘৃণাকর যে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা আছে, পাঠকগণের সামনে তাহা উপস্থিত করা কোন রূপেই শোভা পায় না। যাঁহাদের জানিতে ইচ্ছা হয় কুলার্ণব, গুপ্তসাধনতত্ত্ব, নিরুত্তরতন্ত্র, শ্যামারহস্য, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি দেখিলেই জানিতে পারিবেন। সত্যসাধনে একটি স্ত্রীলোককে ভগবতী জ্ঞান করিয়া মদ্যপানাদি সহকারে তাহার সাধন করিতে হয়। উহাতে তাহার শরীরের গুহ্যগুহ্য নানাস্থান মন্ত্র-জপ এবং আপনার ও তাহার অঙ্গবিশেষের পূজা বন্দনাদী পুরঃসর স্ত্রী-পুরুষঘটিত-ব্যাপারানুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তন্ত্র বিহিত সুরাপান ও পরস্ত্রী গমন প্রভৃতির ন্যায় মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি নরহত্যা ও পরপীড়াও শাস্ত্রীয় ক্রীয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।"

শ্রীচৈতন্যদেব সর্বপ্রথম ধর্মের নামে যে সমস্ত ব্যাভিচার বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল, তিনি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং কলিকালে 'হরিনাম' করাই যে একমাত্র ধর্ম তা সর্বত্র তিনি প্রচার করেন। "কালৌ নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা"

—কলিতে নাম ছাড়া আর গতি নেই, এই ছিল তাঁর একমাত্র বাণী। তিনি বর্ণাভিমান অপেক্ষা ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করতেন বলে দেশের লোকের কাছে তিনি কম অত্যাচারিত হন নি। "ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুল নাহি মানে" এই ছিল তাঁর বিচার। তাই বিদেশীরা পর্যন্ত আজ তাঁকে অনুসরণ করছে।

আমাদের দেশে দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা তৈরী করে পূজা তখনও শাক্তগণ আরম্ভ করেন নি। আচারে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য নবদ্বীপে পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ঘোর তান্ত্রিক হয়ে ওঠেন। তখন নবদ্বীপে তন্ত্রের আলোচনা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল! কিন্তু তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে যে সব ব্যাভিচার ও নিষ্ঠুরতায় মগ্ন থাকতো, তিনি "তন্ত্রসার" নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করে দেবদেবীর উপাসনা ও পূজা পদ্ধতি কিভাবে করতে হবে তা দেখিয়ে দেন। কার্তিকী অমাবস্যায় যে শ্যামা পূজা এখন সর্বত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তিনিই প্রতিমা নির্মাণ করে প্রতি অমাবস্যায় সর্বপ্রথম সেই পূজার অনুষ্ঠান করেন। এখনও নবদ্বীপে তাঁর বাড়ীতে যে কালীপূজা হয় তা "আগমেশ্বরী কালী" বলে পরিচিত। দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি পরে তাহেরপুর ও কৃষ্ণনগরের রাজাদের দ্বারা বঙ্গদেশে যথাক্রমে প্রচলিত হয়।

কৃষ্ণানন্দ প্রথমে ঘটস্থাপন করে অন্যান্য তান্ত্রিকদের মত কালীপূজা করতেন। তাঁর বাড়ীতে উক্ত ঘটটি এখনও পূজিত হয়। আবহমান কাল থেকে আমাদের দেশে ঘটেই পূজা হতো। এবং সে পূজা হতো বিশুদ্ধ মন্ত্রে সাত্ত্বিক বিধানে। শাস্ত্র মতে দেবদেবীর পূজা নিম্নতম রূপ হলেও, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "যারা যে ভাবে আমায় উপাসনা করে, আমি সেই ভাবেই তাদের বাসনা পূর্ণ করি।" পূজায় যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাতে দেবদেবীর স্তুতি ও বন্দনা এবং পূজকের কল্যাণ প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ কালী পূজার যে উপাসনা ও পদ্ধতি প্রচলন করেন, তার মধ্যে দেবীর বন্দনা ছাড়া তাতে আছে দেশমুক্তির জন্য বীর ও প্রজ্ঞাবান সন্ততিলাভের আকুল প্রার্থনা! কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কালীপ্রতিমা নির্মাণ সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন:

Agam Vageshu, a learned Hindoo, about five hundred years ago, formed the image of Kalee according to the preceeding description and worshipped it monthly, choosing

for this purpose the darkest nights in the month he made and set up the image, worshipped it, and destroyed it, on the same night. (The Hindoo, Vol. II By W. Ward, 1815)

কালীর যে প্রতিমা আগমবাগীশ শাস্ত্রমতে নির্মাণ করেছিলেন, তার রূপ বর্ণনা কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর খুব সুন্দরভাবে তাঁর দশমহাবিদ্যা বর্ণনায় দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা এইরূপ :

মুক্তকেশী মহামেঘ বরণা দন্তুরা।
শবারুঢ়া করকাঞ্চী শব কর্ণপুরা॥
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে॥
আর বামকর যুগে কৃপান খরশান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান॥
লোল জিহ্বা রক্ত ধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥

কালীর কাছে পূজক, যজমান ও পরিবারের সকলে যে বন্দনা ও প্রার্থনা করেন, কয়েকটি মাত্র তা নিম্নে দেওয়া হলো।

ওঁ ভবেশি জন্মভূর্মির্মে স্বর্গাদপি গরিয়সী।
পাশবদ্ধা হ্যধীনৈষা মুক্তপাশাং কুরুষ্বতাম॥

হে ভবেশি স্বর্গ হতে গরীয়সী আমার জন্মভূমি অধীনতা পাশে আবদ্ধা তুমি তাকে বন্ধনমুক্ত করো।

দেহি দেবি বলং দেহে বিজ্ঞান কুতোভয়ং।
মাতরং যেন মুঞ্চেয়ং জগৎকৃৎস্নাং পয়োধরাম॥

হে দেবী, আমার দেহে বলদান কর! আমাকে বিজ্ঞান ও ভয়শূন্যতা দাও, যাতে আমি মাকে মুক্ত করতে পারি যিনি জগতের সাফল্যকারিণী ও প্রভূত পয়োধারিণী।

এই বন্দনার মধ্যে দেশমুক্তির জন্যে বীর ও প্রজ্ঞাবান সন্তান লাভের প্রার্থনা এবং বল, বিজ্ঞান, নির্ভীকতা, সঙ্ঘশক্তি, দেশাত্মবোধ যোগক্ষেম লাভের প্রার্থনা দেবীর কাছে করে, শেষে "ওঁ ভগবতৈ শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ" বলে পূজার মন্ত্র শেষ হয়েছে। যদি কেউ সমস্ত মন্ত্রগুলি পড়তে চান, তিনি পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র

বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক সম্পাদিত 'সরলক্রিয়া কৌমুদি' দেখতে পারেন।

আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই সমস্ত দেবী পূজার মধ্য দিয়ে যে সম্পদ, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধি উত্তরপুরুষের জন্য রেখে গেছেন, তাই আমাদের জীবনপথের প্রতিদিনের পাথেয়। পূজার মন্ত্রগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আমরা লীলাকে প্রত্যক্ষ করতে পারব এবং বুঝতে পারব যে, দেবী হলেন আমাদের অতীত বর্তমানের আধার—তাঁর প্রতিমার মধ্যেই যেমন নিহিত আছে আমাদের সংস্কৃতি, ঐশ্বর্য ও গৌরবগাথার কাহিনী, তেমনি তাঁর মধ্যে নিহিত আছে আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সাধনা এবং তাঁর করুণা ছাড়া ভাবীকালের অগ্রগতি অন্ধকারময়। "মাতৃরূপা তুমি দেবী সর্বভূতে রও—তোমায় প্রণাম মাতঃ প্রণাম মা লও।"

পৃথিবীতে যত শক্তি আছে, তার মধ্যে মাতৃশক্তি জগজ্জননীর শক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে শক্তিপূজার প্রচলনই আমাদের দেশে সর্বাধিক। স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিপূজা সম্বন্ধে যা বলেছেন তার কয়েক লাইন এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :

শাক্তেরা জগতেই সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা ব'লে পূজা ক'রে থাকেন —কারণ মা-নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই নারী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা 'দক্ষিণাচার' বা 'দক্ষিণমার্গ' বলেন। ঐ উপাসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি হয়—এর দ্বারা কখনও ঐহিক উন্নতি হয় না। আর তাঁর ভীষণ রূপের রুদ্রমূর্তির উপাসনাকে 'বামাচার' বা 'বামমার্গ' বলে। সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে ঐ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর যারা ঐ সাধন করে, সেই জাতি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশ-স্বরূপ, আর জনকের ধারণা থেকে জননীর ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে। মা-নাম করলেই শক্তির ভাব সর্বশক্তিমত্তা—ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে। শিশু যেমন নিজের মাকে সর্বশক্তিময়ী ম'নে করে, ভাবে—মা সব করতে পারে। সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাঁকে উপাসনা না ক'রে আমরা কখন নিজেদের জানতে পারি না।

সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া—সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তাঁর সমষ্টিরূপিণী। জগতে

যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই মা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি একজন ব্যক্তি—তাঁকে জানা যেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে (যেমন রামকৃষ্ণ তাঁকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন)। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি। তিনি অতি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন।

তিনি যখন ইচ্ছা—যে কোনরূপে আমাদের দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম ও রূপ দুই-ই থাকতে পারে, অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাকতে পারে। তাঁকে এই-সকল বিভিন্নভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নাম কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসত্তামাত্র বিরাজিত।

যেমন কোন শরীর বিশেষের সমুদয় কোষগুলি (cells) মিলে একটি মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা যেন এক একটি কোষস্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর—আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ত্ব (ব্রহ্ম) তারও অতীত। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় 'ব্রহ্ম', আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে তাকেই আমরা 'শক্তি' বা 'মা' বলি, সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকাল-নিমিত্ত-স্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ—একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নির্গুণ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ; দ্বিতীয়রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিত্বভাব এসেছে। সমস্ত সত্তা—যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক অস্তিত্ব; এটিই বিশিষ্টাদ্বৈতভাব।

সেই জগদম্বার এক কণা—এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ত্ব লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর। [বাণী ও রচনা ৪র্থ খণ্ড]

তখন—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দু-পদবাচ্য, যখন ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে মহাবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে, তখন—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হইবে, যখন যে-কোন দেশীয়, যে-কোন ভাষাভাষী ব্যক্তি হিন্দুনামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বলিয়া বোধ হইবে, তখন কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন হিন্দুনামধারী যে-কোন ব্যক্তির

দুঃখ কষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে, তখন—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন তুমি তাহাদের সর্বপ্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ তোমাদের সেই মহান্ গুরুগোবিন্দ সিংহের বিষয় আমি এই বক্তৃতার আরম্ভেই বলিয়াছি।

এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য নিজ শোণিতপাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে দেখিলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য নিজের এবং আত্মীয় স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাক, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এমন-কি দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, অবশেষে এই আহত কেশরী নিজ কার্যক্ষেত্র হইতে ধীর ভাবে দক্ষিণ দেশে গিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপ বাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। [বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড]

দুর্গা দশ দিকে নব নব রূপে

॥ এক ॥

মাতৃরূপা তুমি দেবী সর্বভূতে রও।
মোদের প্রণাম মাতঃ প্রণাম মা লও।

সেই কবে সভ্যতার কোন উষাকালে পৃথিবী ধরা দিয়েছে জননীরূপে। তাঁরই মধ্যে মিলেছে সেই মহাশক্তির ইঙ্গিত। সামাজিক কাঠামোয় মাতৃতান্ত্রিক বিন্যাসের প্রভাব বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি কল্পনায় আরোপিত হয়েছে মাতৃসত্ত্বা—সেই মা হচ্ছেন দেবী দুর্গা—দুর্গতিনাশিনী, সুখে শুচিস্মিতা, রক্ষাকর্ত্রী, আবার ইনিই শত্রুহন্তা মা রণরঙ্গিণীরূপে আবির্ভূতা হন দশদিকে দশরূপে।

রাজর্ষি প্রজাপতি দক্ষ, লোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র। মনুকন্যা প্রসূতি দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি,

তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মূর্তি, তিতিক্ষা, হ্রী, স্বাহা, স্বধা ও সতী এই ষোলটি কন্যা জন্মে, রাজর্ষি দক্ষ অত্যন্ত দুহৃতিবৎসল এবং প্রাণাপেক্ষা তিনি কন্যাদের ভালবাসতেন। তাঁর ষোলটি কন্যার মধ্যে তিনি তেরটি কন্যা ধর্মকে, একটি কন্যা অগ্নিকে ও একটি কন্যা পিতৃগণকে প্রদান করেন। কনিষ্ঠা সতী দক্ষের সর্বাপেক্ষা আদরিণী কন্যা, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে বিবাহ করেন। মহাদেবের সঙ্গে সতীর এই বিবাহ কিন্তু দক্ষের বিশেষ মনঃপুত হয় নি। কারণ শিবের নির্বিকার স্বভাব, তাঁর অদ্ভুত বেশভূষা,* তাঁর আচার-ব্যবহার তাঁর সঙ্গী সহচর এবং বিশেষ করে তিনি কপালী ও তাঁর বয়সও রাজ-জামাতার ঠিক উপযোগী নয় বলে, রাজর্ষি দক্ষের মনে বোধহয় একটু ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল।

সুদূর অতীতে সেই সত্যযুগের কোন সময়ে বিশ্বস্রষ্টাগণ একটা খুব বড় রকমের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞ—সে এক বিরাট ব্যাপার। সে রকম মহাযজ্ঞ এর আগে কখনও হয় নি। এই যজ্ঞে সকল দেবগণ, ঋষিগণ ও রাজর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থল পরিপূর্ণ—এমন সময় এলেন রাজর্ষি দক্ষ প্রজাপতি। তিনি যজ্ঞস্থলে আসা মাত্রই সভাস্থ সমবেত দেবতাগণ, মুনি-ঋষিগণ সকলেই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদন করলেন এবং যজ্ঞে আসার জন্য যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনাও জানালেন। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন জন তাঁদের নিজেদের আসনেই বসে রইলেন, দাঁড়ান দূরের কথা. তাঁরা রাজর্ষিকে কোনরকম সম্মান পর্যন্ত দেখালেন না।

দক্ষ ভাবলেন ব্রহ্মা আমার পিতৃদেব আর বিষ্ণু হচ্ছেন এই ত্রিজগতের পালনকর্তা। এঁরা দুজনে না দাঁড়িয়ে ঠিকই করেছেন; কিন্তু শিব সে আমার জামাতা—পুত্রস্থানীয়। সে শ্বশুরকে দেখে যথোচিত সম্মান করবে না? শিবের আচরণে দক্ষ নিজেকে খুব অসম্মানিত মনে করলেন এবং রাগে উন্মত্তপ্রায় হয়ে তিনি সভার মধ্যেই সকলের সামনে শিবের আচরণ সম্বন্ধে তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। সদাহাস্যময় দেবাদিদেব মহাদেব এতে একটুও রুষ্ট হলেন না। তিনি নির্বিকার চিত্তে সভার মধ্যে যেমন বসে ছিলেন তেমনি রসে রইলেন।

---

* শিবের বেশভূষা সম্পর্কে 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী'তে আছে:

"জটাযুক্ত, ব্যঘ্রচর্ম পরিধান, বিভূতি বিভূষিত উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্ট এবং শরীরের ঊর্ধ্বভাগে রুদ্রাক্ষ মালায় শোভিত এই শ্রীমান পুরুষ আগমন করিতেছেন।"

এতে দক্ষের হীনক্রোধ আরো বহু গুণে বেড়ে গেল। তিনি কেবল শিবনিন্দা করেই ক্ষান্ত হলেন না। ক্রোধে জলস্পর্শ করে তিনি অভিশাপ দিলেন যে এই দেবাধম শিব ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে যেন কখনও কোন যজ্ঞভাগ না পায়। এই শাপ দিয়ে ক্রোধভরে যজ্ঞস্থান ত্যাগ করে দক্ষ নিজগৃহে ফিরে গেলেন।

এই অভিশাপের কথা গিরিশানুচর নন্দীশ্বর অবগত হয়ে তিনি খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং যাঁরা যজ্ঞস্থলে দক্ষের বাক্য অনুমোদন করেছিলেন তাঁদের সকলকে তিনি প্রতিশাপ দিলেন যে, মহাদেব কখনও কারও অপকার বা অনিষ্ট করেন নি, সুতরাং তাঁর প্রতি যাঁরা বিদ্বিষ্ট হবেন, তাঁদের কোন কাজ কখনও সিদ্ধি হবে না। এর পর থেকে শ্বশুর দক্ষ ও জামাতা শিবের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ চলতে লাগলো। কিছুকাল পরে দক্ষের পিতা পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম দক্ষকে আবার সকল প্রজাপতির আধিপত্য দিলেন। এতে দক্ষের অহঙ্কার আরও বেড়ে গেল।

সকল প্রজাপতির আধিপত্য লাভের পর রাজর্ষি দক্ষ বৃহস্পতিযজ্ঞ নামে উৎকৃষ্ট এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এই মহাযজ্ঞে ত্রিলোকের সকলের নিমন্ত্রণ হলো, বাকী রইলো শুধু শিব আর সতী—তাঁদের দুজনের খালি নিমন্ত্রণ হলো না। বাপের বাড়ি বৃহস্পতিযজ্ঞের কথা শুনে সতী বাপের বাড়ি যাবার জন্য খুবই ব্যাকুল হলেন, কিন্তু শিব তাঁকে যেতে নিষেধ করলেন, বললেন: বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও যাওয়া উচিৎ নয়। সতী বললেন: বাপের বাড়ি যাবো, তাতে আবার নিমন্ত্রণ কী? মহাদেব কিন্তু সতীকে বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষের যজ্ঞস্থলে যেতে কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। ত্রিকালজ্ঞ মহাদেব অবশ্যই জানতেন যে, সতীর পিতৃগৃহে যাওয়ার মধ্যে কি অমঙ্গল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহীত আছে, তাই তিনি বার বার সতীকে পতির নিমন্ত্রণ ছাড়া স্ত্রীর কোন আমন্ত্রণে যাওয়া উচিৎ নয় প্রভৃতি নানা রকম কথা বলে সতীকে ক্ষান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হলো না।

এ সম্বন্ধে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মহাভাগবত পুরাণের মতানুযায়ী দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবের যে সুন্দর পরিচয় তাঁর কাব্য 'অন্নদামঙ্গলে' দিয়েছেন। সংস্কৃত উদ্ধৃতির পরিবর্তে আমি ভারতচন্দ্রের সেই অনুপম বর্ণনা এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব ব্যহার করবো। যথা:

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাবো বাপার ভবন॥

শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুনি তার মর্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥

সতী বহু উপরোধ অনুরোধ ও যুক্তির অবতারণা করলেও শিবকে যখন তিনি কোন রকমেই সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারলেন না, তখন তিনি দুঃখিতা হয়ে অভিমানে বাপের বাড়ি যাবার জন্য শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন ও ক্রোধে হলেন অগ্নিমূর্তি। তারপর ভয়ানকভাবে তিনি অট্টহাস্য করতে লাগলেন। এইরকম অট্টহাসি শিব এর আগে কখনও দেখেন নি। সতীর এই অট্টহাসি ও ভীষণমূর্তি দেখে দেবাদিদের মহাদেব ভীত চকিত এবং শঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু পালাবেন কোন দিকে? মহাদেব যে দিকে পালাতে যান, সেই দিকেই এক এক অভিনব ভীষণা মূর্তি হয়ে দেবী তার ভয়োৎপাদন করেন। প্রথমে সতী কালীমূর্তি দেখিয়ে শিবের পথ অবরোধ করেন। তাতে তিনি ত্রস্থ ভীত হয়ে বিভ্রান্তের মত অন্যদিকে পালাতে উদ্যত হন। কিন্তু মহামায়া এক এক করে দশদিকেই দশরকম বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়ে শিবের যাবার সব পথ রোধ করেন। সতীর এই দশমূর্তি দশমহাবিদ্যা বলে কথিত হয়।

তাং দৃষ্টাহং মহাভীতং ধাবমানং দিশো ভয়াৎ।
পরিবার্থ দিশঃ সর্বা স্তবাহং দশধা স্থিতা॥

তখন শিব ভীত-চকিত-শঙ্কিত-স্তব্ধ ও বিমুগ্ধ। তিনি দিশেহারা হয়ে ভীতি-বিহ্বল সুরে বললেন: তোমরা কারা? আমার সতী কোথায় গেল? ভারতচন্দ্র লিখেছেন:

যত কন সতী শিব না দেন আদেশ॥
ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
দেখে ভয়ে পলাইতে যান পশুপতি।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দেন সতী॥

দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া **ভুবনেশ্বরী** সতী দেখা দিলা॥
দেখি ভয়ে মহাদেব গেল এক ভিতে।
ভৈরবী হইলা সতী লাগিলা হাসিতে॥
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত॥
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলালোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥
ধূমাবতী দেখি ভীত সভয় হইলা।
হইলা **বগলামুখী** সতী দেখা দিলা॥
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিয়া সতী **মাতঙ্গী** হইয়া॥
মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান।
মহালক্ষ্মী রূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান॥

শিবের কথায় এক মূর্তি উত্তর করলো: হে শম্ভো ভয় পেয়ো না— আমিই তোমার সতী। এই যে সব ভীষণা দশরূপ দেখছো, এ সব আমারই বিভিন্ন প্রকাশ। বিশ্বজননীর এই দশবিধ মূর্তির নাম দশমহাবিদ্যা। মূলতঃ এঁরা সকলেই এক এবং অভিন্ন; এঁদের বিন্দুমাত্র পৃথকবোধ করলে মহা-অপরাধ হয়।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা বিদ্যা ধূমবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতা॥

শিব বললেন: তুমি যদি আমার সতী, তাহলে তুমি এমন কৃষ্ণবর্ণা ও ভয়প্রদা কেন? সতী বললেন: আমিই সতী। তবে এখন ভৈরবী মূর্তি ধারণ করেছি। তোমার সামনে এই দেখ আমি রইছি কালী মূর্তিতে। তোমার উপরে এই যে আমিই আছি মহাকালস্বরূপিনী তারা রূপে। তোমার ডানদিকে আমি আছি ছিন্নমস্তকা ছিন্নমস্তারূপে। বামে আমি রয়েছি ভুবনেশ্বরী রূপে। তোমার পিছনে এই দেখ আমি আছি শত্রুনাশিনী বগলা রূপে। অগ্নিকোণে আছি বিধবারূপিনী ধূমাবতী রূপে। নৈঋতকোণে আছি ত্রিপুরা-

সুন্দরী কমলা রূপে। বায়ুকোণে আছি মাতঙ্গীরূপে। ঈশানকোণে আছি মহেশ্বরী ষোড়শী রূপে। আর তোমার সঙ্গে কথা বলছি এই আমি এখ ভীমা ভৈরবী রূপে। এর পর মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সতীকে দক্ষালা যাবার অনুমতি দিলেন মহাদেব নিরুপায় হয়ে।

পলাইতে না পেয়ে ফকির হৈল হর।
কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়।
কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়॥
কালীমূর্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে।
পূর্ব সর্ব জ্ঞান কেন পাসরিলা তবে॥
এই শুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার॥
লুকাইয়া দশমূর্তি সতী হৈলা সতী
তারা মূর্তি ছাড়ি হৈলা কালীর মুরতী॥
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥

সতীর সেই দশমূর্তির যে কোন একটিকে মাতৃসাধক তার সংস্কা অনুকূলে আপনার আরাধ্য ইষ্টজ্ঞানে পূজা করে দেবী কৃপা লাভ করে এঁদের নাম সাধারণতঃ বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত হলেও মূলতঃ এঁরা এ এই জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। এই প্র রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা, তারাক্ষ্যাপা, নিগমানন্দ, অন্নদাঠ প্রমুখ মাতৃসাধকগণের নাম স্মর্তব্য; শাক্তগণ দশমহাবিদ্যাকেই পরে দশাব রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন বলে তাঁদের মতে তারাদেবী মৎস্যাবতার, ব কূর্ম, ধূমাবতী বরাহ, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভুবনেশ্বরী বামন, মাতঙ্গী রাম, ত্রি সুন্দরী জামদগ্ন্য, ভৈরবী বলভদ্র, মহালক্ষ্মী বুদ্ধ, দুর্গা, কল্কি ও কালী কৃষ্ণ পরিগ্রহ করেন। এঁদের পূজা করলে সাধক মহাদেব সদৃশ হয়। "এত পূজনাদ্দেবী মহাদেবসামা ভবেৎ"।

সতী যে দশরকম রূপ ধরে শিবের সামনে আবির্ভূত হন, সেই

মূর্তির সঙ্গে কারও কোন মিল নেই। বিভিন্ন মূর্তির বর্ণ, আয়ুধ, আসন, কেশ, বেশ, ভূষণ, জিহ্বা, দেহ, নয়ন এবং তাঁদের প্রত্যেকের অবস্থান একেবারে সব পৃথক। সেই পার্থক্যগুলির বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

॥ দুই ॥

কালী

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকাল প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥

সর্ব প্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন যিনি, তিনি মহাকাল। সেই মহাকালকেও গ্রাস করেন যিনি তিনি কালিমা। মহাদেবী শুক্লা হলেও কলিতে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হন। ইনি সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী।

মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবরূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা॥
গলিতরুধির ধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশান।
দুই ভূজো দক্ষিণে অভয় বরদান॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র লালাটে বিলাসে॥

ইনি মহামেঘবরণা, শবরূঢ়া, চতুর্ভূজা (বামদিকের দুহাতে রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড ও উদ্যত খড়্গ এবং দক্ষিণ দিকের দুহাতে বর ও অভয় মুদ্রা) মুক্তবেণী, অস্থিবসনা, ত্রিনয়ণী, দিগম্বরী, লোলজিহ্বা, নৃত্যপরা, পীনোন্নত পয়োধার, কুটিলাননা, শ্মশানবাসিনী, মুকুলধারিণী ইত্যাদি।

কালী মহাকালের শক্তি-মূর্তি। যা কিছু ছিল, এখন আছে এবং পরেও থাকবে—সকলই মহাকালীতে চিরবিদ্যমান। অনন্ত অতীত, অনন্ত ভবিষ্যৎ, একটি নিত্য মূর্তির মধ্যে শাশ্বতভাবে বিরাজিত।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখেছেন: সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ একই মহাশক্তির পরস্পর-সাপেক্ষ বিবিধ প্রকাশ। বীজ ধ্বংসে বৃক্ষের জন্ম, বাল্যের ধ্বংসে যৌবনের উদয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতত্বের আস্বাদন। ভারতীয় ঋষিদের ইহা অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়। ধ্বংসের মধ্যে তাঁহারা অনুপমা

সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন অপার করুণা প্রত্যক্ষ্য করিয়াছেন।

সেই করুণাময়ী সৌন্দর্য্যময়ী ধ্বংসের মহাশক্তির বিগ্রহমূর্তিই কালিকা। কেবল ধ্বংসের নহে। বিশ্বের সৃজন, পালন, বিনাশকারী যাবতীয় শক্তি কালিকাতে বিরাজিত। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যতগুলি ভাব অভিব্যক্ত হয় মানুষের কাছে, শ্রীকালিকাতে সে সকলই বিরাজমান। মহাপ্রকৃতির পরিপূর্ণ চিত্র কালিকা। এই স্বরূপ ভক্তের ধ্যাননেত্রে দর্শনীয়।

তারা

নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্প বদ্ধ উর্দ্ধ একজটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গকান্তি সমুণ্ড খর্পর।
চারিহাতে শোভে আরোহন শিবপর॥

ইনি নীলবর্ণা, চতুর্ভূজা (বামদিকের দুহাতে কাঁতি ও খর্পর এবং দক্ষিণ দিকের দুহাতে নীলপদ্ম ও উদ্যত খড়্গ) একজটা, ত্রিনয়না, শিবোপরি আরূঢ়া ঊর্দ্ধাজ উন্মুক্ত এবং পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, খর্বদেহা, লোলজিহ্বা, লম্বোদরী, যৌবন সম্পন্না, সর্পভূষণভূষিতা। ইনি বাকশক্তি প্রদান করেন বলে এঁর নাম হচ্ছে নীল সরস্বতী। ইনি সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী। ইনি ভয়ঙ্করী কিন্তু বরদা। ইনি সকলকে তারণ করেন, এর জন্য এর নাম তারা।

ভারতচন্দ্রের কাব্যানুবাদ ছাড়া দশমহাবিদ্যার আর যে সব ধ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে তারার বর্ণনা নমুনা হিসাবে এখানে উদ্ধারযোগ্য:

খর্বদেহী লম্বোদরী ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃতা।
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা তারা রূপে জগন্মাতা॥
চতুর্ভূজা মুক্তবেণী সর্পভূষণ ভূষিতা।
শিবারূঢাং নমস্তভ্যাং তারারূপী জগন্মাতা॥
ঊর্দ্ধহস্তে খড়্গ কতি অধো পদ্মচ খর্পর।
ত্রিনয়নী জটাযুক্তা ভয়তীত চরাচর॥

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পিতার মৃতুর পর দারুণ অর্থকষ্টে পড়েন। তিনি দক্ষিনেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ করেন। ঠাকুর মা ভবতারিণীর কাছে নরেন্দ্রকে তাঁর

সাংসারিক অভাব দূর করার জন্য প্রার্থনা জানাতে বলেন। ঠাকুর সেই সময় তারার একটি গান গেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: কষ্টে পড়েছে তাই মার কাছে টাকাকড়ি চাইবার জন্য বলে দিয়াছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পারলো না—বললে লজ্জা করলো। মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে, টাকাকড়ি চাইনা, মার গান শিখিয়ে দাও। 'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে তারার যে গানটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দের সেই গানটি খুব প্রিয় ছিল এবং তিনি তারার গানটি প্রায়ই গাইতেন। গানটি হচ্ছে এই:

(আমার) মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধারা পরাৎপরা
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহারা।
তুমি জলে তুমি স্থলে
তুমিই আদ্যামূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে, অক্ষপুটে
সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি আকুলের ত্রাণকর্তী
সদাশিবের মনোহরা।

ষোড়শী

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারিহাতে শোভে পাশঙ্কুশ ধনুঃশর॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্রপঞ্চ
পঞ্চপ্রেত নিয়মিত বসিবার মঞ্চ॥

ইনি রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা (বাম দুই হাতে ধনু ও অঙ্কুশ এবং দক্ষিণ দুই হাতে শর ও পাশ) শিবের নাভিজাত পদ্মোপরি উপবিষ্টা, উন্মুক্ত কেশ, মুকুটধারিণী, সালঙ্করা, বস্ত্রপরিহিতা, স্মিতমুখী, যৌবনসম্পন্না, ভালে চন্দ্রশোভিতা. কুঙ্কুমের মত অরুণ বর্ণা। ইহার বদনে সর্বদা সংলগ্ন মধুরিমা

হাসি। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র ও সদাশিব এই পাঁচজন ষোডশী দেবীর পর্যাঙ্কের পাদরূপে অবস্থিত আছেন। ইনি রাজরাজেশ্বরী নামেও খ্যাতা।

ভুবনেশ্বরী

রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজা।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারিভুজা॥
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মনিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল॥

ইনি সিন্দূরের মত রক্তবর্ণা, চতুর্ভূজা (বাম দুই হাতে পাশ ও অভয় এবং দক্ষিণ দুইহাতে অঙ্কুশ ও বরমুদ্রা) রক্তপদ্মাসনা, বামপদ অম্বুজো স্থাপিত নানা অলঙ্কার শোভিতা, ত্রিনয়ণী, আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশ, মুকুটধারিণী। রূপভেদে দ্বিভূজা ভুবনেশ্বরী দেবীও দেখা যায়। "ভূবনা নাং পালিকা ত্বং" এর জন্য ভুবনেশ্বরী সার্থক নাম বলা যায়। অর্থাৎ ইনি সকল ভুবনকে পালন করেন তাই এঁর ভুবনেশ্বরী নাম হয়েছে। এবং সৃষ্টি ও স্থিতীকারিণী বলে 'ভূবনেশী' নামেও প্রখ্যাত।

ভৈরবী

রক্তবর্ণা চতুর্ভূজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণা॥
অক্ষমালা পুঁথি বরাভয় চারিকর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর॥

ইনি রক্তবর্ণা, জলের মধ্যে পদ্মাসনা, চতুর্ভূজা (বাম দুই হাতে পুঁথি ও অভয় এবং দক্ষিণ দুই হাতে জপমালা ও বরমুদ্রা) বস্ত্রপরিহিতা, নানা অলঙ্কার শোভিত, উদীয়মান সূর্যের মত দেবীর দেহকান্তি, অজানুলম্বিত দীর্ঘ কেশ, গলায় মুণ্ড মালা, স্মিতমুখী, মুকুটধারিণী, ও ললাটের উপর অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত। ইনি কালভৈরবের ভার্যা তাই ভৈরবী নামে বিখ্যাত। এই দেবী জীবের যমদুঃখ নাশ করেন। "ভৈরবী দুঃখসংহন্ত্রী যমদুঃখবিনাশিনী"।

ছিন্নমস্তা

বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাঝে।
তিনগুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে॥
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভূজা দিগম্বরী॥

নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠে হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক ধার নিজ মুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব-অরোহিনী॥
চন্দ্র সূর্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে সুশোভন॥

ইনি কোকনদবরণা, দ্বিভুজা, দিগম্বরী, নিজ দক্ষিণহস্তের খড়্গ দিয়ে নিজের মুণ্ড কেটে বাঁহাতে তা ধারণ করেছেন। কণ্ঠ থেকে দিনরাত তিনটি রক্তের ধারা উদ্গত হয়ে, এক ধারা নিজের হাতে অবস্থিত ছিন্নমুণ্ডে পড়ছে, আর দুটি ধারা দুপাশে দণ্ডায়মানা ডাকিনী বর্ণিনী নামে দুজন সখী সেই রক্তধারা পান করছেন।

দেবী বিপরিতভাবে রতিরতা কামদেবের উপর দণ্ডায়মানা, উন্মুক্ত কেশ, অস্থিমালা ধারিণী, ত্রিনয়নী, ষোড়শী, পীনোন্নত পয়োধরা, মহাঘোরা, রজ--সত্ত্ব-তমরেখা দিয়ে যোনিমণ্ডল শোভিতা এবং একটি সর্পকে যজ্ঞোপবীত রূপে ধারণ করেছেন। ইনি মহাভয়ঙ্করী, এঁর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত। ডাকিনী ও বর্ণিনী নামে দু'জন সখী সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী ও বিলম্বিত স্তনযুক্তা। এঁর মস্তক ছিন্ন বলে দেবী ছিন্নমস্তা বলে প্রসিদ্ধা। এই দেবী ত্রিশক্তিরূপিনী, এঁর মস্তক ছিন্ন, ইনি মোহিনী ও মোক্ষদায়িনী।

ছিন্নমস্তার উৎপত্তি 'নাবদপঞ্চরাত্রের' মতে—একদিন পার্বতী দেবী সহচরীদের সঙ্গে মন্দাকিনীতে স্নান করতে যান। নদীতে স্নান করে তিনি কামাতুর হলেন। তাই মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত স্নান করে, তিনি যখন উঠে এলেন তখন তাঁর সখীদ্বয় 'আমরা খুব ক্ষুধার্ত, আমাদের কিছু খেতে দিন' বলেছিলেন। দেবী তাঁদের 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর ভক্ষ দিচ্ছি' বলেন। ক্ষণকাল পরে খাবার কিছু না পেয়ে ডকিনী বর্ণিনী জয়া বিজয়া আবার বলেন: তুমি সকল জগতের মাতা, শিশু মায়ের কাছেই খাবার চায়, আর মাতা সকলকেই খেতে দেন, হে করুণাময়ী এই জন্য তোমার কাছে আমরা ভক্ষ প্রার্থনা করছি'। দেবী তাঁদের কথা শুনে 'বাড়ী গিয়ে খাবার দেবো' বললেন। কিন্তু সখীদ্বয় 'হে জগন্মাতা কৃপাময়ী! আমরা যেরূপ তৃপ্ত হই, আমাদের সেই

রকম খাবার দিন'। এই কথা বলায় দেবী একটু হেসে তাঁর বাম নখাগ্র দিয়ে কণ্ঠচ্ছেদ করে নিজ মুণ্ড বাম হাতে ধরলেন এবং তাঁর কণ্ঠ থেকে তখন রক্তের তিনটি ধারা নির্গত হলো। তিনি বাম ও দক্ষিণ দিকের রক্তধারা দুই সখী মুখে সংযোজিত করলেন এবং মধ্যধারা নিজের মুখে ধরলেন!

কণ্ঠাদ্বিনিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন।
বামদক্ষিণভেদেন যে ধারে ত বিনির্গতে॥
সখীমুখে তু সংযোজ্য মধ্যধারা স্বকাননে।
এবং কৃত্বা তু তা স্তত্র গতাঃ সর্বা যথাগতম॥

ধূমাবতী

অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বতা রমাঝঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পবান আর হস্তে কুলা॥

এই দেবী ধূম্রবর্ণা, অতি বৃদ্ধা, বিধবা, বিস্তার বদনা, ক্ষুধাকাতরা, দ্বিভুজা। বার্দ্ধক্যজনিত এঁর এক হাত কম্পবান, আর অন্য হাতে কুলা। স্খলিতবসনা নিরাভরণ বিধবার বেশ। স্থূলাঙ্গী, দেহভঙ্গী কুটিল ও স্তন লম্বমানা। ইনি ভয়প্রদা, রুক্ষা, কলহপ্রিয়া ও কাকধ্বজ রথারূঢ়া। ধূম্রাসুরকে বধ করার জন্য দেবী ধূমাবতী নামে বিখ্যাতা। ইনি ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন। 'ধূমারূপা মহাদেবী চতুর্বর্গপ্রদায়িনী'।

বগলামুখী

রত্নগৃহে রত্নসিংহাসন মধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া উর্দ্ধ করি॥
চন্দ্র সূর্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন॥
ললাট মণ্ডলে চন্দ্র খণ্ড সুশোভন॥

ইনি পীতবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিধানা, দ্বিভুজা—এক হাতে উদ্যত মুগুর, আর অন্য হাতে অসুরের জিব টেনে ধরেছেন। রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনে অবস্থিতা, ত্রিনয়নী ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতা। বগলামুখীর মন্ত্র স্মরণে অসম্ভবও সম্ভব হয়। পবনের গতি স্তব্ধ হয়। অগ্নি শীতল হয়, গর্বিতের গর্ব খর্ব

হয় এবং ক্ষিতিপতি পর্যন্ত শঙ্কিত হয়। এই দেবীর নামের ব-কারে বারুনী দেবী, গ-কারে সিদ্ধিদায়িনী ও ল-কারে পৃথিবী বুঝায়।

বকারে বারুনীদেবী গকারে সিদ্ধিদা স্মৃতা।
লকারে পৃথিবী চৈব চৈতন্যা গে প্রকীর্তিতা॥

মাতঙ্গী

রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভূজা খড়্গ চর্ম পাশাঙ্কুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥

এই দেবী শ্যামবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, ত্রিলোচনা, চতুর্ভূজা (খড়্গ, চর্ম পাশ ও অঙ্কুশ চার হাতে এই চার আয়ুধ) রত্নসিংহাসনে অবস্থিতা, এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্রধারিনা। ইনি সদাহাস্যময়ী—এই দেবীকে আরাধনা করলে জীবের শ্রীলাভ হয়। ইনি মতঙ্গাসুরকে বধ করেন বলে মাতঙ্গী নামে পূজিতা হন। এই দেবী, অত্যন্ত মদশীলা এবং জীবকে সকল আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। 'সর্বাপত্তারিনী দেবী মাতঙ্গী পরিকীর্তিতা।'

কমলা

সুবর্ণ সুবর্ণবর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেক অমৃত বরিষে।

ইনি স্বর্ণবৎ সমুজ্জ্বলা, চতুর্ভূজা (বামদিকের দুহাতে পদ্ম ও দক্ষিণ দিকের দুহাতে বরাভয় মুদ্রা) দেবী অতি সুন্দরী, অম্বুজনয়না। প্রশান্ত মুখচ্ছবি ও অতি রমনীয়া। পরিধানে পট্টবস্ত্র ও পদ্মোপরি অবস্থিতা। এঁর চারপাশে চারটি শ্বেত হস্তি শুড় দিয়ে অমৃতপূর্ণ চারটি স্বর্ণকলস গ্রহণ করে দেবীকে অভিষেক করছে। ইনি বৈকুণ্ঠে কমলা ও পাতালে লক্ষ্মীরূপে প্রসিদ্ধা। ইনি কখনও দ্বিভূজা, কখনও চতুর্ভূজা, কখনও ষড়ভূজা, কখনও বা অষ্টভূজা রূপে বিদ্যমান আছেন। ইহাকে মহালক্ষ্মীও বলা হয়।

বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা চ প্রকীর্তিতা॥
পাতালবাসিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা চ সুন্দরী॥

॥ তিন ॥

সতী দশরূপ ধারণ করে শিবের সামনে যে দশটি বিভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূতা হন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগে দিয়েছি; এবার দেবীর দশমূর্তির মধ্যে যে পার্থক্যগুলি দেখা যায়, সে সম্বন্ধে কিছু নিবেদিত হলো।

ব্রহ্মপুরুষ শিব কালী ও তারার পদতলে থেকে তিনি যে মহাশক্তির অধীন তাই বিজ্ঞাপিত করছেন। মহাশক্তির বাসস্থান হচ্ছে শ্মশানভূমি। শ্মশান মানে শবের শয়নস্থান—এই পৃথিবীতে কর্মফল ভোগের পর সব জীবের শেষ বিশ্রামস্থল শ্মশান। সেই শ্মশানে বাস করেন কালী ও তারা। কল্পান্তে তাঁর আশ্রয়ে সকলে বিশ্রাম পায়। যোগনিদ্রারূপিনী কালিকার স্নিগ্ধ শীতল ক্রোড়ে আমরা শান্তিলাভ করি। আর শ্মশানবাসিনী জগজ্জননী কালিকা তখন আমাদের আধি-ব্যাধি, বিরহ-বেদনা, সন্তাপ-উদ্বেগ সর্বোতভাবে মুছিয়ে দেন। কালিকারূপিনী এই মহাশক্তি বিশ্বের সব নর-নারীর কেবল পরমাজননী নন, তিনি হচ্ছেন সর্বজীবের প্রসবিত্রী, ধাত্রী ও পালয়িত্রী।

পরমাপ্রকৃতি ত্রিনয়না। তিনটি নয়নে চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি অন্ধকার বিধ্বংসী এই তিন শক্তির বিকাশ। তিন নয়নে মাতা তিন কাল দেখেন। জীবকে তিনি সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করান। মায়ের বক্ষের উন্নতস্তন ক্ষীর পরিপূর্ণ। এক স্তন দিয়ে জগৎপালন করেন আর এক স্তনধারায় মাতৃ সাধকদের পরমা মূর্তির অমৃত আস্বাদন করান।

অবস্থান ॥ দশমূর্তির মধ্যে কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ও ধূমাবতী এই পঞ্চদেবী দাঁড়িয়ে আছেন আর ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা এই পঞ্চদেবী বসে আছেন।

আসন ॥ কালী ও তারা শিবোরূঢ়া, ষোড়শী পদ্মাসনা, ভুবনেশ্বরী ও কমলা অম্বুজআসনা, ভৈরবী জলপদ্মে দণ্ডায়মানা, ধূমাবতী রথে দণ্ডায়মানা, বগলামুখী রত্নসিংহাসনে অবস্থিতা এবং মাতঙ্গী রত্নপদ্মাসনে আসীনা।

মুকুট ॥ সকল দেবীর মাথায় মুকুট আছে। কেবল তারার সর্পমুকুট ও ধূমাবতী বিধবার বেশ বলে তিনি মুকুটহীনা।

কেশ ॥ ধূমাবতী ছাড়া সকলেরই আলুলায়িত কেশরাশিও কেবল তারার কেশ জটাযুক্ত এবং ভৈরবীর অতি দীর্ঘ। মায়ের পেছনে আলুলায়িত মুক্তকেশরাশী যেন একটি পরদা। পিছনটা ও মধ্যটা আমাদের দেখতে দেবেননা।...যমের শক্তি থেকে কেশ হয়েছে। জীবনকে রহস্যময় করে রেখেছেন মৃত্যুর আবরণ দিয়ে। কোন বৈচিত্রময় জগতের চরম তত্ত্বকে কেশ রহস্যাবৃত করে রেখেছে।

এই হচ্ছে দার্শনিক পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের অভিমত।

জিহ্বা॥ দেবীর রক্তবর্ণ জিহ্বা রজোগুনের সূচক। আর শুভ্রতা হচ্ছে সত্বগুণের প্রতীক। কালী ও তারার লোলজিহ্বা, অন্যান্য অষ্টদেবীর জিহ্বা সাধারণ। শুভ্র দন্তের দ্বারা রসনা দংশন করে সাধকদের সত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে সংহত করতে শিক্ষা দিচ্ছেন।

মুখ॥ কালী ভীষণ বদনা, ষোডশী ও ভৈরবী স্মীতমুখী, ভূবনেশ্বরী স্মোরমুখী, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী, ধূমাবতী কুরুপা এবং কমলা প্রশান্ত বদনা।

গলা॥ কালীর গলদেশ পঞ্চাশটি মুণ্ডমালায় বিভূষিতা। মুণ্ড হচ্ছে জ্ঞান-শক্তির আধার। আর পঞ্চাশটি মুণ্ড সংস্কৃত বর্ণমালার প্রতীক। বর্ণমালা শব্দব্রহ্মের বহিরঙ্গ প্রকাশ। গলায় নরমুণ্ড মন্ত্রশক্তির প্রতীক চিহ্ন।

হস্ত॥ দশমূর্তির মধ্যে কালী, তারা, ষোডশী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী ও কমলা এই সপ্তদেবীর চার হাত এবং ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী ও বগলামুখী এই তিন দেবীর দু-হাত। চার হাতেব অর্থ দু-হাতে পালন করেন। আর দু-হাতে নিধন করেন। এক হাতে আঘাত আর এক হাতে সান্ত্বনা; এক হাতে ভীতি প্রদর্শন আর এক হাতে সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ। এমন বিরুদ্ধতার অপূর্ব সমন্বয়, সামগ্রিকতার পূর্ণ অভিব্যক্তি—সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তির এমন পূর্ণ-প্রতীক পৃথিবীতে দেখা যায় না।

মুদ্রা॥ কালী, ভৈরবী, ভূবনেশ্বরী ও কমলার দুই হাতে বর ও অভয় মুদ্রা।

বস্ত্র॥ ষোডশী, ভূবনেশ্বরী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা এই পঞ্চদেবী মনোরম বস্ত্র পরে আছেন। কালীর উর্দ্ধাঙ্গ বস্ত্রশূন্য ও নিম্নাঙ্গ অস্থিমালায় আবৃত। তারার উর্দ্ধাঙ্গ বস্ত্রশূন্য ও নিম্নাঙ্গ বাঘছালে আবৃত। ছিন্নমস্তা ও তাঁর দুই সখী উলঙ্গিনী এবং ধূমাবতী স্খলিতবসনা।

দশমহাবিদ্যার নাম উচ্চারণ করলে জীব সর্বপাপ মুক্ত হয় ও এঁদের স্মরণে জীব ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে, যথা:

একোচ্চারণ মাত্রেণ সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
স্মরণেনৈব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥

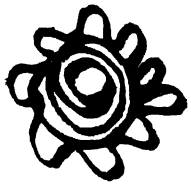

পশ্চিমবঙ্গের মহাপীঠ

বাঙলাদেশকে শক্তি উপাসনার কেন্দ্র বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। বাঙলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে কালীবাড়ির আধিক্যই এর প্রমান দেয়। "যেখানে বাঙালী সেখানে পাঁঠাবলি" তাই আজ সহজেই পরিণত হয়েছে প্রবাদে। বাঙলাদেশ নরম মাটির দেশ—দেশের মাটির মত এদেশের নর-নারীর চিত্তও কোমলতার আবরণে আচ্ছাদিত, এমন একটা খ্যাতি বা অখ্যাতি সর্বত্রই প্রচলিত। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই নরম মাটির দেশে এই কোমল হৃদয়ের দেশে শক্তিপূজার এত প্রাধান্যের হেতু কী? হেতু নিশ্চয়ই আছে এবং তা অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সত্যকেই স্মরণ করায়।

এই উপলক্ষে সতীর দেহত্যাগের কাহিনীকে স্মরণ করা যেতে পারে। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে বিষ্ণু চক্রের দ্বারা খণ্ডিত সতীদেহ নেপাল, সিংহল, বাংলাদেশ সহ ভারতের একান্নটি স্থানে পড়ে। যে সকল স্থানে তাঁর দেহের অংশ পড়েছিল কালক্রমে সেগুলিই মহাপীঠস্থান রূপে পরিগণিত হয়। এই একান্নটি শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যূন এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সতেরটি শুধু বাঙলাদেশেই অবস্থিত। পূর্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে বীরভূম, উত্তরে জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণে সুন্দরবন এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বাঙলাদেশের এই শক্তিপীঠগুলি বিরাজিত। নেপাল, সিংহল বা ভারতের আর কোন প্রদেশে বাঙলাদেশের মত পীঠস্থানের এই আধিক্য লক্ষ্য করা যায় না।

বাঙলাদেশের সতেরটি শক্তিমহাপীঠের বারোটি-ই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সেগুলি যথাক্রমে বীরভূম জেলার কোপাই, নলহাটী, লাভপুর, সাঁইথিয়া ও বক্রেশ্বরে, বর্ধমানে ক্ষীরগ্রাম, উজানি, কেতুগ্রাম ও জুড়নপুরে, মুর্শিদাবাদে কিরীটকনায়, জলপাইগুড়িতে শালবাড়ীগ্রামে ও কলকাতার কালীঘাটে। সতীর প্রথম অঙ্গ (ব্রহ্মরন্ধ্র) পড়ে হিঙ্গুলায়। দেবী কোট্টরী, ভৈরব ভীমলোচন। দেবীর শেষ অঙ্গ (বামপদাঙ্গুলি) পড়ে বিরাটে। দেবী অম্বিকা, ভৈরব অমৃত।*

* কিন্তু পঞ্জিকায় ইহার স্থান ৪৯ বলে দেখা যায়।

এছাড়া ত্রিপুরার উদয়পুরে ও বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গ) খুলনা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও বগুড়ায় দেবীদেহের বিভিন্ন অংশ পড়াতে সেগুলো এক একটি পীঠস্থানে পরিণত হয়।

তন্ত্র অনুসারে কোপাই-এর নামে কাঞ্চীদেশ। মাদ্রাজে কাঞ্চীপুর বা কনজীপুরম্ খুব প্রসিদ্ধ স্থান হলেও সেখানে কোন শক্তিপীঠ নেই—আছে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামে পৃথক নগর। বাঙলার কাঞ্চীদেশে বা কোপাই-এর চলতি নাম কঙ্কালীতলা। কারণ দেবীর কঙ্কাল এখানে পড়েছিল। বোলপুরের কাছে কোপাই নামক উত্তরবাহিনী নদীর তীরে এই পীঠস্থান। দেবীর নাম বেদগর্ভা, ভৈরবের নাম রুরু। কোপাই নদীর কাছে একটি কুণ্ডের জল বিশেষ পবিত্র মনে করায় ভক্তগণ এই জলে দেবীর পূজা করে থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা বসে।

নলহাটী বীরভূম জেলার একটি প্রধান স্বাস্থ্য নিকেতন ও সমৃদ্ধশালী শহর। শহর থেকে সামান্য কিছু দূরে একটি উঁচু টিলার উপর দেবীর ললাট পড়েছিল বলে দেবীর নাম ললাটেশ্বরী, ভৈরব যোগীশ। তন্ত্র মতে দেবীর নাম কিন্তু কালিকা। নলহাটী স্টেশনের কাছে নলরাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়।

লাভপুরে শ্রীশ্রীফুল্লরার মহাপীঠ—এখানে দেবীর অধঃওষ্ঠ পড়েছিল। দেবীর নাম ফুল্লরা, ভৈরব বিশ্বেশ। দেবীর কোন মূর্তি নেই। একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড দেবীর ওষ্ঠের প্রতীকরূপে প্রত্যহ পূজিত হয়। ইহাকে অট্টহাস মহাপীঠ বলে। এখানকার নিকটবর্তী জঙ্গলে কতকগুলি শৃগাল বাস করে। পুরোহিতের আহ্বানে তারা গৃহপালিত পশুর মত এসে মন্দির থেকে প্রদত্ত শিবাভোগ রোজ ভক্ষণ করে।

অপরস্থান সাঁইথিয়া একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্টেশনের কাছে রেল লাইনের পাশে এক প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় দেবীর গলার হার পড়েছিল। ইহা তন্ত্রোক্ত নন্দীপুর পীঠ বলে প্রসিদ্ধ। দেবীর নাম নন্দিনী ও ভৈরব নন্দীকেশ্বর। কেউ কেউ বলেন দেবীর হাড় এখানে পড়েছিল। হার অলঙ্কার-মাত্র, উহা দেবীদেহের কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গ নহে। সুতরাং এই স্থান উপপীঠ না হয়ে মহাপীঠ রূপে গণ্য হওয়ায়, দেবীর হাড় পড়েছিল বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।

বক্রেশ্বর মহামুনি অষ্টাবক্রের সাধন স্থান বলে সর্বত্র সুপরিচিত। এখানে দেবীর ভ্রূমধ্য (মনঃ) পড়েছিল। দেবীর নাম মহিষমর্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ।

মহাশ্মশানের উপর এই মহাপীঠ অবস্থিত। এখানে সাতটি উষ্ণপ্রস্রবন আছে। দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গনে শ্বেত সরোবর নামে একটি উষ্ণকুণ্ড আছে। এখানে স্নান করে কয়েক ধাপ নীচে গহ্বরের মধ্যে শিবকে দর্শন করতে হয়। এই তীর্থ সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কাহিনী আছে। এখানকার উষ্ণকুণ্ডের জলে স্নান করলে বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায় বলে স্থানীয় লোকের ধারণা। শিবরাত্রিতে বক্রনাথের মহামেলা একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

ক্ষীরগ্রাম বর্ধমান জেলার একটি প্রাচীন পল্লী। এখানে দেবীর দক্ষিণপদের আঙ্গুল পড়েছিল। দেবীর নাম যোগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। প্রাচীনকালে দেবীর পূজায় নরবলি দেওয়া হতো। বৈশাখ সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা হয়। সেই সময় দেবীকে পুষ্করিণী থেকে বের করা হয় এবং মেলা শেষ হলে পুনরায় এক বছরের জন্য পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। উজানিও একটি প্রাচীন জনপদ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক শ্রীমন্ত সওদাগর এখানে জন্মগ্রহণ করেন। উজানিতে দেবীর দক্ষিণ কনুই পড়েছিল। দেবীর নাম সর্বমঙ্গলা, ভৈরব কপিলাম্বর। সর্বমঙ্গলার মূর্তি দশভূজা ও সিংহবাহিনী এবং ভৈরব কপিলাম্বরের লিঙ্গমূর্তি পলতোলা কষ্টিপাথরের দ্বারা নির্মিত। উজানির মহাশ্মশানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্মৃতি বিজড়িত খড়্গমোক্ষণ নামেও একটি তীর্থ আছে।

পরবর্তী স্থান কাটোয়া থেকে দশমাইল দূরে নিরোল ষ্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রাম তন্ত্রোক্ত বহুলাপীঠ বলে খ্যাত। এখানে দেবীর বাঁ-হাত পড়েছিল। দেবী বহুলা ও ভৈরব ভীরুক এখানে নিত্য পূজিত হন। কেতুগ্রামের কাছে জুডনপুরে দেবীর মুণ্ড পড়েছিল। পীঠস্থানটি বনের মধ্যে অবস্থিত। দেবীর নাম জয়দুর্গা ও ভৈরব ক্রোধীশ। প্রাণতোষিণী তন্ত্রের মতে জুডনপুর তন্ত্রোক্ত কালীঘাট থেকে অভিন্ন। জুডনপুরকেও অট্টহাস মহাপীঠ বলা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ কোর্ট রোড ষ্টেশন থেকে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কিরীটকণা একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে দেবীর কিরীটের কণা পড়েছিল। দেবীর নাম কিরীটেশ্বরী, ভৈরব সম্বর্ত। কিরীটের কণা দেবী দেহের নয়, তথাপি স্থানটি উপপীঠ না হয়ে মহাপীঠ হওয়ায় বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মন্দিরের মধ্যে একটি বড় বেদীর ওপর একটি ছোট বেদী আছে। এইটিই দেবীর কিরীট বলে পূজিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ রায় দেবীর মন্দিরটি সংস্কার করান। রাজা রাজবল্লভ

ও রাণীভবানীর বহু কীর্তিচিহ্ন এখানে আছে। 'সয়ের মুতক্ষরীণ' গ্রন্থে আছে নবাব মীরজাফর শান্তিলাভের আশায় অন্তিমকালে তাঁর দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করেন। কিরীটেশ্বরীর ভৈরব বলে যে মূর্তি পূজা করা হয়, উহা লিঙ্গমূর্তি নয়; উহা প্রকৃতপক্ষে একটি বুদ্ধমূর্তি। বাঙলার বহুস্থানে এইরকম বহু বুদ্ধমূর্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মন্দিরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে একবার আমূল সংস্কার করান।

তন্ত্র অনুসারে ত্রিস্রোতা নদী তীরে দেবীর বাম-পদ পড়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলার শালবাড়ীগ্রাম নামক স্থানে দেবীর নাম ভ্রামরী ও ভৈরবের নাম ঈশ্বর।

ত্রিপুরায় দেবীর দক্ষিণ-পদ পড়েছিল। এখানে দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরব ত্রিপুরেশ। গোমতী নদীর দক্ষিণতীরে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি পাহাড়ের অধিত্যকায় দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির। মন্দিরগাত্রে অনেকগুলি শিলালিপি আছে। একটি শিলালিপি থেকে মহারাজ ধনমাণিক্য ১৪২৩ শকাব্দে মন্দির নির্মাণ করেন ও মন্দিরের প্রথম সংস্কারক হচ্ছেন সেনাপতি রঙ্গনারায়ণ বলে জানা যায়। তারপর ১৬০৩ শকে মহারাজ রামমাণিক্য ও ১৭৭৯ শকে দুর্গামাণিক্যের স্ত্রী সুমিত্রা দেবী জগদীশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের সংস্কার করেন বলেও লেখা আছে। এবং ১৮২৬ শকে মহারাজ রাধাকিশোমাণিক্য শেষবারের মত মন্দির সংস্কার করেন। মন্দিরের মধ্যে চতুর্ভুজা সালঙ্কারা পাষাণময়ী অপূর্ব লাবণ্যময়ী দেবীমূর্তি ভারতবর্ষের অতি অল্প স্থানেই আছে। প্রতিদিন মন্দিরে একটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয় এবং প্রতি আমাবস্যায় একটি মহিষ ও পাঁচটি পাঁঠা বলি দিয়ে দেবীর অর্চনা করা হয়। এখানে আগে প্রায়ই নরবলি দেওয়া হতো। মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর শিবচতুর্দশীর দিন একটি মেলা হয়।

কলকাতার কলিতীর্থ কালীঘাটে দেবীর দক্ষিণ চরণের আঙ্গুল পড়ায় এই দক্ষিণা কালীমাতার উৎপত্তি হয়। ১২১৬ সালে রাজা বসন্ত রায় এই মন্দির তৈরী করে দেন। দেবীমূর্তি শিলানির্মিত এবং ভৈরব নকুলেশ। আদি-গঙ্গার তীরে এই দেবীমন্দির অবস্থিত। ভগীরথ স্বর্গ হতে গঙ্গা আনয়ন কালে এই পথেই সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলেন। তাই কালীঘাটের কালীমাতা দর্শনের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিদেশ থেকে প্রত্যহ যেরূপ যাত্রীসমাগম হয়, ভারতের অন্য কোন তীর্থে অনুরূপ জনসমাগম বড় একটা দেখা যায়

না। ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরের জামাতা ভবানীদাস হালদারদের পূর্বপুরুষ কালীঘাটের সেবায়েত। পূর্বে বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের বুঝি ছিল এই ঠাকুর। কিন্তু সেবায়েতরা তা বলেন না।*

নবযুগের মানবের মনোজগত যখন আধুনিক চিন্তায় চিন্তিত এবং প্রায়শই পুরানো সংস্কারের অধীনতামুক্ত, তখনো এই মহাপীঠগুলির প্রাধান্য বা মাহাত্ম্য কোন অংশেই অমূলেখ্য নয়; এবং শতাব্দী থেকে ভবিষ্যৎ শতাব্দীতেও এ-গুলির মূল্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে এ যুক্তি সম্ভবতঃ অমূলক নয়।

পি. এম. বাগচীর পঞ্জিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত "ভারতবর্ষীয় একান্নটি পীঠস্থানের" লিপিকা দেবার আগে শতাধিক শ্যামা সংগীত রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলামের একটি পরিচিত সংগীত এখানে নিবেদিত হলো:

জৌনপুরী দাদরা

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যাঁর হাতে মরণ-বাঁচন॥
কালো মায়ের আঁধার কোলে শিশু রবি-শশী দোলে,
(মায়ের) একটুখানি রূপের ঝলক—স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন॥
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশিথিনীর দুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার যে তাঁর নাইক শেষ॥
সিন্ধুতে মার বিন্দু খানিক ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মাণিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্‌বসন॥

ভারতবর্ষীয় ৫১ পীঠস্থান

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে থাকেন। বিষ্ণু সেই দেহ খণ্ডন করেন; উহা যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানকে পীঠস্থান কহে।

১। "হিঙ্গুলায়"—(সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র; বিগ্রহ-দেবী কোট্টরী ও ভীমলোচন ভৈরব)—এখানে অপূর্ব জ্যোতি দেখা যায়। করাচি (পাকিস্থান) হইতে আনুমানিক ৯৫ মাইল দূরে সমুদ্র তীরের উপর। উহা বেলোচিস্থানের অন্তর্গত। পূর্বে উহার নাম ছিল মেকরান।

---

*দেবীর নথিপত্রে চন্দনের ফোঁটা দক্ষিণ কালিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণুর প্রতীকচিহ্ন চন্দন টিপ অন্য কোন দেবী মূর্তিতে দেখা যায় না। আর দেবী অঙ্গ যেস্থানে পড়েছিল, সেই স্থান "কালী কুণ্ড" বা কুণ্ডুপুকুর বলে এখন পরিচিত।

২। "শর্করায়" পড়ে দেবীর তিন চক্ষু, দেবী মহিষমর্দিনী, ক্রোধীশ ভৈরব। করাচি (পাকিস্থান) হইতে ফের ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়।

৩। "জ্বালামুখীতে"—সতীর জিহ্বা পড়ে দেবী অম্বিকা (সিদ্ধিদা), ভৈরব উন্মত্ত। পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরের নিকট।

৪। "সুগন্ধায়"—(নাসিকা; দেবী সুনন্দা, ভৈরব ত্র্যাম্বক) বরিশালের (বাংলাদেশ) উত্তরে ১১মাইল। শিকারপুর গ্রাম বর্তমান সোঁধা।

৫। "ভৈরব পর্বতে" অবন্তী দেশে (ঊর্দ্ধওষ্ঠ, দেবী অবন্তী, ভৈরব লম্বকর্ণ) উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী।

৬। "অট্টহাসে"—(অধঃ ওষ্ঠ, দেবী ফুল্লরা ভৈরব বিশ্বেশ) লাভপুরের পূর্বে অট্টহাস অবস্থিত। আগে শিবাভোগ প্রভৃতি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যেত। মন্দিরপার্শ্বে ভৈরবের মন্দির।

৭। "প্রভাসে"—(উদর, দেবী চন্দ্রভাগা, বক্রতুণ্ড ভৈরব) প্রভাস মথুরার অন্তর্গত।

৮। "জনস্থানে"—(চিবুক; দেবী ভ্রামরী বিকৃতাক্ষ ভৈরব)। এখানে জলে ও স্থলে মায়ের চিবুক পড়ে।

৯। "গোদাবরী তীরে" (বামগণ্ড, দেবী বিশ্বমাতৃকা, ভৈরব দণ্ডপাণি)। মতান্তরে সর্বশৈলে বামগণ্ড, দেবী রাকিনী, ভৈরব অমায়ী।

১০। "গণ্ডকীতে" (দক্ষিণগণ্ড, দেবী গণ্ডকীচণ্ডী, ভৈরব চক্রপাণি) সিদ্ধি নদীর প্রায় উৎপত্তিস্থানে শালগ্রামশিলা পাওয়া যায়।

১১। "শুচিদেশে"—(ঊর্দ্ধ দন্তপংক্তি; দেবী নারায়ণী, সংহার ভৈরব)। পঞ্চ সাগরে অধোদন্তপংক্তি (দেবী গায়ত্রী, ভৈরব মহারুদ্র)।

১২। "করতোয়া তটে" (বামতল্প পৃষ্ঠদেশের মাংস, দেবী অর্পণা, বামন ভৈরব) বগুড়া ষ্টেশন (বাংলাদেশ) থেকে ৮ মাইল ভিতর দিয়া দক্ষিণে হয়। ভবানীপুর গ্রাম।

১৩। "শ্রীপর্বতে" (সতীর দক্ষিণতল্প, দেবী শ্রীসুন্দরী, ভৈরব সুন্দরানন্দ)।

১৪। "কর্ণাটে" (কর্ণদ্বয়, দেবী জয়দুর্গা, ভৈরব অভীরু)।

১৫। "বৃন্দাবনে" (কেশ; দেবী উমা, ভৈরব ভূতেশ)।

১৬। "কিরীটে" (কিরীট; দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্ত)। কলিকাতা থেকে আজিমগঞ্জ শাখায় বটনগরু গ্রামে।

১৭। "শ্রীহট্টে" (গ্রীবা; দেবী মহালক্ষ্মী, ভৈরব শম্বরানন্দ)। শ্রীহট্ট

(বাংলাদেশ) হইতে দেড় মাইল অগ্নিকোণে গোটিকর জৈনপুরে ভৈরব ও তীর্থস্থান তারাপীঠ। শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীতে মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

১৮। "নলহাটিতে" (নলী, দেবী কালিকা, ভৈরব যোগেশ)। ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে।

১৯। "কাশ্মীরে"(কণ্ঠ; দেবী ক্ষিরভবানী মহামায়া, ভৈরব ত্রিসন্ধ্যেশ্বর) তীর্থ অমরনাথ।

২০। "রত্নাবলীতে" (দক্ষিণস্কন্ধ, দেবী কুমারী, ভৈরব শিব)।

২১। "মিথিলায়" (বামস্কন্ধ; উমা দেবী, ভৈরব মহোদর)। জনকপুর রেল ষ্টেশনের সন্নিকট।

২২। "চট্টগ্রাম বা চট্টলে"—(সতীর দক্ষিণ হস্তাদ্ধো দেবী ভবানী, ভৈরব চন্দ্রশেখর)। স্বয়ং মহাদেব বলিতেছেন, "চন্দ্রশেখর পর্বতে আমি নিয়ত বাস করি"। বর্তমানে বাংলাদেশ।

২৩। "মানসক্ষেত্র মানস সরোবরে" হস্তার্দ্ধো দেবী দাক্ষায়নী ভৈরব অমর।

২৪। "উজ্জয়নীতে (বাম কনুই; দেবী মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব কপিলেশ্বর) গুসকরা ষ্টেশন হইয়া যাইতে হয়। এখানে শ্রীমন্তের জন্মস্থান।

২৫। "মণিবেদ" (মণিবন্ধ করগ্রন্থি; দেবী গায়ত্রী, ভৈরব সর্বানন্দ)।

২৬। "প্রয়াগে" (হস্তাঙ্গুলি; দেবী ললিতা ও ভব ভৈরব)

২৭। "বহুলায়"(বামবাহু; দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক) কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম তীর্থস্থান।

২৮। "জলন্ধরে" (বাম স্তন; দেবী ত্রিপুরমালিনী, ভৈরব ভীষণ)।

২৯। "রামগিরিতে বা চিত্রকূট পর্বতে"—(দক্ষিণ স্তন; দেবী শিবানী চিত্রকূট পর্বতে ভৈরব), বিলাসপুর ষ্টেশনের নিকট।

৩০। "বৈদ্যনাথে"—(হৃদয়; দেবী জয়দুর্গা ভৈরব বৈদ্যনাথ)।

৩১। "উৎকলে" সতীর নাভি (দেবী বিমলা, ভৈরব জগন্নাথ)। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পার্শ্বে।

৩২। "কাঞ্চিদেশে"—(সতীর কঙ্কাল, দেবী দেবগর্ভা, রুরু ভৈরব)। বোলপুর ষ্টেশনের নিকট দুই ক্রোশ দূরে কঙ্কালীপীঠ অবস্থিত। এখানে একটি কুণ্ড আছে। তাহাতে সাধারণে পূজাদি করিয়া থাকেন।

৩৩। "কালমাধবে"—(বাম নিতম্ব; দেবী কালী, অসিতাঙ্গ ভৈরব)।

এই স্থানে দেবীকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করে লোকে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

৩৪। "নর্মদায়"—(দক্ষিণ নিতম্ব ; দেবী শোনাখ্যা, ভদ্রসেন ভৈরব)।

৩৫। "কামরূপে" বা "কামাখ্যাতে"—(৮যোনিপীঠ ; দেবী কামাখ্যা উমানন্দ ভৈরব) ; গৌহাটীর নিকট ; পর্বতে ত্রিগুণাতীত হইয়াও আম রক্তপাষাণরূপিণী, যে স্থানে সাক্ষাৎ হয় গ্রীবমাধব এবং উমানন্দ নামে ভৈরব অবস্থিত, যে ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার নিত্য বিহার, সেই নিত্য প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে জীবনের মুক্তি। অম্বুবাচীতে কামাখ্যা দর্শন।

৩৬। "নেপালে"—(জানুদ্বয় ; দেবী জয়দুর্গা মহামায়া, ভৈরব কপালী)।

৩৭। "জয়ন্তীতে"—(সতীর বাম জঙ্ঘা ; দেবী জয়ন্তী, ভেরব ক্রমদীশ্বর)। শ্রীহট্টের অন্তর্গত (বাংলাদেশ) জয়ন্তীয়া পরগণায় পর্বতের পাদদেশে দেবীর প্রাতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় ইহাই জয়ন্তীর পীঠ।

৩৮। "মালবে"—সর্বানন্দ দেবী, ভৈরব ব্যোমকেশ।

৩৯। "ত্রিপুরায়"—(দক্ষিণ চরণ ; দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরব ত্রিপুরেশ)। ত্রিপুরা থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে উদয়পুরে।

৪০। "যুগাদ্যায়"—(দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধো অঙ্গুষ্ঠ , দেবী মহামায়া খিরখণ্ডক ভৈরব।) বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়।

৪১। "কালীঘাটে"—(দক্ষিণ চরণের ৪টি অঙ্গুলি, দেবী দক্ষিণা কালী ও নকুলেশ্বর ভৈরব। কলিকাতায় অবস্থিত।

৪২ "কুরুক্ষেত্র"—(দক্ষিণ পায়ের গুল্‌ফ্‌ ; সাবিত্রী দেবী ভৈবর স্থাণু)। মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত।

৪৩। "বক্রেশ্বরে"—(মন : বা ভ্রুমধ্য দেবী মহিষমর্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ)। কলিকাতা হইতে রেলে দুরারাজপুর ষ্টেশন হইতে সাত মাইল। এখানে ৭টি উষ্ণ প্রস্রবণকুণ্ড ও পাপহরা নদী আছে।

৪৪। "যশোরে"—(পাণিপদ্ম ; দেবী যশোরেশ্বরী, ভৈরব চণ্ড)। বাংলাদেশ।

৪৫। "নন্দীপুরে" —(দেহের হাড ; দেবী নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশ্বর)। সাঁইথিয়া ষ্টেশানের পূর্বদিকে পীঠস্থান।

৪৬। "বারাণসীতে"—(কুণ্ডল ; দেবী বিশালাক্ষী ; কাল ভৈরব)। যে স্থানে কর্ণ হইতে মণিময় কুণ্ডল পড়ে মনিকর্ণিকায়।।

৪৭। "কণ্যাশ্রমে" (সতীর পৃষ্ঠ দেশ দেবী সর্বাণী নিমিষ ভৈরব)।

৪৮। "লঙ্কায়"—(নূপুর ; দেবী ইন্দ্রাক্ষী, রাক্ষসেশ্বর ভৈরব)। পুরাকালে ইন্দ্র কর্তৃক উপাসিত।

৪৯। "বিরাটে"—(বামপদাঙ্গুলি ; দেবী অম্বিকা, ভৈরব অমৃতাক্ষ)।

৫০। "বিভাসকে"—(বামগুল্‌ফ ; দেবী ভীমরূপা বা ভীমবর্গ, সর্বানন্দ বা কপালী ভৈরব)। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে। বা বর্গভীমা।

৫১। "ত্রিস্রোতায়"—(বামপাদ ; দেবী ভ্রামরী, ভৈরব অম্বর), জলপাইগুড়ির বোদার অন্তর্গত শালবাড়ী প্রান্তে।

মরুতীর্থ হিংলাজ

দক্ষযজ্ঞের পর সতী দেহত্যাগ করলে বিষ্ণুচক্রের দ্বারা খণ্ডিত সতীদেহ নেপাল সিংহল ও ভারতের একান্নটি স্থানে পড়েছিল বলে সেগুলি সব পীঠস্থান হিসাবে পরে হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়। সতীর প্রথম অঙ্গ ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল সমুদ্র তীরবর্ত্তী বেলোচিস্থানের দাক্ষিণভাগে হিঙ্গলাজ নামক স্থানে। উহাই মরুতীর্থ হিঙ্গলাজ নামে খ্যাত। কিন্তু মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্যে হিন্দুতীর্থ কীভাবে হলো। সে বিষয় বিশেষভাবে গবেষণা করে ১৮৭০ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে উনিশ শতকে প্রকাশিত বিদেশীদের মূল্যবান সব নানা রচনার সাহায্যে এই প্রসঙ্গে যা তিনি লিখেছিলেন তা থেকে ওখানে যে পূর্বে হিন্দুদের বাসভূমি ছিল তা জানা যায়। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করছি :

হিঙ্গলাজ তীর্থ বেলোচিস্থানের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত। ঐ খণ্ডের নাম মেকরান্। উহা সমুদ্র তীরবর্তী।

হিন্দু জাতির অস্পৃশ্য মোসলমানদিগের দেশে হিন্দুতীর্থ প্রতিষ্ঠিত শুনিয়া অনেকে এখন আশ্চর্য বোধ করিতে পারেন। কিন্তু বহুকালবাধি সিন্ধু নদের পশ্চিম ও উত্তরাংশে কিছুদূর পর্যন্ত হিন্দুদিগের অধিবাস ছিল। কান্দাহার দেশের নামটি সংস্কৃত গান্ধার শব্দেরই অপভ্রংশ। অধিক পূর্বের কথা দূরে থাকুক, ইদানীং ও ঐ অঞ্চলে বিস্তর হিন্দুর আবাস সৃষ্টি হইয়াছে। কিছুকাল হইল বোখরোয় ন্যূনাধিক তিন শত হিন্দু এবং কাবুলে ও ন্যূনাধিক তিন শত ঘর হিন্দুর বাস ও তদতিরিক্ত অনেকগুলি হিন্দু বণিক দৃষ্টি হইয়াছিল।

(ক) মোসলমানদিগের ভারতবর্ষধিকারের অব্যবহিত পূর্বে ও কাবুলে হিন্দু রাজার অধিকার ছিল। (খ) অলবীরূনী কর্তৃক লিখিত কাবুল রাজ্যধিপতি

স্যলপতিদেব, সমন্তদেব, ভীমদেব প্রভৃতির অনেকানেক মুদ্রাতেও সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। (গ) যদি ও মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে তাহা পুনরায় আবার সংস্থাপিত হয় (ঘ)। চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউ এন্ স্ সঙ্গ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দির প্রথমার্ধে স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিবার সময়ে হিন্দুকুশ পর্বত উত্তীর্ণ হইয়াই ক্ষত্রিয় রাজার রাজ্য ও নানাবিধ হিন্দু উদাসীন সম্প্রদায় দৃষ্টি করেন। (ঙ) মোসল্মান জাতীয় ইতিহাসবেত্তারা সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে কাবুল ও তাহার সমীপস্থ অনেক স্থানে হিন্দু নৃপতিগণের অধিকার ছিল। পাঞ্জাবে, সিন্ধুতটে ও আফগানিস্থানে যে সমুদায় ভারতবর্ষীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই সে কথা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। (চ) এখনও ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া পরিগণিত অনেক অনেক স্থানে হিন্দুদের দেবালয় আছে। (ছ) রুশ দেশের মধ্যে কাস্পীয় সাগর হইতে অনতিদূরে অদ্যাপি দূরে হিন্দুদেবালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতে গণপতির প্রতিরূপ এবং কতকগুলি অন্য অন্য গৃহ দেবতার রৌপ্যময় প্রতিমূর্তি আছে এবং হিন্দু পূজারী তথায় অবস্থিতি করিয়া পরিচালনা করে। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল, জোন্সহেনোয়ে এক ব্যক্তি কাস্পীয় সাগরের তীরস্থিত বার্কু নামক স্থানে ৪০।৫০ জন হিন্দু উদাসীন দৃষ্টি করেন। (জ) কখন কখন হিন্দু গৃহস্থেও তীর্থ-দর্শনার্থ বিশেষতঃ ঐ সাগরের তীরস্থিত জ্বালামুখী সমস্ত সন্দর্শন উদ্দেশে, ঐ অঞ্চলে গমনাগমন করে জানা গিয়াছে। (ঝ) এই সমস্ত কথার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বেলোচিস্তানে হিন্দুদের দেবালয় থাকতে কিছুই আশ্চর্য বোধ হয় না।*

দেব দেবীর পূজা ও ব্রত

বাঙলায় দেব দেবীর শতাধিক পূজা পার্বন মেলা ও ব্রত ছাড়া যে সব উৎসব আজও হিন্দুসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত, তা কবে থেকে শুরু হয়েছিল, কোন সময়ে এখন সঠিকভাবে তা জানা যায় না। তবে এই সব উৎসবের সঙ্গে বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতি শৌর্য-বীর্য গ্রাম্য সমাজের ক্রমবিকাশে সেকালে যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, তার পরিস্কার একটা আভাষ পাওয়া যায়। তবে বাঙালীর সমস্ত উৎসবের সঙ্গেই সংযোগ আছে বাঙলাদেশের ষড়ঋতু, একথা

* এই প্রসঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (১৪ খণ্ড ১, ১৯৪৮) দীনেশচন্দ্র সরকারের The Sakta Pithas দ্রষ্টব্য।

নিঃসন্দেহে বলা যায়। "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে পূজা পার্বণ ও বারব্রতের কিছু কিছু উল্লেখ করেছি (২৫৮-২৭৩) এবং আলোচ্য "দেবদেবীর কথা ও কাহিনী"-তেও শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত তাঁদের উদ্ভবের নানা কারণ ছাড়া এখানে গ্রাম্যসমাজে অদ্যাপি প্রচলিত বাঙালী ব্রত ও হিন্দুর পূজা পার্বনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত হলো।

পশ্চিমবঙ্গে পূজা ও ব্রতের তালিকা

অনন্ত চতুর্দশী
অন্নপূর্ণা পূজা
অক্ষয় তৃতীয়া
অম্বুবাচী
আমবারুণী
উত্তরায়ণ
কার্তিক পূজা
গঙ্গাপূজা
গণেশপূজা
গাজন উৎসব
চড়কপূজা
জগদ্ধাত্রী পূজা
জামাই ষষ্ঠি
ঝাঁপান
ঝুলন
দশহারা
দোলযাত্রা
দুর্গাপূজা
নীলষষ্ঠি
পৌষসংক্রান্তি
বাসন্তী পূজা
বিশ্বকর্মা পূজা
বুদ্ধপূর্ণিমা
ভীমএকাদশী
ভাতৃদ্বিতীয়া
মনসা পূজা
মাঘীপূর্ণিমা
রথযাত্রা
রাখীপূর্ণিমা
রামনবমী
রামপূজা
লক্ষ্মীপূজা
শনিপূজা
শীতলাপূজা
শিবরাত্রি
শ্যামাপূজা
স্নানযাত্রা
সরস্বতী পূজা
সত্যনারায়ণ
ষষ্ঠীপূজা

দুর্গা পূজার গোড়ার কথা

ভারতের অন্যান্য স্থানে আশ্বিন মাসে শুক্লা প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নবরাত্রী ব্রত যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ব্রতী একটি ঘট স্থাপন করে সামান্য আয়োজনে পূজা করেন। কিন্তু বিরাট মূর্তি নির্মাণ করে দশভূজা দুর্গার পূজা একমাত্র বাঙলা দেশে বাঙালী ছাড়া আর কেউ এই রকম পূজা করেন না। বাঙালীর এখন ইহা জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে বলা যায়।

দেবতা ও মানুষের মধ্যে আছে অনেক রকমের ভেদ, তার মধ্যে প্রধান হলো—দিন রাত্রির পরিমাপ। দেবতাদের দিন হয় ছয় মাস, রাত্রি হয় ছয় মাস; আর মানুষের দিন বার ঘণ্টা ও রাত্রি বার ঘণ্টা। মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস হচ্ছে দেবতাদের দিন। তার নাম উত্তরায়ণ; আর শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস হচ্ছে দেবতাদের রাত্রি। তাকে বলে দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণে দিনমান তাই দেবতারা জেগে থাকেন, দক্ষিণায়ণে রাত্রি তাই তাঁরা ঘুমোন। চণ্ডীতে বর্ণিত সুরথ রাজা যে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অর্চনা করেছিলেন, সে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শাস্ত্র মতে চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে। বসন্তকালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দুজনে ঋষির আদেশে একত্র হয়ে এই পূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাই একে বলে বাসন্তী পূজা। ঋষি বলেছিলেন:

অবিচারে লও ভূপ তাঁহার শরণ।
সন্তুষ্টেতে দিবে স্বর্গ আর মোক্ষধন ॥*

দেবী দুর্গার অর্চনা করে রাজা সুরথ স্বর্গ পেয়েছিলেন। সমাধি বৈশ্যও মুক্তিলাভ করেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শরৎকালে দেবী যখন দক্ষিণায়ণে নিদ্রিত ছিলেন, তখন অকালে জাগিয়ে তাঁকে বোধন করে অর্চনা করেন বলে ইহা কালবোধিত ও শাস্ত্রানুমোদিত পূজা না হলেও এই

* শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী কৃত চণ্ডীর কাব্যানুবাদ।

শারদীয়া পূজাই আজকাল মহাপূজা বলে আমাদের দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বাসন্তী পূজা কালবোধিত পূজা বলে এই পূজায় বোধনের দরকার হয় না। কিন্তু শারদীয়া পূজা বোধন না করে কখনও করা যায় না। বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত পূজার নিয়ম ও বিধি দেবী নিজেই সব জানিয়ে দেন। রঘুনন্দন স্মৃতিতে দুর্গা পূজার সাতটি কল্প বিধান আছে। বাঙলা দেশে ষষ্ঠাদি কল্পানুসারে চারদিন আমাদের দুর্গা পূজা হয়।

রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কথা মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে কোথাও উল্লেখ নেই; কালীকাপুরাণ ও দেবীভাগবত অনুসারে রামচন্দ্রের দুর্গা পূজা এখন অনুষ্ঠিত হয়। রামায়ণে দুর্গাপূজা না থাকলেও মহাভারতে (ভীষ্ম পর্ব ২৩।৪।১৬) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ যুদ্ধজয়ের জন্য দুর্গাস্তব করতে অর্জুনকে বলেন। তাঁর কথায় অর্জুন রথ থেকে নেমে দেবী দুর্গার স্তব করেন। অর্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী দুর্গা আকাশমার্গে অবস্থান করে বলেন "হে পাণ্ডব! অচিরে তুমি শত্রুগণকে জয় করবে।" (স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রুন্ জেষ্যসি পাণ্ডব!)

মূল রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা না থাকলেও বাঙালী কবি কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে তাঁর রামায়ণে (১৩৪০ শকাব্দ) রামচন্দ্রের অকাল বোধনের কথা যা লিখেছেন, তার কয়েক লাইন "দেবীর নিকটে শ্রীরামের বর লাভ এবং দশমী পূজার অন্তে বিসর্জন" থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

অকাল বোধনে পূজা কৈলে তুমি দশভূজা
বিধিমতে করিলে বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য আমারে করিতে ধন্য
অবনীতে করিলে প্রকাশ॥
রাবণে ছাড়িনু আমি বিনাশ করহ তুমি
এত বলি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নাচে গায় কপিগণ প্রেমানন্দে নারায়ণ
নবমী করিলা সমাধান॥
দশমীতে পূজা করি বিসর্জিয়া মহেশ্বরী
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।
আদেশ পাইয়া রাম সিদ্ধ কৈল মনস্কাম
চণ্ডীলীলা মধুর ভারতী॥

দেবীভাগবতে (৩য় স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়) দেখা যায় যে দেবী দুর্গা প্রথমে কোশলে প্রখ্যাতা ও পূজিত হন। তারপর ভারতের সর্বত্র সর্ব বর্ণের মধ্যে তাঁর পূজা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু বর্তমানে ঐ সকল দেশে মূর্তি নির্মাণ করে দুর্গা পূজা হয় না দুর্গার বিরাট প্রতিমা তৈরী করে বাঙলাদেশে দেবীর অর্চনা মহাসমারোহের সঙ্গে কিভাবে প্রবর্তিত হলো, সেটা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। রামচন্দ্র বনবাস কালে যে স্থান থেকে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, সেই প্রদেশেও বিজয়োৎসব হয় না। রামচন্দ্রের রাজ্য অযোধ্যা তথা উত্তর প্রদেশেও দুর্গা পূজা হয় না; সেখানে একমাস ধরে বিজয়োৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়া দশমীর দিন দশাননের এক বিরাট মূর্তি তৈরী করে আগুন দিয়ে সেটিকে পোড়ানো হয়।

মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুদের পূজা করার কোনো উপায় ছিল না বরং হাজার হাজার দেবমন্দির মুসলমানরা ধ্বংস করে। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির বা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। বাঙলা দেশে রাজা গনেশ ও তারপর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুসলমান আমলে সর্বপ্রথম দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন বলে শোনা যায়। কেহ কেহ বলেন তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায় শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্তক। প্রবর্তক রাজা গণেশ বা রাজা কংসনারায়ণ যেই হোন বাঙলাদেশে পূর্বে মৃন্ময়ী দুর্গা পূজা কখনও হয়নি। যদিপ কোন কোন বাড়িতে ওই পূজা হতো, তাও ঘট স্থাপনা করে নমঃ নমঃ করে পূজা হতো। পরে রাজা মহারাজাদের দেখে, তাদের অনুকরণে আমাদের দেশের বড বড ভূমধ্যকারীগণ তাদের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি দেখাবার জন্য শরৎকালে এই দুর্গা পূজার প্রবর্তন বা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে শারদীয়া পূজা বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকে আমাদের দেশে বড়লোকদের বাড়ি প্রথম বিস্তৃতি লাভ করে।* তারপর ক্রমশঃ দুর্গা পূজা শহর, আধাশহর, গণ্ডগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি ছাড়া মাঠে ঘাটে হাটে বাজারে হাজারে হাজারে বর্তমানে সার্বজনীন পূজাও খুব জাক জমকের সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমান ধারায় মূর্তি নির্মাণ করে দুর্গা পূজা পাঁচশো বছরের বেশী বাঙলা দেশে প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয় না। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব বাঙালীর এই দুর্গোৎসবকে বলেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ পূজা। তিনি লিখেছেন:

It has no superior for magnificience of entertainment and

---

* সেকালের দুর্গোৎসব—সুধীরকুমার মিত্র; বেতার জগৎ (২২।৯।১৯৭১) দ্রষ্টব্য।

imposing appearance.

দুর্গা নামের তাৎপর্য হচ্ছে যাকে দুঃখে কষ্টে লাভ করা যায়। দুর+গম+ +ড=দুর্গা; দুর্গ+আপ্=দুর্গা। কিন্তু পুরাণে দুর্গা নামক দৈত্যকে বধ করার জন্য, দুর্গা নাম হয়েছে বলে লেখা আছে। সুদূর অতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে হিন্দুদের চিন্তারাজ্যে দুটি ধারা বিদ্যমান—বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক ধারার ভিত্তি হচ্ছে বেদ ও উপনিষদ আর তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি হচ্ছে তন্ত্র-গ্রন্থ। বৈদিক ধারার পূর্ণতা গীতায় আর তান্ত্রিক ধারার পরিণতি হচ্ছে সপ্তশতী চণ্ডীতে। বেদের অপর নাম নিগম আর তন্ত্রের অপর নাম আগম। দুটির অর্থ মূলতঃ এক এবং উভয়েই নিখিল জ্ঞান ভাণ্ডারে। ঋষির দৃষ্টিতে উভয়ই অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ ইহা রচনা করেননি। যদিও দেব পূজা শাস্ত্রমতে উপাসনার নিম্নতর স্তর, তথাপি স্তরভেদে দেবপূজা কিন্তু অনস্বীকার্য। কালক্রমে পূজায় যে সব বিধি প্রবর্তিত হয়েছে, সে সব বিধি কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত নয়। মহাভারতে শান্তিপর্বে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, সুরা, মৎস, মধু, মাংস, আসব ও খেচরী প্রভৃতি ধূর্তগণের দ্বারা দেবপূজায় প্রবর্তিত হয়েছে। বেদে এসব কথনও উপদিষ্ট হয় নি।

দুর্গা পূজা বলতে বস্তুতঃ কি বোঝায়? মহামায়া দুর্গা হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির কারণ, রজোগুণের পূর্ণ প্রতীক। তাই আসুরিক শক্তির ধ্বংস শারদীয়া পূজার একমাত্র লক্ষ্য। তমোগুণকে দলিত করে রজোগুণরূপিণী মহামায়ার তাই সিংবাহনে আবির্ভাব; মহিসাসুর হচ্ছে তমোগুণের প্রতীক। চণ্ডীতেও এই পূজার কোন কথা নেই। ইহা সম্পূর্ণরূপে পরবর্তীকালে তামসিক পুরাণের পরিকল্পিত কল্পনা। মহাকবি কৃত্তিবাস তামসিক পুরাণের অনুসরণ করে তাই রামচন্দ্রের প্রসঙ্গটি কল্পনা করে তাঁর মহাকাব্যে সন্নিবদ্ধ করে দিয়েছেন। হিন্দিকবি তুলসীদাস কিন্তু তাঁর রামায়ণে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন নি। দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপ কল্পনা ও আরাধনার দিক বিচার করলে একটা সাধারণ জিনিস চোখে পড়ে যে, সেখানে যেমন আছে আত্মমুক্তি ও সমষ্টি কল্যাণের ইঙ্গিত, তেমনি আছে দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। দুর্গার উপাসনাকে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির জন্য কেবল প্রার্থনা হিসাবে না ভেবে, দেবীকে আমাদের অতীত বর্তমানের আধার হিসাবে ভাবতে হবে। দেবী প্রতিমার মধ্যেই আমাদের সংস্কৃতি ঐশ্বর্য ও গৌরব গাথার ইতিহাস যেমন ঘনিভূত, তেমনি তাঁরই মধ্যে নিহিত আছে আমাদের বাঙালীদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা।

কেবল দেবী দুর্গার কাছে ধন দাও, যৌবন দাও, রূপ দাও, যশ দাও, শত্রু নিপাত যাক্ এই উপাসনা আত্মকেন্দ্রিক; এতে পারমার্থিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের নিম্নোক্ত স্তবই অনন্ত জীবনের পাথেয় স্বরূপ আমাদের শারদীয় পূজার একমাত্র মন্ত্র হোক।

দুঃখে দুঃখহারা তারা দুর্গতিনাশিনী।
দুর্গমে সরণি বিন্ধ্যগিরি নিবাসিনী॥
দুরারাধ্য ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী।
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী॥
নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎ সারা মূল শক্তি সচ্চিদা সাকারা॥
মহিষমর্দিনী মহামায়া মহোদরী।
শিবসীমন্তিনী শ্যামা সর্বাণী শঙ্করী॥
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী সারদা শাকম্ভরী।
ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমঙ্করী॥
কালী কালহরা কালাকালে কর পার।
কুলকুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার॥
লম্বোদরা দিগম্বরা কলুষনাশিনী।
কৃতান্তদলনী কাল উরোবিলাসিনী॥

বঙ্গে দুর্গোৎসব

বাঙলা দেশে দুর্গাপূজা যেরূপ মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়, তাহাতে এককথায় ইহাকে এক বিরাট মহোৎসব বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর কোন স্থানে বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এইরূপ মহোৎসব আর দেখা যায় না। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্যন্ত নবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ স্থানে পূজক ঘট স্থাপন

পূর্বক সামান্য আয়োজনে পূজা করেন। নেপালেও এই সময় কলাগাছ দিয়া নবপত্রিকার পূজা হয়। এতদ্ব্যতীত মিথিলায় দেবী উমার, কাণ্যকুব্জে কল্যাণীর, দাক্ষিণাত্যে অম্বিকার, কাশ্মীরে অম্বার এবং গুজরাটে রুদ্রানীর পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। নবপত্রিকার পূজা ও নবরাত্রিব্রত এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেবীর অর্চনা দেখিয়া মনে হয় যে, সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষে দেবীর মহিমা পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু দেবীর মহিমা ভারতের সর্বত্র পরিজ্ঞাত থাকিলেও, বঙ্গদেশের ন্যায় বিরাট মূর্তি নির্মাণ করিয়া দশভূজা দেবীর পূজা করিতে আর কোথাও দেখা যায় না।

যাঁহাকে অতি কষ্টে লাভ করা যায় তিনিই দুর্গা—ইহাই দুর্গা নামের তাৎপর্য্য! দুর+গম+ড=দুর্গা; দুর্গ+আপ্=দুর্গা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, দুর্গ নামক দৈত্য ও মানবের সকল দুর্গতি নাশ করিবার জন্যই দেবীর নাম হইয়াছে দুর্গা। (প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অধ্যায়) সুতরাং এই শাস্ত্রোক্ত তাৎপর্যই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

ব্রহ্মশক্তিরূপা দেবী উমা কি জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবমহিষী হইলেন এবং কেনই বা তিনি স্বয়ং দৈত্য বধে অবতীর্ণা হইলেন, সে সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে যাহা বর্ণিত আছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল:

মহাযোগী শিব বিবাহ করিতেছেন না বলিয়া, ব্রহ্মা তাঁহাকে বিবাহ করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তিনি প্রজাপতি দক্ষকে বলিলেন, তুমি জগন্ময়ী মহামায়ার পূজা কর ও তিনি যেন তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন। দক্ষ বহুকাল তপস্যা করিবার পর দেবী তুষ্টা হইয়া তাহার পত্নী বীরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন, তাহার আরাধনায় গুণে ও রূপে মুগ্ধ হইয়া শিব তাঁহাকে বিবাহ করেন।

তাঁহাদের বিবাহের কিছুকাল পরে দক্ষ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং উক্ত যজ্ঞে শিব ও সতী ব্যতীত সকল দেব দেবীর নিমন্ত্রণ হয়। যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না হওয়ায় ক্ষোভে ও লজ্জায় সতী দেহত্যাগ করেন। সতীর দেহ ত্যাগে শিব শোকাকুল হইয়া দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করেন এবং সতীর মৃতদেহ লইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করেন। পথিমধ্যে সতীর দেহের অংশ ভারতের যে সকল স্থানে পতিত হয়, তাহাই মহাপীঠ হইয়া যায়।

কিছুকাল পরে মহাদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় যোগমগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে

গিরিরাজ-পত্নী মেনকার প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণনবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া তিনি কালী নামে খ্যাত হইলেন। নারদের উপদেশে গিরিরাজ যোগেশ্বর শিবের নিকট যাইয়া তাঁহার পূজা করিলেন এবং পূজান্তে কন্যাকে শিবের সেবার জন্য রাখিয়া আসিলেন, কিন্তু কালী বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াও শিবের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারিলেন না।

এই সময় তারকাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া দেবগণকে ভীষণ পীড়ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন যোগেশ্বর শিবের ঔরসে এক মহাবীর্য্যবান পুত্র উৎপন্ন না হইলে স্বর্গরাজ্যে শান্তি স্থাপন এবং তারকাসুরকে বধ করা যাইবে না। সুতরাং দেবগণ মদন ও রতিকে মহাদেবের যোগভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন; মহাদেব ইহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। পার্বতী অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা কালী শিবের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি; তপস্যা করিতে করিতে তিনি ক্ষীণা হইয়া গেলেন, তথাপি উপাসনা ত্যাগ করিলেন না। শিব পার্বতীর একনিষ্ঠতা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখন উভয়ের বিবাহ হইল।

বিবাহের পর উর্বশী প্রভৃতি নর্তকীগণ শিবের নিকট আসিতেছেন শুনিয়া শিব 'অঞ্জনশ্যামলে কালি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া, উজ্জ্বলরূপা নারীগণকে অভ্যর্থনা করিতে বলায়, পার্বতী বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন এবং 'গৌরবর্ণা' না হইলে আর আপনার নিকট আসিব না বলিয়া, আকাশ-গঙ্গার নীচে যাইয়া উপবিষ্টা হইলেন এবং শত বৎসর প্রপাত জলে ধৌত হইবার পর গৌরবর্ণা হইয়া শিবের সহিত পুনঃ মিলিত হইলেন। ইহার পর কার্তিক জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার হস্তেই তারকাসুর নিহত হন।

কালক্রমে দেবীর দ্বিতীয় পুত্র হইল। ইনি বসু রুদ্র প্রভৃতি গণদেবতাদের অধীশ্বর হইয়া গণেশ নামে খ্যাত হইলেন। শনির কোপে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইলে একটি হস্তি মুণ্ড তথায় সংযোজিত করা হয় বলিয়া, তিনি গজানন নামে প্রসিদ্ধ। সিংহবাহিনী দেবীর উভয় পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া নামে যে দুই দেবী আছেন, তাঁহারা দুর্গার সখী জয়দায়িনী, ইঁহারাই লক্ষ্মী ও সরস্বতী রূপে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, অসুর বিনাশের জন্য দেবী দুর্গা অন্যান্য দেবীগণ সহ অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়া সর্বপ্রথম বিন্ধ্যপর্বতে আবির্ভূতা হন; সেইজন্য তিনি উক্ত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ "বিন্ধ্যবাসিনী" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

সুতরাং বিন্ধ্যবাসিনীরূপে যে দেবীর পূজা ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল, তাহা দেবীদুর্গা। কেবল ভারতবর্ষে নহে, সুদূর যবদ্বীপেও সম্প্রতি দশভূজা মহিষমর্দ্দিনীর প্রস্তরময় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'দেবী ভাগবতে' লিখিত আছে যে, দেবী দুর্গা সর্বপ্রথম কৌশল নগরে পূজিতা হন; তৎপরে ভারতের সর্বত্র এই মহাপূজা প্রবর্তিত হয়। কৌশলে বা ভারতের অন্যান্য স্থানে, প্রাচীনকালে দুর্গাপূজা প্রচলিত থাকিলেও, বর্তমানে একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও দুর্গোৎসব হয় না।

বঙ্গদেশে প্রতিমা নির্মাণ করিয়া দেবীর অর্চ্চনা সর্বপ্রথম দিনাজপুরের রাজা গণেশ প্রবর্তন করেন।* রাজা গণেশ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন এবং বর্তমান দিনাজপুরের মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুরের তিনি পূর্বপুরুষ। রাজা গণেশের পূর্বেও বঙ্গদেশে যে দশভূজার মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল, তাহা পাল রাজাগণের রাজত্বকালে নির্মিত একটি প্রস্তর-মূর্তির আবিষ্কারে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত দশভূজার মূর্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর শরৎকালে মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ পূর্বক দুর্গাপূজা করিয়া পরে দেবীর মূর্তি বিসর্জ্জন দিবার নিয়ম রাজা গণেশ কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। রাজা গণেশের পর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই মহাপূজার অনুষ্ঠান করেন; তৎপরে তাঁহাদের অনুকরণে বঙ্গের বড় বড় জমিদারগণ এই পূজার প্রচলন করেন এবং ক্রমে ক্রমে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করে।

মুসলমান রাজত্বকালে বহু অর্থশালী ব্যক্তির দুর্গাপূজা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও মুসলমানগণের ভয়ে পূজা করিতে পারিতেন না। কারণ তৎকালে যেরূপ অরাজকতা বঙ্গদেশে বিরাজিত ছিল; সেরূপ অরাজকতা পৃথিবীর কুত্রাপি হয় না। যদি শাসনকর্তা একবার জানিতে পারিতেন যে, অমুক ব্যক্তির বহু অর্থ আছে এবং তিনি সমারোহের সহিত দুর্গাপূজা করিয়াছেন, তাহা হইলে ছলে-বলে-কৌশলে তাঁহার অর্থ সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইত। সেইজন্য বঙ্গদেশে বহু ব্যক্তি প্রতিমা না আনিয়া ঘটে পূজা করিতেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। বঙ্গদেশের মধ্যে ভাগীরথীর দুই পার্শ্বে প্রতি গ্রামে, যেরূপ দুর্গাপূজা হইত এইরূপ আর কোথাও হইত না। দুর্গাপূজা বঙ্গদেশে কতদিন যাবৎ

---

* প্রথম দুর্গাপূজা কে করেছিলেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ বলে সঠিক নামটি এখন উদ্ধার করা খুবই কঠিন।

অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই সম্বন্ধে একটি সংবাদ ১২৪০ সালের ১৮ই কার্তিক তারিখে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে উক্ত সংবাদটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বঙ্গদেশের দুর্গোৎসব কিরূপ প্রাচীন তাহাই প্রমাণিত হইবে।

"এ দেশের রীতি ব্যবহার নূতন কিছুই হয় নাই। ঐ প্রথা (দুর্গাপূজা) বহুকালাবধি আছে। পূর্বে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন তৎকালে ভদ্রলোক দুর্গোৎসব না করিতেন, এমত লোক অত্যল্প পাওয়া যাইত। সর্বত্র প্রতিমা না হউক ঘট পটাদি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলাদিতে হইত। যবনাধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল। এ প্রদেশে বহুতর হিন্দু জমিদার আর রাজাই বা কহ ইহারা থাকাতে উক্ত কর্ম লোপ হয় নাই। বিশেষ নদীয়া, নাটুর, বর্দ্ধমান এই তিন চারি জন রাজার অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশ বিভক্ত। ইহাদিগেব অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত, তিনি পূজা না কবিলে রাজারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন পূজা অবশ্যই করিবে। এপ্রকারে কেহ কেহ পূজা করিতেন। যদ্যপি কেহ এমত রাজাদিগকে বুঝাইতে পারেন যে, আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই, তাহার পূজার ব্যয়োপযুক্ত ধন দান করিতেন, কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিরকাল পূজা করিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি ধনবান অথচ পূজা কবে না, তাহাদিগকে বাটীতে প্রতিমা রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায়। ঐ গৃহস্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রতিমা গৃহ মধ্যে উঠাইয়া রাখিয়া আপনাকে ধন্য করিয়া মানে এবং তাহার পরিবারাদি জ্ঞান করে ভগবতী আপনি কৃপা করিয়া আসিয়া-ছেন অতএব যথাবিধি অবশ্য পূজা কর্তব্য। সে ব্যক্তির বাটীতে পূজার ব্যয় অল্প বা অন্য কোন প্রকার অপ্রতুল হইলে তাহার দোষ কেহই করে না। এপ্রকার প্রথা বহুকালবধি আছে। ইহাতে দোষ মাত্র হয় না এবং কখন কেহ প্রতিমা পাইয়া নিতান্ত কষ্ট হইয়াছে এমত কেহ বলিতে পারিবেন না কিম্বা সেই প্রতিমা বাটীতে ফেলিয়াছে বলিয়া যে বাটীর কর্ত্তা কাহার নামে নালিশ করিয়াছে কিম্বা কেন ঐ প্রতিমা পূজা করিতে অশক্ত হইয়া প্রতিমা অমনি বিসর্জ্জন করিয়াছে কিম্বা প্রতিমা পূজা করিয়া একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমন কখন শুনা যায় নাই।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বঙ্গদেশে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় সর্বপ্রথম বার জন ব্রাহ্মণ মিলিয়া এক পূজা করেন, ইহাই বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম

সার্বজনীন পূজা। বার জন ব্যক্তি একত্রে পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন বলিয়া ইহাই 'বারোয়ারি পূজা' বলিয়া খ্যাত হয়। অতঃপর গুপ্তিপাড়ার পূজা দেখিয়া বল্লভপুর, কোন্নগর, উলা, চাকদাহ, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানেও মহাসমারোহের সহিত সার্ব্বজনীন পূজা সুসম্পন্ন হয়। এই পূজার জন্য বহু দূর দেশ হইতেও চাঁদা সংগ্রহ করা হইত এবং পূজার সমারোহ লইয়া গুপ্তিপাড়ার সহিত উলা, শান্তিপুরের অধিবাসীদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগীতা হইত। এক বৎসর শান্তিপুরের পূজার জন্য এক অতিকায় দশভূজা মূর্তি প্রস্তুত করা হয় এবং এই প্রতিমার গণেশের উদর তৈয়ারী করবার জন্য একটি বৃহৎ ঢাকাই জালার প্রয়োজন হইয়াছিল। গণেশের অনুপাতে দুর্গা ও কার্তিকাদির মূর্তিও যথারীতি গঠিত হয় এবং উক্ত প্রতিমার আরতির সময় পুরোহিতকে কপিকলের সাহায্যে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া তবে আরতি সমাধা করা হইয়াছিল। বিসর্জনের সময় সমারোহের সহিত প্রতিমা লইয়া যাইবার কালে, গাড়ীর চাকা মাটিতে বসিয়া যায় এবং অবশেষে প্রতিমাগুলিকে কাটিয়া কাটিয়া পৃথকভাবে বিসর্জ্জন দিতে হয়। উলার বারোয়ারীর পাণ্ডাগণ শান্তিপুরের এই ঘটনার পর একটি গণেশ মূর্তি গড়িয়া তাঁহাকে অশৌচের বস্ত্রাদি পরাইয়া শান্তিপুর শহর ঘুরাইয়া আনিলেন ও সর্বসাধারণকে জানাইলেন, "আমাদের গণেশের মাতার শান্তিপুরে অপমৃত্যু হইয়াছে, আপনারা গণেশকে কিছু ভিক্ষা দান করুন. গণেশ তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবেন।" বলা বাহুল্য উলার ব্রাহ্মণগণ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নির্দ্ধারিত দিনে গণেশের দ্বারা মাতৃশ্রাদ্ধ করাইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকদিগকে যথোপযুক্ত বিদায়ও দেওয়া হয়।

বারোয়ারী বা সার্বজনীন পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে The Friend of India নামক পত্রে On the Present Celebration of the Hindoo Poojas শীর্ষক প্রবন্ধে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ উল্লিখিত হইল :

"A new species of Pooja which has been introduced into Bengal within the last thirty years ago, at Gooptipara near Santipore. a town celebrated in Bengal for its numerous colleges, a number of Brahmins formed an association for the celebration of a pooja independently of the rules of the Shastras. They elected twelve men as a committee,

from which circumstance it takes its name, and solicited subscriptions in all the surrounding villages. Finding their collections inadequate, they sent men into various parts of the country to obtain further supplies of money, of whom many, according to current report have never returned. Having thus obtained 7000 Rupees, they celebrated the worship of Jugudhatree for seven days with such splendor, as to attract the rich from a distance of more than a hundred miles. The formulas of worship were of course regulated by the established practice of Hindoo ritual, but beyond this, the whole was formed on a plan not recognised by the Sastras. They obtained the most excellent singers to be found in Bengal, entertained every Brahmin who arrived and spent the week in all the intoxication of festivity and enjoyment. On the successful termination of the scheme, they determined to render the Pooja annual, and it has since been celebrated with undeviating r. gularity."

অনুবাদ : বাঙলা দেশে বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এক নূতন ধরনের পূজা নানা মহাবিদ্যালয়ের দ্বারা অধ্যুষিত সুপ্রাচীন শহর শান্তিপুরের কাছে গুপ্তি-পাড়ায় প্রবর্তিত হইয়াছে। কয়েকজন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুমোদন না করিয়া সংঘবদ্ধভাবে এই পূজা করেন। তাহারা বার জন ব্যক্তিকে লইয়া একটি সমিতি করেন বলিয়া উহার নাম হয় বারোয়ারী এবং তাহারই চতুঃস্পার্শস্থিত গ্রাম সমূহ হইতে পূজার চাঁদা আদায়ের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু চাঁদা আদায় পর্যাপ্ত না হওয়ার পর তাহারা দেশের নানাস্থানে আরো চাঁদা সংগ্রহের জন্য লোক পাঠান, তাহার মধ্যে অনেক আদায়কারী আর ফিরিয়া আসেন নাই বলিয়া শ্রুত হয়। ওই ভাবে ৭০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহারা সাত দিন ধরিয়া এইরূপ সমারোহ ও জাঁকজমকের সহিত জগধাত্রী পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে শতাধিক মাইলের দূরবর্তী স্থান হইতে বহু ধনী ব্যক্তিদের ইহা আকর্ষণ করিয়াছিল। পূজার অনুষ্ঠান পদ্ধতি হিন্দু শাস্ত্র মত হইলেও সমস্ত কিছু হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের নিজস্ব মতলব অনুসারে। পূজা

উপলক্ষে তাহারা বাঙলার বিশিষ্ট গায়কদের অনিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দূর-দূরান্তর হইতে পূজার উৎসবে ও আনন্দে কয়দিন ধরিয়া মত্ত হইয়াছিলেন উহাদের সকলকে অনুষ্ঠাতাবৃন্দ অতিথিরূপে সবিশেষ আপ্যায়িত করেন। পূজা শৃঙ্খলার সহিত সমাপ্ত হইলে পর তাহারা স্থির করেন যে, প্রতি বৎসর এইরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন এবং তদবধি তাহারা নিয়মিতভাবে জগদ্ধাত্রী পূজা করিতেছেন।

চুঁচুড়া শহরের দুর্গাপূজা বঙ্গের এক বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু ছিল; কারণ চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় একটু খামখেয়ালী ধরণের লোক ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তিনি দুর্গোৎসব করেন। তিনি দুর্গোৎসবে সোনার এবং রূপার থালা-বাটি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে দান করে তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর দুর্গাপূজার সুবৃহৎ দুর্গা-দালান চুঁচুড়ার এক দর্শনীয় বস্তু, বর্তমানে তাঁহার দুর্গা-দালান ও ঠাকুর বাড়িতে হুগলী মহসীন কলেজে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল; নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল:

"কীর্তির্যস্য স জীবতি॥ পরম্পর শুনা গেল যে সংপ্রতি মোকাম চুঁচুড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতি বাহুল্যরূপে হইয়াছিল। তাহার শৃংখলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত থালা গাড়ু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন—তাহা সর্বত্র এক দৃষ্টান্তস্থলের ন্যায় হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই। ইহাতে বাবু মহাশয়ের ও অধ্যক্ষ সকলে অবশ্য ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কলিকাতা, ভবানীপুর, চুঁচুড়া, নপাড়া, চন্দননগর প্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কায়েস্থাদি এবং ইংরাজ প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছে।"*

বঙ্গদেশে ধনাপবাদের ভয়ে বহু ধনী ব্যক্তি প্রতিমা করিয়া পূজা করিতেন

---

*সমাচার দর্পণের সংবাদগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

না, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে দেশের তৎকালীন যুবক সম্প্রদায় কৃপণ ব্যক্তিদের গৃহে রাত্রে প্রতিমা ফেলিয়া, তাহাদের অর্থ ব্যয় হইতেছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাঁহারা গুপ্তভাবে চাঁদা তুলিয়া প্রতিমা তৈয়ারী করাইতেন এবং রাত্রে গোপনে প্রতিমা রাখিয়া দিতেন। চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এই তিন দিন বহু বাড়িতে রাত্রে চণ্ডীমণ্ডপে পাহারা রাখা হইত। অর্থ-দণ্ড করাইবার জন্য প্রতিমা ফেলিয়া যাইলেও, ইহার দ্বারা বঙ্গদেশে পূজার প্রসার যে যথেষ্ট হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তৎকালে বঙ্গদেশে ইহা লইয়া বহু আন্দোলন হইয়াছিল; নিম্নে ১২৪০ সালের ২৭শে আশ্বিন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল।

"এই সপ্তাহে আমরা যে এক পত্র প্রকাশ করিলাম, তাহাতে অধিক রাত্রিযোগে গৃহস্থ লোকেদের দ্বারে দ্বারে দেব প্রতিমা বিশেষতঃ ৺দুর্গা প্রতিমা ফেলিয়া দেওয়ার যে অতি কদর্য্য ব্যবহার দিন দিন বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে তদ্বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। তাহার অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক গৃহস্থই এই পূজা করেন। আমাদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়েরা বুঝি এতদ্বিষয় জ্ঞাত না থাকিবেন অতএব লিখে যে এতদ্ক্রমে কোন গৃহস্থের দ্বারে অশিষ্ট যবিষ্ট ভুয়িষ্ট দুষ্ট কর্তৃক প্রতিমা নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা লইয়া ঐ গৃহস্থের পূজা না করিলে নয়। ঐ উৎসব সময়ে সুতরাং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কর্ম্মে নানা ব্যয় করিতে হয়। অতএব বিধি বোধিত পূজার ন্যায় এই পূজা না করিলে লৌকিক অসম্মান আছে। বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক গণ্ডগ্রামে কৃপণ ব্যক্তির এতদ্রূপে অর্থ দণ্ড করা হয়। প্রতিমা অধিক রাত্রিযোগে তাঁহার দ্বারে নিক্ষিপ্তা হইলেই তৎকার্য্য ন্যূনাধিক ৫০-৬০ টাকাতেও নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। এক রাত্রির মধ্যে ৫।৬ খান প্রতিমা যাহাদের ধনাপবাদ আছে এমত ব্যক্তিদের গৃহ দ্বারা দিতে নিক্ষিপ্তা হইয়াছে। কিন্তু কেবল কৃপণ ব্যক্তিদের উপরেই এই ভার চাপান যায় এমতও নহে। কখন কখন অতিপরিমিত ব্যয়ি সদ্বিবেচক যিনি স্বীয় ক্ষেত্র বুঝিয়া সাধারণ কর্ম্মে ব্যয় করেন ঈদৃশ ব্যক্তির উপরেও কতকগুল পাগল বালকেরা এইরূপ ভার দিয়া ক্লেশ দেয়।"

আধুনিক সার্বজনীন পূজার উদ্ভব কলিকাতায় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়; হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার অব্যবহিত পর হইতে সিমলা ব্যায়াম সমিতি এইরূপ বারোয়ারী পূজার প্রবর্তন করেন; তারপর এই কয় বৎসরের মধ্যে

সমগ্র বঙ্গদেশে এই সার্বজনীন পূজা যে কিরূপভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। একমাত্র কলিকাতা ও শহরতলীতে দেড় হাজারের অধিক পূজা সমারোহের সহিত গত বৎসর সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গের এমন কোন গ্রাম নাই যে স্থানে এই পূজা বর্তমানে হয় না।

দেবী দুর্গা সর্বশক্তির প্রতীক স্বরূপ; ইহাতে অসুর সিংহের দ্বন্দ্ব এবং জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল ও সিদ্ধিরূপে কল্পিত সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক ও গণেশ বিরাজিত। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচিত সিদ্ধ মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে মাতৃ কল্পনার যে রূপ দিয়াছেন, পশুবল ও অসুরিক ভাবকে দমন এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই যেন আমাদের এই দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীভগবানের নিকট ইহাই আজ বঙ্গবাসীর কামনা ও প্রার্থনা।

বন্দেমাতরম্
ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারীণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং তরনীং মাতরম্

শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যা বলেছেন তা উল্লেখনীয়:

আমরা জানি, প্রকৃতি জড়া, পুরুষ চিৎ। কিন্তু দুর্গাদেবী উভয়ই, আবার তিনি ব্রাহ্মবস্তুও। সপ্তশতী পাঠের পূর্বে পাঠ্য বৈদিক দেবীসূক্তে ঐ সকল কথার উল্লেখ আছে। মূল 'চণ্ডী'তেও সে-সব কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন ব্যক্তা ও অব্যক্তা, এই উভয় প্রকার প্রকৃতি-বিদ্যা ও অবিদ্যা একাধারে মহামায়া। দেবী সকল ভূতেরই চেতনা স্বরূপা। মা এক দিকে নির্বিকল্পা, অপরদিকে সবিকল্পাও। কিন্তু চেতনা বা চৈতন্য কি ঠিক চিদ্বস্তু নহে, উহা কি চিত্তের ভাবমাত্র? ইহার উত্তর 'চণ্ডীতে আছে—'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেত-দ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ!' অর্থাৎ দেবী স্বয়ং চিৎ। কারণ, ন্যায় দর্শনের মতে 'চিতি' অর্থে নিত্যজ্ঞানবান পরমাত্মা এবং এই পরমাত্মাই পরমব্রহ্ম—একমেদ্বিতীয় ভগবান্। সুতরাং দেবী পরমাত্মারই পর্যায়ভুক্ত। আবার চণ্ডীর টীকাকার

নাগোজীর মতে 'চিতিঃ চিচ্ছিক্তিঃ'। এক্ষেত্রে দেবী শক্তিরূপিণী পরমাপ্রকৃতি, এবং তিনিই ব্রহ্মের সহিত অভিন্না।

এই দেবী দুর্গাই অজা। দেবগণের ইচ্ছাশক্তির প্রকারান্তরে তাঁহার নিজেরই ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণে দিগন্তব্যাপিনী জ্বালার মধ্যে তিনি রূপ পরিগ্রহ করেন। কারণ—'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেশরীরজম্। একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং ত্বিষা॥'

দেবী পূর্ণভাবেই স্বয়ংসিদ্ধা। তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলিব। 'চণ্ডী'তে আছে, শুম্ভ নিশুম্ভ বধের জন্য দেবতারা হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহাদের তপস্যায় পার্বতী সেখানে আসেন। তখন পার্বতীর দেব-কোষ হইতে দেবী কৌষিকী বা শিবা নির্গতা হন। তাঁহারই সহিত শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের সময়ে ঐ দেবীর ললাট-ফলক হইতে রক্তবীজ-বধকারিণী চামুণ্ডা কালিকার এবং দেহ হইতে শিবদূতীর আবির্ভাব হয়। কৌষিকী শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশ সাধন করেন।

এখানে হয়তো এইরূপ কথা উঠিতে পারে যে, এই দেবী দুর্গা যদি হিমালয়ের কন্যা না হইবেন, তবে দেবতাদের হিমালয়ে তপশ্চর্যার কারণ কি এবং পার্বতী যিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনিই বা কে? ইহার উত্তর এই যে, পার্বতী হইতেছে হিমালয়ের কন্যা সেই উমা, এছাড়াও তিনি দেবী দুর্গার অবতার বা খুব বড় রকমের বিভূতি। মূল বস্তু হইতে যাঁহারা অবতরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মূল বস্তুর অংশ কাষ্ঠফলাদি-হিসাবে বিভিন্নতা থাকে। পার্বতী, শিবদূতী, কৌষিকী, চামুণ্ডাধারীর মধ্যেও ঐরূপ বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে। হিমালয় তপশ্চরণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া দেবগণ তথায় দেবী দুর্গার আরাধনা করিলে তাহারই ফলে দেবীর অবতাররূপা পার্বতী সেখানে যান। যেখানে অবতারীরই প্রয়োজন সেখানে স্বয়ং অবতারীরই আবির্ভাব হয় নচেৎ তাঁহার দেহভূত অবতারবিশেষ কেহ আসেন।

'চণ্ডী'তে মধু কৈটভ ও মহিষাসুর বধ এই তিনটি অসুরবধের আখ্যান আছে। স্বয়ং দেবী দুর্গা হইয়া মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন কারণ শিব জম্ভাসুরের পুত্র মহিষাসুর রূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অসুর দেহ ঘুচানো অবতারের কার্য নহে বলিয়া দেবী স্বয়ং উহা করিয়াছিলেন, মধুকৈটভ-বধের হেতু ভূতা হইতেছেন দেবী দুর্গার অংশভূতা মহাকালী, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধকারিণী কৌষিকীও ঐরূপ অংশরূপা।

মহাকালী বা কৌষিকী সে স্বয়ং পরাদেবী ভগবতী দুর্গা নহেন, ইহার

প্রমাণ যামলতন্ত্রান্তর্গত 'চণ্ডী'র রহস্যত্রয়ের অন্যতম 'প্রাধানিক ও বৈকৃতিক' রহস্যেও বিশেষ বিশদ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুই রহস্যে দেবী প্রসঙ্গের অবতারণায় এইরূপ বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণময়ী পরমেশ্বরী-মহালক্ষ্মী হইতেছেন সকল অবতারের আদি, তিনি ব্যক্তভাবে ও অব্যক্তভাবে জগন্ময়ী, তিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎ শূন্য দেখিয়া কেবল তমোগুণাবলম্বনে মূর্ত্যন্তর ধারণা করিলেন, সেই তামসী নারীশ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মীকে বলিলেন, 'মা, আমার নামকরণ কর এবং আমার কর্ম কি বল, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।' তখন মহালক্ষ্মী সেই নারীশ্রেষ্ঠা তমোময়ীকে বলিলেন, 'তোমার নাম মহামায়া, মহাকালী মহামারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, একবীরা এবং দুরতিক্রমা কালরাত্রি, এই নাম সকল তোমার কর্ম সূচিত করিতেছে। তাঁহাকে এই বলিয়া মহালক্ষ্মী অতি শুদ্ধসত্ত্বা-গুণ দ্বারা চন্দ্রদীপ্তিধারিণী অন্য এক মূর্তি ধারণ করিলেন এবং তাঁহার নামাদি বলিলেন। ঐ তমোগুণাত্মিকা মহাকালীই হইতেছেন হরির যোগনিদ্রা। মধুকৈটভনাশার্থ কমলাসন ব্রহ্মা ইঁহার স্তব করিয়াছিলেন। সর্ব দেবতার শরীর হইতে যে অমিত-প্রভাবতী অবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন সেই ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মী—সাক্ষাৎ মহিষমর্দিনী। এই ঈশ্বরই সর্বদেবময়ী সত্ত্বগুণশালিনী।

মহালক্ষ্মীর দেহ হইতে উৎপন্না মধুকৈটভহন্ত্রী 'মহাকালী এবং শুম্ভনাশিনী সরস্বতী, উভয়েই অবতারমাত্র।

মহাকালী দেবী দুর্গাকে মাতৃসম্বোধন ও পুনঃ পুনঃ এই নমস্কার করিয়াছেন।

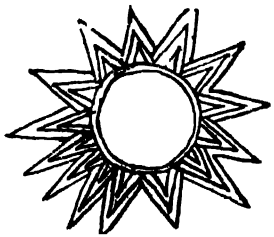

চুঁচুড়ার দুর্গা নব নব রূপে

ডাচ আমলের পুরানো শহর চুঁচুড়ার বয়স কলকাতার চেয়ে প্রায় দুশো বছর বেশি। এই শহরে স্মরণাতীতকাল থেকে যে কয়খানি প্রাচীন দুর্গাপূজা আজও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে তার মধ্যে মণ্ডলবাটি, সাধুবাটি, দত্তবাটি,

আঢ্যবাটি, পাঠকবাটি ও হালদারবাটির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। এরূপ শোনা যায়, আগে যে পূজাটি পাঠকবাটিতে হতো সেই পূজাই এখন হচ্ছে হালদার মশাইদের বাড়ি। এ ছাড়া রায়েদের প্রাচীন পূজা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সেকালের অভিজাত পরিবারগুলি সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ সমারোহের সঙ্গে দুর্গাপূজা করতেন এবং খাওয়া-দাওয়া, নৃত্যগীত ছাড়া পূজার ক'দিন হতো যাত্রা, খেমটা, ঝুমুর, বাইনাচ প্রভৃতি নানা রকমের সব মনো-মুগ্ধকর বিচিত্রানুষ্ঠান। শহরের অনুষ্ঠান দেখে গ্রামের জমিদারবর্গ পরের বছর অন্যান্য গ্রামেও সেগুলি সব পুরো অনুসরণ করতেন।

উনিশ শতকে হালদার বংশর কৃষ্ণপ্রসাদ হালদার কলকাতার ৮২ জন ধনী ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন ৩৩তম ধনীব্যক্তি। তিনি কলকাতা ছাড়া চুঁচুড়ায় পৃথকভাবে পূজা করতে আরম্ভ করেন। A Short Account of the Residents of Calcutta in the year 1822, Classified according to the Ranks of the Town নামক পুস্তকে তাঁর কথা লেখা আছে। তাঁর নীলমনি, বিশ্বম্ভর ও প্রাণকৃষ্ণ নামে তিন ছেলে ছিল। তার মধ্যে প্রাণকৃষ্ণের চুঁচুড়ায় দুর্গোৎসব বাঙলাদেশে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। প্রাণকৃষ্ণবাবুর বিলাসিতা লোকমুখে প্রবাহিত হতে হতে শেষে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। ডাঃ সুশীলকুমার দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে এটির উল্লেখ করেছেন। যথা :

"ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার॥"

প্রাণকৃষ্ণবাবু চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে বাইশ বিঘা জমির উপর পেরণসাহেব কর্তৃক নির্মিত সুরম্য প্রাসাদটি ক্রয় করেন এবং সেখানেই অনুষ্ঠিত হতো দশভূজার পূজার জন্য দশদিন ধরে মহোৎসব। প্রাণকৃষ্ণবাবুর দুর্গা পূজার বৈশিষ্ট্য যে, তিনি পূজার দশদিন বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করা ছাড়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে পর্যন্ত আহ্বান করতেন। এরূপ নজির বাঙলাদেশের কোথাও আর নেই। কলিকাতা গেজেটের (২০ সেপ্টেম্বর ১৮২৭) একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধার করে হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬৮৩) লিখেছি বলে এখানে তার পুনরুল্লেখ থেকে বিরত হলাম। তবে বিজ্ঞাপনের কয়েকটি লাইন পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। যথা:

"Every attention and respect will be paid to the Ladies

and Gentlemen who will favour him with their Company and that he will be happy to furnish them with Tiffin, Dinner, Wines etc. during their stay here (Chinsurah)."

বলা বাহুল্য তাঁর প্রাসাদেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "হুগলী মহসীন কলেজ"। বাঙলা সরকার তাঁর ভবনটি কেনেন মাত্র ২৩ হাজার ৩ শো ৩৩ টাকায়।

চুঁচুড়ায় মণ্ডলবাটির দুর্গাপূজার প্রাচীন কাহিনী হচ্ছে, দেড়শ বছর আগে (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) হুগলীর চারজন ধনী ব্যক্তি বালেশ্বরে তাঁদের জমিদারিভুক্ত কোন স্থানে যৌথভাবে দুর্গাপূজার প্রথম প্রবর্তন করেন। দু চার বছর পূজা চলার পর তাঁরা পৃথকভাবে দেবীর কাঠামো তৈরী করে নিজেদের বাড়িতে দুর্গাপূজা সুরু করেন। কিন্তু সেই কাঠামোটি পড়ে মণ্ডলবাবুদের অংশে। উক্ত বংশের পদ্মলোচন মণ্ডল বালেশ্বর থেকে চুঁচুড়ায় আসার সময় সেই প্রাচীন কাঠামোটি নিয়ে এসে এখানেই শুরু করেন সমারোহের সঙ্গে দুর্গা পূজা। এখনও মণ্ডল পরিবারের পাঁচজন প্রধান ব্যক্তি পালাক্রমে তাঁদের নিজস্ব ভবনে সেই প্রাচীন কাঠামোতে দুর্গাপূজা করে আসছেন।

চুঁচুড়ার বৈশিষ্ট্য যে এখানে দেবী দুর্গা নব নব রূপে নব নব সাজে ও নব নব ভাবে পূজিতা হন যা অন্যত্র বিরল। এখানে দশভূজা দুর্গা ছাড়া পূজিতা হন দ্বিভূজা দুর্গা। দুর্গা এই নামটি স্মরণ হলেই আমাদের মানসপটে উদিত হন—"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারীনীং" কিন্তু চুঁচুড়ায় "বহুবলধারিনী রিপুদলবারিনী মা" হচ্ছেন 'দ্বিভূজা'। পাঠকগলিতে অবস্থিত সেন বাটি ও ষণ্ডেশ্বরতলায় দত্ত পরিবারে প্রতি বছর দ্বিভূজা দুর্গা 'অভয়া দুর্গা' নামে সাড়ম্বরে পূজিতা হন। এখানে পদ্মাসনা দেবী দুর্গার দুপাশে লক্ষ্মী সরস্বতী বিরাজ করলেও নেই মহিষাসুর ও সিংহ। দেব সেনাপতি কার্তিক ও সর্ব সিদ্ধিদাতা গণেশ কিন্তু এই প্রতিমার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিমার উপরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নানা পৌরাণিক চিত্রে চিত্রিত সুন্দর একটি চালচিত্রকে ক্ষেত্রস্থ করে দেবী স্থাপিত হওয়ায় দেবীমূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় হাজায় গুণ। দেবীর দুহাতে কোন আয়ুধের পরিবর্তে আছে বর ও অভয় মুদ্রা, তাই বরাভয়দায়িনী দেবী এখানে হয়েছেন 'অভয়া দুর্গা'।

চুঁচুড়া কামারপাড়ায় আঢ্যবংশে ও কোর্ট সংলগ্ন ময়দানস্থ মণ্ডল পরিবারে দেবী দুর্গার সঙ্গে পূজিত হন সৃষ্টিস্থিতি রক্ষাকারী শিবশম্ভু। এই শিবদুর্গা পূজায় আঢ্যবংশে শিবের ক্রোড়ে দেবীকে দেখা যায়, তিনি আছেন উপবিষ্টা।

এই দু বাড়িতেই শিবের সঙ্গে বিরাজ করেন কার্তিক ও গণেশ এবং দেবীর মাথার উপর আছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি চালচিত্র। এই শিবদুর্গার পূজাও চুঁচুড়ার একটি বৈশিষ্ট্য। চুঁচুড়ায় পাঠকগণি হালদার বংশের মহিষমর্দিনী দুর্গাপূজা হুগলী জেলার অন্যতম প্রাচীন পূজা।

চুঁচুড়ার সুবর্ণবণিক বাঙলার গৌরব। সুবর্ণবণিকদের মধ্যে আছে দুটী সম্প্রদায়—রাঢ়ী ও সপ্তগ্রামী। এখানে সপ্তগ্রামী দত্তদের বাড়ি পূজা হয় অভয়া দুর্গা আর রাঢ়ী দত্ত বংশে পূজা হয় মহিষমর্দিনী দুর্গা। এ বিষয়ে সেনসাস রিপোর্টে ১৯৬১ সালে চুঁচুড়ার সুবর্ণবণিকদের সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল তার কয়েক লাইন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। যথাঃ

"Ghutiabazar a crowded quarter, largely inhabited by the well-to-do caste, the Subarnabaniks. They belong to the section known as Saptagramiya, and are said to have migrated from Saptagram some years ago".

এই প্রসঙ্গে হুগলীর সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের এক বিরাট পুরুষের নাম উল্লেখ করবো। তিনি হচ্ছেন 'ইসকনে'র প্রতিষ্ঠাতা ভারতের বাইরে দেড়শো বৈষ্ণব মঠের কর্ণধার শ্রীমদ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী। গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল অভয়চরণ দে। পিতার নাম গৌরমোহন দে। লক্ষ লক্ষ বিদেশী নর নারীকে বৈষ্ণব ধর্মে গুরুর নির্দেশে দীক্ষা দিয়ে তিনি কৃষ্ণনাম সারা পৃথিবীতে প্রচার করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬। প্রথম জীবনে তিনি কাজ করিতেন ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটারীতে। শেষ জীবনে ৬৮ বছর বয়সে মাত্র আট ডলার নিয়ে যান ১৯৬৫ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে তাঁদেঃ কৃষ্ণকথা শোনাতে। এক বছরের মধ্যে তাদের দীক্ষিত করে চৈতন্যের আদর্শে স্থাপন করেন 'ইসকন'।

হুগলীর শহর ছাড়া কয়েক হাজার গ্রাম পরিভ্রমণের সময় কত রকমের যে দুর্গা প্রতিমা দেখেছি তা বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে হয়ে যাবে আর এক মহাভারত। যদি ঠাকুর বাঁচিয়ে রাখেন তা হলে ভবিষ্যতে আরো মায়ের নাম কীর্তন করার বাসনা রইলো।

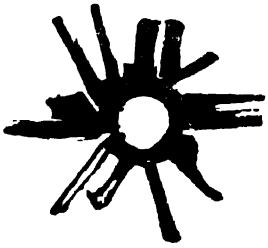

সেকালের দুর্গোৎসব

বাঙলাদেশে দুর্গাপূজা যে রকম সমারোহের সঙ্গে হয়, এ রকম সমারোহের সঙ্গে পূজা ভারতের অন্য কোন জায়গায় আর দেখা যায় না। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত নবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্রতী একটি ঘট স্থাপনা করে সামান্য আয়োজনে পূজার কাজ সমাধা করেন। নেপালে এই সময় কেবল নবপত্রিকার পূজা হয়। মিথিলায় দেবী উমার, কান্যকুব্জে দেবী কল্যাণীর, দাক্ষিণাত্যে দেবী অম্বিকার, কাশ্মীরে দেবী অম্বার ও গুজরাটে দেবী রুদ্রাণীর পূজা হয় দেখা যায়। কিন্তু মাটির বিরাট প্রতিমা করে দশভুজা দেবী দুর্গার পূজা একমাত্র বাঙলাদেশ ছাড়া আর কোথাও হয় না।

রাজা গণেশ সর্বপ্রথম বাঙলাদেশে মহাসমারোহে দুর্গার প্রতিমা করে পূজা করেন বলে অনেকে লিখে গেছেন। তারপর নদীয়ার স্বনামখ্যাত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মহাপূজা জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠান করেন। মুসলমান রাজত্বকালে দুর্গাপূজা মুষ্টিমেয় বড়লোকের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও হতো বলে জানা যায় না। যদিও বা কোথাও হোত, তা হতো ঘট স্থাপনা করে খুব সংক্ষেপে এবং গোপনে। মুসলমানদের সময়ে বড় বড় ভূম্যধিকারীগণ তাঁদের অর্থ আছে জানতে পারলে, পাছে নবাব ছলেবলে কৌশলে তা কেড়ে নেন, তাই তাঁরা খুব সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।

ইংরেজ রাজত্বে এই ধারা একেবারে উলটে গেল। কতকাতার উঠতি ধনীসম্প্রদায় ও বাঙলাদেশের জমিদারগণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকরণে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দুর্গাপূজার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশঃ এই পূজা কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ধনীগৃহে বিস্তৃতি লাভ করে।

সেকালের দুর্গাপূজা কি রকম আড়ম্বরের সঙ্গে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতো আজ তা কল্পনা করা যায় না। তার বিবরণ বিদেশীদের লেখা থেকে বা

সেকালের প্রাচীন সংবাদপত্র থেকে কিছু কিছু জানা যায়। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ২ কার্তিক ১২৩৬ সালের সমাচার দর্পণ দুর্গাপূজা সম্বন্ধে লিখেছিল: সমারোহপূর্বক এই উৎসবকরণ অল্পকাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় কেবল বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ২ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনাদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধনসম্পত্তি দর্শাইতে পূর্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।

দুর্গা পূজা সম্পর্কে ডঃ অতুল সুরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: তিনি লিখেছেন:

পুরুষ দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত ঋগ্বেদের দেবতামণ্ডলীতে আগে মাতৃদেবীর কোন স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে যখন আর্য-অনার্য সাংস্কৃতিক সমন্বয় হয়েছিল, তখনই প্রাগার্য দেবীসমূহের হিন্দু দেবতামণ্ডলীতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। বৈদিক দেবতাগণের স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু দেবতামণ্ডলীতে তাদের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে পুরুষদেবতাগণের স্ত্রীরাই পুরুষ দেবতাগণের শক্তির উৎস রূপে দেবতামণ্ডলীতে স্থান পেলেন। প্রাগার্য দেবতাগণের মধ্যে কালী ও করালীই প্রথম বৈদিক দেবতামণ্ডলীতে স্থান পান। পরে আসেন অন্যান্য দেবীরা। পৌরাণিক যুগে শিবজায়া দুর্গাই এগিয়ে আসেন দেবী হিসাবে দেবতামণ্ডলীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে। দুর্গাপূজাই বাঙালির সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব। শরৎকালে এটা অনুষ্ঠিত হয় বলে একে শারদীয়া পূজাও বলা হয়। আষাঢ় থেকে কার্তিক পর্যন্ত দেবতাদের নিদ্রাকাল, এবং এই অসময়ে দেবীর বোধন হয় বলে একে অকালবোধনও বলা হয়। পুরাণ অনুযায়ী রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় রামের প্রতি দেবীর অনুগ্রহ আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা দেবীর বোধন করেছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুযায়ী রাম নিজেই যুদ্ধের পূর্বে দেবীর বোধন করেছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে কিন্তু এসব কথা কিছু নেই।

পুরাণ অনুযায়ী রাজা সুরথই প্রথম বাংলা দেশে দুর্গাপূজা করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বালিপুর (বর্তমান বোলপুরে)। তবে কিংবদন্তী অনুযায়ী আটলক্ষ টাকা ব্যয় করে খুব জাঁকজমক করে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা বর্গীরা যখন ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল, তখন তারাও কাটোয়ার কাছে

দাঁইহাটায় দুর্গাপূজা করেছিল। তবে তারা পূজা সম্পূর্ণ করতে পারেনি, কেননা নবমীর দিন আলিবর্দি খান পাল্টা-আক্রমণ করে তাদের বাঙলা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর আমরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূজার কথা শুনি। কৃষ্ণচন্দ্রের পর কলকাতায় জাঁকজমক করে পূজা করেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। তিনিই প্রথম সাহেবদের অনুগ্রহ লাভের জন্য পূজাবাড়ীতে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে আনেন এবং তাদের নাচগান ও ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। নবকৃষ্ণের দেখাদেখি অন্যান্য বড়লোকরাও দুর্গোৎসবে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে আনতেন। এ ধারা চলেছিল ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দশসম্বরী আইন চালু করে সাহেবদের পূজাপার্বণে উপস্থিতি নিষিদ্ধ করে দেন।

ইউরোপীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে গেছে যে বড়লোকেরা পূজায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করত। তবে সাধারণ গৃহস্থ লোকেরা পঞ্চাশ-ষাট টাকাতেই দুর্গাপূজা করত, একথা শিবনাথ শাস্ত্রীও বলেছেন। তবে বারোয়ারী পূজাও হত। বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশক থেকে বারোয়ারী পূজা 'সার্বজনীন' দুর্গাপূজা নামে অভিহিত হতে থাকে। এখন গৃহস্থ বাড়ীর পূজার চেয়ে সার্বজনীন পূজোর জাঁকজমকই বেশী।

দেবাশিস, বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দর্জিপাড়ার মিত্র বাড়ির পুজোও উল্লেখযোগ্য। ভাসানের সময় আজও তাঁরা নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেন। পুরাণ ও কিংবদন্তীপ্রিয় মানুষ সেই কবে থেকে যেন বিশ্বাস করে আসছেন, প্রিয় পাখি নীলকণ্ঠ কৈলাসে উড়ে গিয়ে শিবকে আগাম খবর দেন যে, মা দুর্গা ফিরে আসছেন। লোকবিশ্বাস ও ঐতিহ্য এভাবে বংশপরম্পরায় বাহিত হতে ভালোবাসে। খিদিরপুরে ভূকৈলাস রাজবাড়ির পূজোর কথাই বলা যাক। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়নারায়ণ ঘোষাল ইংরেজি ১৭৮২ সালে কুলদেবী পতিতপাবনীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অষ্টধাতু তৈরি পতিতপাবনী হলেন দেবীদুর্গা। তিনি ঘোটকাকৃতি সিংহে আরূঢ়া মহিষাসুরমর্দিনী দশভূজা। তাঁর নিত্যপূজার ব্যবস্থা থাকলেও দুর্গাপূজোর চারটি দিন তিনি বিশেষভাবে পূজিতা হন। কিন্তু ভূকৈলাসের এই দুর্গামূর্তি ও পূজোর বৈশিষ্ট্য হল, কালীপূজোর রাতে এই মূর্তিকেই কালীমূর্তি হিসেবে সাজিয়ে পূজো করা হয়। কালীপূজোর দিন তিনি কালী। ভূকৈলাস রাজবাড়ি সূত্রে আরও জানতে পেরেছি, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর এই প্রতিমা লক্ষ্মী হিসেবে সাজানো হয়ে থাকে। শ্রীপঞ্চমীতে তিনি দেবী সরস্বতী। এমন কি ঝুলন ও জন্মাষ্টমীতে তিনি কৃষ্ণ। মাকে এভাবে সাজানোর ভার

থাকে পুরোহিতের উপর। তিনি মায়ের রূপ পরিবর্তন করে দেন।

প্রতিমার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে পটলডাঙার বসুমল্লিক বাড়ির দুর্গাপূজোর বয়স ১৫০ বছরের বেশি। এই বাড়ির দুর্গাপ্রতিমার সিংহের রঙ সাদা।

পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব বাঙ্গালীর দুর্গাপূজাকে শ্রেষ্ঠ পূজা বলেছেন। তিনি লিখেছেন :

It has no superior for magnificience of entertainment and imposing appearance.

তাঁর মতে দুর্গা হলো গ্রীক দেবী মিনার্ভা, পল্ল ও জুনোর সম্মিলিত বিগ্রহ। এই দুর্গা নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন তাঁর আসল নাম ছিল 'পার্ভুতি' (Parvuttee) কিন্তু অলৌকিক শৌর্যের দ্বারা দুর্গ নামক এক অসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করায় তাঁর নাম হয়েছে দুর্গা। এ ছাড়া তাঁর হাজারটি নাম আছে, যথা গৌরী, কালী, অম্বিকা প্রভৃতি। এই অসুর অসৎবৃত্তি আর পার্বতী হলো সৎবৃত্তির প্রতীক স্বরূপ।

স্যার উইলিয়ম জোন্স দুর্গাকে বলেছেন :

The mountain-born Goddess Parvuttee. She has many properties of the Olympian Juno ; her majestic department, high spirit, and general attributes are the same.

দুর্গা সিংহের উপর বসে, দশ দিক্ থেকে যাতে কোন বিপদ এসে তার ভক্তগণকে বিপর্যস্ত করতে না পারে, তাই দশ হাতে দশ রকমের অস্ত্র তিনি ধারণ করেছেন। ওয়ার্ড সাহেব দুর্গার অস্ত্রগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন :

The weapons she wields, are the trident (ত্রিশূল), the scimitar (খড়্গ), the discus (চক্র), the arrow (তীর), the spear (বর্ষা), the club (গদা), the bow (ধনুক), the serpent weapon (সাপ), the hook for guiding an elephant (হাতি ধরার আঁকড়া), and the axe (কুঠার) which are to show that with these ten arms and weapons, she protects the ten points.

দুর্গা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

She has one foot on Muheshu, a giant, to show that she subdues the enemies of her worshippers ; and she its on a lion, a form of Vishnoo, as a giver of success to her wor-

shippers, as existing fear in their enemies. The quarels of this goddess with Shivu, her husband, remind us of those between Jupiter and Juno, arising from the jealousy of the latter.

গ্রাণ্ট সাহেব দুর্গাকে দেবী ব্রিটানিয়ার সঙ্গে মিল আছে বলেছেন, কারণ দু'জনেই হচ্ছেন সিংহবাহিনী। তিনি দুর্গাকে হিন্দুদের একমাত্র বীর রমণী 'হিরোয়িন' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দুর্গার হাতের অস্ত্রগুলিকে 'নারীসুলভ অস্ত্রশস্ত্র' (feminine implements) বলে পরিহাস করে বলেছেন, দেবতার বদলে দেবীকে সর্বশক্তিরূপে স্বীকার করে নেওয়া কিন্তু পুরুষোচিত কাজ হয়নি। তারপর বেশ আক্ষেপের সুরে পুরুষদের সর্বকালীন অক্ষমতার জন্য বলেছেন যে, পৃথিবীতে কে কবে আর মেয়েদের কাছে না পরাজয় স্বীকার করেছেন? The impossibility of resistance to the power of woman.

সেকালে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কলকাতা ও হুগলীর ধনী অভিজাত পরিবারগুলি সাহেবদের আদর আপ্যায়নের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন তা চিন্তা করলে এখন বিস্মিত হতে হয়। ওয়ার্ড সাহেব তাঁর গ্রন্থে এক ধনী বাঙালী পরিবারে দুর্গাপূজার খরচের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি একজন ধনী হিন্দুকে জানেন, যিনি পূজা উপলক্ষে আশী হাজার পাউণ্ড সন্দেশ, আশী হাজার পাউণ্ড চিনি, এক হাজার প্রস্থ রেশমের কাপড় এবং এক হাজার থালার নৈবেদ্য (যার মধ্যে ছিল চাউল, কলা ও অন্যান্য ফলমূলাদি) দান করেন।

A wealthy Hindoo nas been known to give 80,000 lbs. of sweetmeats, 30,000 suits of cloth garments, 1,000 suits of silk, 1,000 offerings of rice, plantains and other fruits.

তাঁর হিসাবমত একমাত্র কলকাতা শহরেই আঠারো শতকের শেষের দিকে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং দুর্গাপূজার জন্য ব্যয় হতো। তখন এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং -এর দাম ছিল তের টাকার কিছু বেশী। তখন কলকাতায় সম্ভ্রান্ত হিসাবে নাম কিনতে হলে পূজায় প্রচুর মদের ব্যবস্থা ও বিখ্যাত নর্তকীদের দিয়ে নাচ দিতে হতো। কোন পূজাতে এর ব্যতিক্রম হতো না। ১৭৫৪ সালে শ্রীমতী কিন্‌সিলি লিখেছেন :

When a black man has a mind to complement a Euro-

pean, he treats him to a Nautch.

শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়িতে গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক থেকে সুরু করে কত শত ইংরেজ পান ভোজন ও বাইজীর নাচগান উপভোগ করতে আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। তখন কার বাড়িতে পূজার সময় কতজন সাহেব উপস্থিত হতেন, এই নিয়ে হতো ভীষণ প্রতিযোগিতা। কারণ তৎকালীন সমাজে অভিজাত হিসাবে জাতে ওঠার এই ছিল সোপান। সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন বলে পূজার ক'দিন সব বড়লোকের বাড়িতে পান-ভোজন ও নৃত্যগীতের বিশেষ ব্যবস্থা থাকতো। ১২৩৬ সালের ২৫ আশ্বিন 'বঙ্গদূতে'র একটি সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

শারদীয় মহোৎসব : এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে শারদীয় মহোৎসবে ত্রিবিধলোকের আলয়েই জগদীশ্বরীর পূজা হয় সকলে স্বমতে ও বিভাবানুসারে নানোপচারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন। কেহবা ইতরাঙ্গ রাগ-রঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ যজ্ঞাদি ও বিবিধোপহারে পূজা সাঙ্গ করেন কেহবা মহাঘটপূর্বক ঝাড় লণ্ঠন বাদ্য নাচ ফাচের আধিক্য পূর্বক প্রকৃত কার্য পূজা সংক্ষেপেই সারেন কেহবা উভয়েই সমান আয়োজন করেন তন্মধ্যে কতক লোক ভবন মধ্যে কিরূপ করেন তাহা দুর্গাই জানেন···যাহা হউক এ বৎসর ৪।৫ স্থানে বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত ৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনারেল লার্ড বেণ্টিক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান২ সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন পরে দুই দণ্ড পর্যন্ত নানা আমোদ ও নত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করত অবস্থিতি করিয়া প্রীত হইয়া গমন করিলেন। ইংরেজ লোকের গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটী ও ৺রামচাঁদের বাটী ও ৺দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটী এই তিন বাটীতে প্রায় ছিল অন্যত্র অত্যল্প। বিশেষত সিংহ দেওয়ানের বাটীতে পূজার চিহ্ন যোড়াসাঁকোর চতুরস্র পথে এক গেট নির্মিত হইয়া তদবধি বাটীর দ্বার পর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে আলোক হইয়াছিল তাহাতে যাঁহারা ঐ বাটীর পূজার বার্তা জানেন না তাঁহারাও ঐ গেট অবলোকন করিয়া সমারোহ দর্শনেচ্ছুক হইয়া ঐ অবারিত দ্বার ভবনে গমন করিলেন আপামর সাধারণ কোন লোকের বারণ ছিল না উপরে নীচে যাঁহারা যেখানে ইচ্ছা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নৃত্যগীতাদি স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।

১৮১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা জার্নালে' দুর্গাপূজার

একটি সুন্দর চিত্র পাঠকদের কাছে দেখানো হয়েছিল। মহারাজা রামচন্দ্র রায়, বাবু নীলমণি হালদার এবং বোষ্টমদাস মল্লিকের বাড়িতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে যে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল তা দেখে সাহেবরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এই এলাকার উৎসবে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্না নর্তকী নিকি তার সুধাকণ্ঠস্বরের মোহিনী মায়ায় সাহেবদের আবদ্ধ করেছিলেন। এবারের উৎসবে আর একজন সুধাকণ্ঠীকে উপস্থিত করা হয়। এই মোহময়ী সুন্দরীর নাম হচ্ছে নূরবকম। সাহেবরা তার রূপ ছাড়া চটুল হাসি ও অঙ্গভঙ্গীর বিশেষ প্রশংসা পঞ্চমুখে করেছেন।

মহারাজা রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির পূজায় গৃহসজ্জার বিপুল উপকরণ দেখে পাঠকদের বলা হয়েছিল যে "আরব্য রজনীর সেই বিস্ময়কর রূপ কথাকে রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতে দুর্গাপূজায় ২৬, ২৭ ও ২৮ এই তিন দিন প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবেন।"[৭]

The splendid fiction of the Arbian Nights completely realised, in the Fairy Palace of Rajah Ramchunder Ray, on the evening of the 26th, 27th and 28th instant.

১৮২৬ সালের 'ক্যালকাটা গেজেটে' (৯ অক্টোবর) বাবু গোপীমোহন দেবের বাড়িতে দুর্গাপূজার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। প্রচলিত রীতি অনুসারে অনেক সাহেব নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই উৎসবে নৃত্য-গীত পরিবেশনের জন্য সুদূর বার্মা থেকে আটজন সৌন্দর্যশালী তন্বী মেয়েকে আনা হয়েছিল। তাদের রূপ লাবণ্যে ও নৃত্যগীতে সকলে মুগ্ধ হন। এর উপর ছিল বাজিকরের কাঁচ গিলে খাওয়া ও বার ফুট উঁচুতে একটি কাঠের ঘোড়ার উপর দুপায়ে দাঁড়িয়ে তলোয়ারের নানাবিধ খেলা দেখানো।

The splendid mansion of Baboo Gope Mohun Deb, during the annual festival of Doorga Pooja, is the theatre of many a novel spectacle : his hospitality is surpassed by none, and he seldom spares any expense in providing for the gratification of his guests

On Monday evening last he entertained a very large Company of Ladies and Gentlemen of distinction, was a dance by some Burmese females. The group wa- composed

of eight blooming girls all in their teens, direct from the Empire of the Golden Foot……the dancing was accompanied by a song and a chorus which seemed intelligible to none but themselves.

চিৎপুর রোডে রূপলাল মল্লিকের নবনির্মিত প্রাসাদোপম ভবনে হাচিসন সাহেব দুর্গাপূজার আনন্দোৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। রূপলাল কলকাতার প্রায় সব সাহেবদের তাঁর বাড়িতে পদধূলি দেবার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করতেন এবং বলা বাহুল্য সাহেবরাও মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে পান-ভোজনের লোভে নেটিভদের বাড়ি যেতে কুণ্ঠিত হতেন না। হাচিসন লিখেছেন যে বাঙালীদের মধ্যে রূপলালই প্রথম দুর্গাপূজায় সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে পানভোজনে আপ্যায়িত করেন।

Rooplal was the first native who diverting himself of that bigotry which surrounds the Hindoo religion, threw open his house for the entertainment of Europeans during celebration of one of the most important Hindoo festivals, called the Durga Puja.

ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সাহেবদের নেটিভবাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হওয়া একেবারে পছন্দ করতেন না। 'ক্যালকাটা গেজেট' (৯. ১০. ১৮২৬) লেখেন: দুর্গাপূজার সময় মুসলমান বাইজী দিয়ে নাচ-গান ও ইংরেজ অতিথিদের তোষণের অত্যধিক আগ্রহ গো-মাংস ও বিয়ার খাওয়ানো দেবী দুর্গার অর্চনার সঙ্গে একেবারে মিলনক্ষম নয়, বরং পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়।

It is however, a very heterogeneous sort of business, and the performances of Mohammedan singers and dancers, with the appendages of cold beef and beer, for the grosser entertainment of European guests are little compatible with the adoration of Devi.

উক্ত সংবাদপত্র আরও বলেন: যদি আমাদের নেটিভ বন্ধুগণ মনে করে থাকেন যে, বিশৃঙ্খলভাবে একত্রিত (promiscuous mob) ইংরেজ জনতাকে মুক্তহস্তে টাকা খরচ করে (lavishing their money) পানভোজনে ও

অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে আপ্যায়িত করলেই, তারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন, তাহলে তারা মহা ভুল করেছেন। পেটুকদের শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নিষিদ্ধ বিষয়ে আসর করে (the indecorous indulgence of voracious appetite) সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না।

সাহেবরা এই সব সংবাদপত্রের সমালোচনায় কান দেননি। হাচিসন লিখেছেন, যে-সব expensive European beverage that could be thought of to excite appetite and delight পরিবেশন করা হতো, সেই আকর্ষণে তারা খবরের কাগজের কঠোর সমালোচনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো।

চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর টেক্কা দিয়ে যেভাবে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আনন্দোৎসব করেন, সে রকম উৎসব বাঙলাদেশে কেউ বোধ হয় আর করেন নি। পূজোপলক্ষে দশদিন ধরে তিনি আহুত অনাহুত প্রত্যেককে ভুরিভোজন ও নৃত্যগীতে আপ্যায়িত করতেন। প্রতি বছর লক্ষ টাকা করে তিনি পূজায় ব্যয় করতেন। বর্তমান হুগলী মহসীন কলেজ তাঁরই বাড়িতে হয়েছে। তিনি 'ক্যালকাটা গেজেটে' (২০. ৯. ১৯২৭) বিজ্ঞাপন দিয়ে বাঙলার জনসাধারণকে তাঁর বাড়ির পূজায় উপস্থিত হবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে ১৬৩ পৃষ্ঠায় কিছু লেখা হয়েছে। এখানে নিমন্ত্রণ পত্রের অংশবিশেষ কিছু উদ্ধারযোগ্য :

Baboo Pran Kissen Holdar further begs to say, that every attention and respect will be paid to the Ladies and Gentlemen who will favour him with their company, and that he will be happy to furnish them with Tiffin, Dinner, Wines etc. during their stay there. Chinsurah, September 14, 1827.

প্রাণকৃষ্ণের বিলাসিতার কথা লোকস্মৃতিতে প্রবাহিত হতে হতে শেষে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। 'সমাচার দর্পণে' (১৪ কার্তিক ১২৩২) প্রকাশিত এই সম্পর্কে একটি সংবাদ এখানে উদ্ধৃত হলো :

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥ চুঁচুড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুক্তবাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটিতে দুর্গোৎসব অতি বাহুল্যরূপে হইয়াছিল তাহার শৃঙ্খলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত থালা গাড়ু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই

ও বাটীর সজ্জা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্বত্র এক দৃষ্টান্তস্থলের ন্যায় হইয়াছে। (২৯. ১০. ১৮২৫)

প্রাণকৃষ্ণের মত সেই সময় পাঁচশো ভরি সোনা দিয়ে তৈরি দুর্গা প্রতিমার পূজা করতেন হুগলী জেলায় বৈঁচি গ্রামের জমিদার গঙ্গাধর কুমার।

১১২৭ সালে দুর্গাপূজার সময় কোন বাইজী উৎসবে যোগদান করেননি। কারণ পূজার সময় সেই বছরে মুসলমানদের মহরম পড়েছিল বলে 'সমাচার দর্পণে' (২১ অক্টোবর ১৮২০) দেখা যায়। সংবাদটি এইরূপ :

দুর্গোৎসব ॥ এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারও বাড়িতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই!

শ্রীমতী ফ্যানী পার্কস ১৮২২ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে সে-কালের কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনযাত্রার এক সুন্দর বিবরণী রেখে গেছেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় এবং এক ধনী বাঙালীবাবুর বাড়ি দুর্গাপূজায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথায় (অক্টোবর ১৮২৮) তিনি লিখেছেন :

সেদিন দুর্গাপূজা দেখতে গিয়েছিলাম একজন ধনী বাঙালীবাবুর বাড়ি। 'দুর্গা' নামে হিন্দুদের যে দেবী আছেন তাঁরই অনারে এই উৎসব হয়। বাবুর চারমহলা বাড়ি, মধ্যিখানে বিরাট উঠান। সেই উঠোনের এক পাশে উঁচু মঞ্চের উপর দেবী দুর্গার সিংহাসন পাতা। সিংহাসনের উপর দুর্গার মাটির প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চের দু'ধারের সিঁড়িতে ব্রাহ্মণেরা উপবিষ্ট, পূজার অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করতে তাঁরা ব্যস্ত।...

পূজা মণ্ডপের পাশের একটি বড ঘরে নানা রকমের সব খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য বিদেশী পরিবেশক "মেসার্স গাণ্টার অ্যাণ্ড হুপার" সরবরাহ করেছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও ফরাসী মদও ছিল প্রচুর। মণ্ডপের অন্য দিকে বড় একটি হলঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাইজীদের নাচ-গান হচ্ছিল এবং ইউরোপীয় ও এদেশী ভদ্রলোকেরা সোফায় হেলান দিয়ে, চেয়ারে বসে সুরা সহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। বাইরেও বহু সাধারণ লোকের ভিড হয়েছিল বাইজীদের গান শোনার জন্য। গানের হিন্দুস্থানী সুর সমাগত লোকজনদের আনন্দে মাতিয়ে তুলেছিল। (সুতানুটি সমাচার)

যাই হোক বাঙালীবাবুদের অপব্যায়ের ফলস্বরূপ ক্রমশ তাঁরা ফতুর হয়ে পড়লেন। তাঁদের বংশধরগণ আর পূজার মর্যাদা রাখতে পারলেন না। দুর্গা তাঁদের দুর্গতি এনে দিল। প্রাণকৃষ্ণ হালদারের জেল হলো, অনেকের বাড়ি বিক্রী হয়ে গেল, অনেকে আবার দেনার দায়ে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখালেন।

দুর্গাপূজার মধ্যে বাঙালীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে এ কথা বলেছেন প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়। তিনি লিখেছেন: বাংলার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া শক্তিপূজার আয়োজন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। দেবীপক্ষে সমগ্র ভারতেই এই সময়ে শক্তিপূজার দ্যোতনা জাগে, কিন্তু বোধ হয় বাঙলা ছাড়া মূর্তি গঠনের এমন সমারোহ ব্যাপার আর কোথাও নাই। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে যাঁহারা, তাঁহারাও বাঙলার কল্পনার মূল যদি দেখেন, তাহা হইলে শিল্প ও বিজ্ঞানের সমাবেশ দেখিয়া ইহার প্রশংসাই করিবেন। ভক্তি বিশ্বাস থাকিলে তাঁহারা শিল্প বিজ্ঞানের অতীত অধ্যাত্ম-দর্শনের মহত্বও উপলব্ধি করিবেন। বাঙালী দেবীর সহস্রনামান্তর্গত নামের মধ্যে দুর্গা দেবীর আরাধনাই বাছিয়া লইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রচিত একটি সঙ্গীত ও উদ্ধারযোগ্য:

নমি পদে দশ ভুজা

হৃদি শতদলে হের, জননী রয়েছে বসি।
ধরিত্রী ধরেছে মূর্তি চরণে লুটায় শশী॥
হের বামে বাণী-প্রভা, দক্ষিণে কমলা শোভা।
কার্তিকের, গণপতি, কেশরী অসুর-নাশী॥
কমলাকান্তের নিধি, অতল জলদ ভেদি।
সোনার প্রতিমাখানি, অধরে ধরে না হাসি॥
নমি পদে দশ ভুজা, সন্তানের লহ পূজা।
আশিস কর মা সুতে, নাশিয়া কলুষ-রাশি॥

কিন্তু দুর্গাপূজায় আমোদ-প্রমোদে তখন যাঁরা ভীষণ বিরোধিতা করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাদের অন্যতম। ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র "তত্ত্ব-বোধিনী পাত্রিকায়" লেখা হয়েছিল: দুর্গোৎসব বঙ্গবাসীদিগের প্রধান উৎসব। পৌত্তলিকতার সঙ্গে যত প্রকার দোষ থাকিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহার সকলি আছে। দুর্গোৎসবের সময় লোকের অর্থগৌরব প্রকাশ করিবার সময়। দুর্গোৎসবের সময় আমোদ-প্রমোদ অত্যাচার ও উন্মত্তার সময়।...ছাগ মহিষের রক্তস্রোতে বাদ্যধ্বনি জনকোলাহলে নয়ন ও মন আকর্ষণ করে।...দুর্গোৎসবের

উদ্যোগ অমঙ্গল উৎসবের সময়ে অমঙ্গল, এবং ইহার সমাপ্তিতেও প্রচুর অমঙ্গল দ্বারা প্রতি বৎসর এই সময়ে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এদেশে সম্বৎসরের যত দুষ্কর্ম হয়, এই তিন দিসবে তাহা সম্পূর্ণরূপে কৃত হয়। এই সকল দুষ্কর্ম স্বভাবতই অপরাধের কারণ কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে তাহারা বিষয় অপরাধের হেতু হইয়াছে।

দুর্গাপূজায় সাহেবদের আমন্ত্রণ ও তদুপলক্ষে সঙ্গীত এবং মদ্যপানের ব্যবস্থা করার জন্য সেকালের গোঁড়া হিন্দুরা বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দুর্গাপূজায় এই ধরণের আমোদ-প্রমোদের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব দুর্গাপূজা শীর্ষক একটি কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। যথা :

দুর্গাপূজা

অন্তরে অর্চনা ভক্তি করিয়া ধারণ
ধূপ দীপ দেহ যাঁরে মুক্তির কারণ ॥
নিজমতে শাস্ত্রমত করিয়া খণ্ডন।
তাঁর কাছে কর কেন ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ ॥
পূজাস্থলে বিপরীত আয়োজন নানা।
মন্দিরের মধ্যভাবে কেন দেহ খানা।
ধর্মমতে পাপকর্ম মনেতে জানিয়া।
মিছে জাঁক কেন কর সাহেব আনিয়া ॥
হায় হায় মিছে খেদ মর্ম হয় ভেদ।
হিন্দুমতে পূজা করি নষ্ট কর বেদ ॥
পূজাস্থলে 'কালীকৃষ্ণ' শিবকৃষ্ণ যথা।
যীশুকৃষ্ণ নিবেদিত মদ্য কেন তথা ॥
রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে।
দেবী পূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে ॥
বিকট প্রকট ভঙ্গি ধর্ম সব গায়ে।
দেবীর সমীপে আছ জুতা দিয়া পায়ে ॥
পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে।
সাহেব খাইলে মন মুক্তিপদ পাবে ॥

অতএব নৃপগণ এই নিবেদন।
পূজায় করো না আর ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ॥

আমাদের দেশের দুর্গোৎসবের মত ভারতের উত্তরাঞ্চলে যখন দশেরা উৎযাপিত হয়, ঠিক সেই সময়, দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর অধিবাসীরা দেবী দুর্গাকে লক্ষ্মী সরস্বতী সহ নয় দিন ধরে যে আরাধনা করেন, তাকে বলা হয় নবরাত্রি উৎসব। নবরাত্রির জন্য একটি সুসজ্জিত কক্ষে ধুপধুনা ও ফুলের মিলিত সৌরভে এক অমোদিত পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হয় পূর্বোক্ত তিন দেবী প্রতিমার। ছোট ছোট এই প্রতিমাগুলি তৈরী হয় মাটি বা কাগজের মণ্ড দিয়ে। গ্রামের কারিগররা নবরাত্রি উৎসবে এই ছোট ছোট দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীর পুতুলের মতন বিগ্রহ বিক্রয় করে তারা সারা বছরের উপার্জনের একটি বিরাট অংশ এই সময় ঘরে তোলেন।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত যা শাক্ত সম্বন্ধে লিখেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হোলো, এ থেকে শাক্ত বলতে কি বোঝায় তা জানা যাবে।

"শক্তির অর্থাৎ শিব-ভার্যার উপাসকদের নাম শাক্ত। তন্ত্র-শাস্ত্র এই সম্প্রদায়ের বিধি-নিষেধ বিস্তারে পরিপূর্ণ। তন্ত্রোক্ত উপাসনা বৈদিক উপাসনার মত নয়। তান্ত্রিক উপাসকেরা দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া মন্ত্র দ্বারা তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা পূর্বক তাঁহাকে সজীব সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে আহ্বান করেন ও পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, গন্ধ, নৈবেদ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রদান করেন ও অধিকারী বিশেষ মদ্য-মাংসাদি নিবেদন দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া থাকেন।

. শক্তি অর্থাৎ কালী তারা প্রভৃতি শিব-শক্তিই শাক্ত-সম্প্রদায়ের উপাস্য। কিন্তু সকলের ইষ্টদেবতা এক নয়, গুরু-শিষ্য-প্রণালী ক্রমে বিশেষ বিশেষ দেবতা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ইষ্ট-দেবতা বলিয়া উপদিষ্ট হন। কেহ কালী কেহ বা তারা, কেহ বা জগদ্ধাত্রী, কেহ বা অন্য দেবতার থাকেন।

তান্ত্রিক উপাসনায় গুরু-শিষ্য প্রণালী একটি পরম প্রয়োজনীয় পবিত্র বিষয়। অতএব কিরূপ লোকে গুরু ও শিষ্য হইবার অধিকারী, তাহা সকলের অবগত হওয়া মন্দ নয়।" কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন: শক্তি ব্রহ্মরূপিণী "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ।" শ্বেতাশ্বতর.(৬।৮)

তাই তাঁর বহুধা কল্পিত বিবিধ রূপ,—কালী তারা মহাবিদ্যা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যারূপে কল্পিত। এই দশমহাবিদ্যার কথা বিস্তারিতভাবে ১২১-১৩৫ পৃষ্ঠায়

বিধৃত হয়েছে। শক্তির দেশমাতৃকা রূপের কথা কবি কালীকিঙ্কর যা বলেছেন তাও উদ্ধৃত হলো।

শক্তির দেশমাতৃকা রূপ

আমাদের দুর্গাপূজায়,- ঋষি বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ গানে,—ভগবানের পূর্ণ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যময়ী মূর্তিটির পরিচয় আছে। দশদিকে তাঁহার দশ বাহু প্রসারিত তিনি বহুবলধারিণী, রিপুদলবারিণী, দশ-প্রহরণ-ধারিণী-তারিণী। মাধুর্যে তিনি দেশমাতৃকা-লক্ষ্মী, সুজলা সুফলা শীতলা শস্যশ্যামলা জ্যোৎস্না-পুলকিতা, ফুল্ল-কুসুমিতা, সুহাসিনী, সুমধুরভাষিণী, সুখদা শুভদা বরদা অন্নপূর্ণা-মূর্তি। শরীরে তুমি প্রাণ, —হৃদয়ে তুমি ভক্তি,—বাহুতে তুমি শক্তি—মর্মে তুমি ধর্ম, তাই আমাদের অন্তরে এই আদর্শ প্রতিমা—সকলের নয়ন-গোচর করিয়া সকলের অন্তরে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ঋষির কল্পনা শিল্পীর সাহায্যে— "তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে,"—রূপে রূপায়িত হইয়াছেন। এই সংকলিত প্রতিমায় অর্থসম্পদ ও সৌন্দর্যের দেবতা লক্ষ্মী আছেন —'সোহহং বা 'অহং সঃ' রূপ ব্রহ্মাংশ প্রতীতির প্রতীক হংসবাহিনী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সর্ববিধ বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবতা বাগ্‌দেবী সরস্বতী আছেন। অধিকন্তু আছেন সামরিক প্রতিভাধিকারী বিহায়সবিহারী—শৌর্যসুন্দর কার্তিকেয়,—এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তির প্রতীক স্বল্পশিরোলম্বোদর, ক্ষুদ্র-নেত্র কর্ণে বড, বৃহৎ শক্তি শ্লথগতি সর্বকার্যে সিদ্ধিদাতা গজেন্দ্র-বদন গণেশ। সর্বপশ্চাতে নেপথ্যে আছেন —আপূর্যমান, —অচল প্রতিষ্ঠ, —নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ—ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেবতাগণের পরম দৈবত, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান নিষ্কিঞ্চন শ্মশানেশ্বর শিব। আমাদের ভগবানের সংজ্ঞা হইল :

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥*

অর্থাৎ উক্ত ছয়টি সম্পদকে একত্র করিয়া তাহার 'ভগ' রূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ইঙ্গনা অর্থে ইঙ্গিতে প্রকাশিত অভিপ্রায়। এই ছয়টির অধিকারী বা অধিকারিণীকে ভগবান বা ভগবতী সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সেই দিক হইতে যুগপৎ

---

*ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানের ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এ ছয়টির মধ্যে যে কোন একটির এক কণিকা মাত্র প্রাপ্তির জন্য দেব দেবীর কাছে কামনার নামান্তরকে বলা হয় পূজা।

ভগবদ্-ভগবতী। পূজা দুর্গাপূজায় উদাহৃত হইয়াছে। তাহার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে অসুর বিজয়। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে যে দৈবীশক্তির সহিত আসুরী শক্তির সংগ্রাম ঘটিয়া আসিতেছে, যাহাতে ন্যায় নীতি ও ধর্মের জয় এবং দম্ভ দর্প ও স্বার্থান্ধ পাশবিক শক্তির পরাজয় পঞ্জীভূক্ত হইয়া আসিতেছে, —তাহারই প্রতীক বা প্রতিমা-মূর্তি আমাদের দুর্গা পূজা।

কল্পনায়—পশু শক্তিকেও দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। দৈবীশক্তি—সিংহ হস্তী, বৃষভ, ময়ূর, মরাল, পেচক, মূষিক ও সরীসৃপ শক্তিকে স্ব কার্যে নিয়োগ করা হইয়াছে। আসুরী শক্তির প্রতীক [দম্ভ, দর্প অভিমান, ক্রোধ পারুষ্য ও অজ্ঞান-গীতা ১৬/৪] মহিষকেই নির্বাচন করা হইয়াছে। মহিষমর্দিনীর বর্ণনা পাই—বলবীর্যমদোদ্ধত ক্রোধোন্মত্ত তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহিষাসুর নিধনে (চণ্ডী ৩, অ- মার্কণ্ডেয় পুরাণে)।

দুর্গাপূজায় কলা-বৌ

যে দেবী মহাশক্তিরূপে সর্বভূতে আছেন, সেই মাকে আমি প্রণাম করছি। "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" মাতৃরূপা তুমি দেবী সর্বভূতে রও মোদের প্রণাম মাতঃ প্রণাম মা লও! এটি হচ্ছে চণ্ডীর একটি মূল মন্ত্র। দেবী মাতৃরূপে কেবল আমাদের মনুষ্য, সমাজের মধ্যেই আছেন তা নয়, তিনি স্থাবর-জঙ্গম, নদ-নদী, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা সর্বত্রই বিরাজমান, সর্বত্রই তিনি মাতৃরূপে আছেন, তাই 'সর্বভূতে' এই কথাটি মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুর্গা পূজার আগে সপ্তমীর দিন দেবীর দক্ষিণে 'কলা-বৌ'-কে দেবীর প্রতিনিধি হিসাবে বৃক্ষলতার মধ্যে মাতৃত্বের দর্শন আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও দার্শনিক তত্ত্বের পরিচায়ক বলা যায়। কলা-বৌ বস্তুটি কি? এটি হচ্ছে মা দুর্গার প্রতিভূ স্বরূপ ন'টি গাছের চারাকে ন'রকম পবিত্র জলে স্নান করিয়ে শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে প্রথমে পূজা করা হয়।

এরই নাম কলা-বৌ বা নবপত্রিকা। যথা:

রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা॥

অর্থাৎ কলাগাছের চারা, কচুগাছ, হলুদগাছ, জয়ন্তীগাছ বা তাল, বেল গাছের ডাল, দাড়িম গাছ, অশোক ডাল, মানকচুর গাছ ও ধানের শিষ এই নয় রকম গাছ অপরাজিতা লতা দিয়ে বেষ্টন করে করা হয় কলা-বৌ। তারপর লাল পাড় শাড়ী পরিয়ে, মাথায় সিঁদুর দিয়ে স্নানান্তে দুর্গার প্রতিনিধি হিসাবে এর পৃথক পৃথক মন্ত্রে কলা-বৌ এর পূজা করা হয়।

প্রত্যেকটি চারার এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। উদ্ভিদ জগতেও দেবী মাতৃরূপে থেকে তিনি সর্বতোভাবে প্রত্যহ আমাদের জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের জন্য যে সহায়তা করছেন কলা-বৌ বা নবপত্রিকা হচ্ছে তারই প্রতীক এবং ঋষিদের এই রকম দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক নিদর্শন পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ব্রহ্মাণী, কচুতে কালিকা, হলুদে দুর্গা, জয়ন্তীতে কার্তিকী, বেলে শিবা, দাড়িম্বে রক্ত দন্তিকা, অশোকের দেবী শোকরহিতা, মানের চামুণ্ডা ও ধানের দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী। এরা প্রত্যেকেই দুর্গার বিভিন্ন মূর্তি বলে সমষ্টিগতভাবে এদের নবদুর্গাও বলা হয়। এইসব চারাকে এক এক রকম মন্ত্রে এক এক রকমের জলে স্নান করিয়ে তার পর পূজা করা হচ্ছে বিধি; এর ব্যতিক্রম হলে সঠিক ফল কিন্তু পাওয়া যায় না।

প্রথমত শাঁখের জলে শাঁখের যে মন্ত্র পড়া হয় তার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে: হে শঙ্খ! পূণ্যবস্তু সকলের মধ্যে তুমি পূণ্য। মঙ্গল বস্তু সকলের মধ্যে তুমি মঙ্গল। বিষ্ণু নিত্য তোমাকে ধারণ করেন। অতএব আমাকে তুমি শান্তি দান কর। (বিষ্ণুনাবিধৃতো নিত্যং)।

তারপর ঈষৎ উষ্ণজলে কলাগাছকে স্নান করিয়ে যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, তার অর্থ হচ্ছে: হে চণ্ডনায়িকা নবপত্রিকে! তুমি কলাগাছকে আশ্রয় করে আছ। কিন্তু মূলে হচ্ছ তুমি বিষ্ণুব্রহ্মবিলাসিনী (বিষ্ণুবক্ষাস্থলাশ্রয়ে) তাই বিষ্ণুর বক্ষ স্থলই তোমার আশ্রয়। বিষ্ণুর বক্ষে যে পালনী শক্তি, সেই শক্তি আছে এই কদলী বৃক্ষে। তুমি কদলীরূপে সর্বত্র শান্তি বিধান করো (রম্ভা-রূপেন সর্বত্র শান্তিং কুরু নমোহস্তুতে) হে দেবী দুর্গা তুমি পূজার সমীপস্থ হও।

ব্যাপী অর্থাৎ কূপের জলে কচুগাছকে স্নান করিয়ে কচুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকাকে বলতে হয়: দেবী কালিকে তুমি সর্বসিদ্ধিরূপে স্থাবর ভূমিতে অবস্থান

কর (স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধি প্রদায়িনী), ভক্তকে সব সময়ে তুমি সিদ্ধি দান কর। হে হরপ্রিয়ে দুর্গারূপে তুমি স্নান করে আমাদের সর্বত্র বিজয় কর (দুর্গা-রূপেন স্নানেন বিজয়ং কুরু)। আজ আমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করতে মা হরপ্রিয়ে তুমি এসো (মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে)।

হলুদ গাছের অধিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন দেবী দুর্গা; তাই শিশির জলে স্নান করিয়ে তাঁকে এই বলে অর্চনা করতে হয়: হে হরিদ্রে! শিবের মতন তোমার রূপ তুমি শঙ্কর প্রিয়ে; তুমি রুদ্ররূপে আমায় সর্বসিদ্ধি প্রদান কর (রুদ্ররূপাসি দেবী তাং সর্বসিদ্ধিং প্রজচ্ছ মে)।

তারপর পুষ্পোদকে জয়ন্তী গাছকে স্নান করিয়ে ভক্ত বলেন: হে জয়রূপা মহাদেবী! তুমি গমনশীল সকলের জয় হেতু এই পূজা গ্রহণ করে আমার গৃহের বিঘ্ন বিনাশ কর ও জয় দান কর (জয়ং দেহী গৃহে মম)। অতঃপর সর্বৌষধী জলে বেলের চারাকে স্নান করিয়ে বলতে হয় হে জগতের জয়দাত্রী! তুমি সব সময় বিজয় বুদ্ধি কর। তুমি আমার গৃহে জয় দাও (জয়ং দেহি গৃহে মম)। আমার কাম্য জিনিষ সব দাও (দেহি মে হিতকামশ্চ) হে দেবী! কার্তিকে! তুমি সতত আমার প্রতি প্রসন্ন হও (প্রসন্নো ভব সর্বদা) জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন কার্তিকী। অতঃপর দাড়িম গাছের চারাকে সমুদ্র জলে স্নান করিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্চনা করা হয়। দাড়িম্ব গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তদন্তিকাকে বলতে হয়: হে মাতঃ তোমার দন্তপংক্তি পাকা দাড়িম্বের বীজের মত সুন্দর, পাপ নাশ (অঘ বিনাশায়) ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য (ক্ষুন্নাসায় চ বেধসা) তুমি প্রকাশিত হয়েছ। হে হরপ্রিয়ে তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাদের বরদায়িনী হও।

এরপর সুগন্ধিজলে অশোক ডালকে স্নান করাতে হয়। অশোকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন শোকরহিত; তাঁকে স্তব করার মন্ত্র হচ্ছে: অশোকা শোক-হারিনী মা দুর্গা! তুমি সব সময় আমাদের হৃদয়ে স্থিত হও (স্থিরাভব) তুমি শিবদুর্গার প্রীতি কর। আমি তোমার পূজা করছি, মা তুমি আমাকে শোকরহিত কর (অশোকং সদা কুরু)।

তারপর রত্নোদকে মানগাছকে স্নান করাবার সময় মানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডাকে বলতে হয়: মান্য বৃক্ষের মধ্যে তুমি সর্বমান্য, সুর ও অসুরগণের মধ্যে তুমি মাননীয় (মাননীয়ঃ সুরাসুরৈঃ) তোমাতে যে চামুণ্ডা দেবী বিরাজ করছেন, তাকে আমি স্নান করাচ্ছি, তুমি আমাকে মান্য দাও (মান্যং দেহি

নমোহস্তুতে) আমি তোমায় প্রণাম করি।

পরিশেষে ধান্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর পূজার জন্য ধানের শিষ সহ চারাগাছকে তৈলোদকে স্নান করিয়ে এই মন্ত্রে অর্চনা করিতে হয়: হে দেবী! তুমি লক্ষ্মী তুমি ধান্যরূপা। জগতের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা তোমার সৃষ্টি করেছেন (জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রাহ্মণা নির্মিতা পুরা)। তুমি জগতের প্রাণদায়িনী (প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী)। তুমি দেবী উমার প্রীতিদায়িকা। স্থিরা হয়ে তুমি আমাদের গৃহে কামপ্রদা হয়ে থাক। আমাকে সর্বদা রক্ষা কর (রক্ষ মাং সদা) তোমার চরণে আমি প্রণত হই।

কলা-বৌ-এর স্নানের সময় যে সব দেবীকে একই বীজে পৃথক পৃথক ভাবে অর্চনা করতে হয়, সে সব মন্ত্রের মধ্যে যে সব কথা আছে ভাবের গভীরতায় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিবীড়তায় সে সকলের তাৎপর্য যে কি তার অনুশীলন আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ বিশেষ কিছু করেননি। মহামায়া দেবী দুর্গা হচ্ছেন অখিল দেবগণের শক্তি ও তেজপুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি। শম্ভুর তেজে বাহু। ব্রহ্মার তেজে পাদ। যমের তেজে কেশ, সূর্যের তেজে অঙ্গুলি প্রভৃতি দিয়ে দেবীর মূর্তি গঠিত হলো আর দেবতাগণ তাঁকে দান করলেন বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র; যেমন শিব দিলেন শূল, বিষ্ণু চক্র, বরুণ শঙ্খ, হুতাশন শক্তি ও অন্যান্য দেবগণ দিলেন বিবিধ আয়ুধ—সৃষ্টি হলো জগমোহিনী মহামায়ার আনন্দময়ী শক্তি মূর্তি। সেই দেবী হচ্ছেন—আমারের মা "বিদ্যারূপী মহামায়া মুক্তি প্রদায়িনী—সনাতনী সর্ব্বেশ্বরী বন্ধনকারণী।"

দেবীর উৎপত্তি বিষয়ে চণ্ডীর বর্ণনা এ স্থলে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

শম্ভুতেজে মুখ আর যমতেজে কেশ।
বিষ্ণুতেজে বাহু সব সুন্দর সুবেশ॥
ইন্দ্র-চন্দ্র তেজে হয় স্তন কটি খানি।
প্রচেতায় জঙ্ঘা উরু, পৃথ্বী তেজে শ্রোনি॥
ব্রহ্মা সূর্য তেজে হল, পদ পদাঙ্গুলি।
কুবের বসুর তেজে নাসা করাঙ্গুলী॥
প্রজাপতি তেজে তাঁর সুন্দর দর্শন।
পাবকের তেজে সৃষ্টি হয় ত্রিনয়ন॥
উভ সন্ধ্যা বায়ু তেজে ভুরু কর্ণদ্বয়।
বিশ্বকর্মা দেবতেজে দেবের উদয়॥

সর্বদেব তেজোদ্ভব দেবীরে দেখিয়া।
পরাজিত দেবগণ আনন্দিত হিয়া॥*

শাস্ত্রে কলাবউকে এক এক রকম জলে স্নান করিয়ে পৃথক পৃথক মন্ত্রে যে ভাবে নব-পত্রিকার অর্চনা করা বিধেয় বলে লেখা আছে, তা কি এখন দুর্গাপূজার প্রাক্‌কালে সপ্তমী পূজার দিন সকাল বেলা করা হয়। উদ্ভিদ তরুলতা দেবী অসুর যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন বলে এই সবের অর্চনাও ঋষিগণ করতে বলেছেন। এ সব না করলে পূজার খুঁত হয় এবং ফলও ঠিক মত ফলে না। তাই যাঁরা দুর্গাপূজা করেন বিশেষ করে সার্বজনীন পূজার পরিচালকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। এ বিষয়ে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর কয়েকটি লাইন উদ্ধার করছি। চণ্ডীর উপর উক্ত বাংলায় কাব্যানুবাদ তাঁরই রচিত। তিনি লিখেছেন: উদ্ভিদজগতে মাতৃরূপে থাকিয়া দেবী আমাদিগের নিত্য জীবন সংগ্রামে জয়লাভের সহায়ক হন। নবপত্রিকা উদ্ভিদ জগতের প্রতিনিধি। মা দুর্গার প্রতীক! কোন কোন দেশে কেবলমাত্র এই প্রতীকেই অর্চনা হয়। নিখিল বিশ্বের উদ্ভিদে মহামাতৃকারূপে স্থিতা জগন্মাতাকে নব পত্রিকার মাধ্যমে আমরা প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করি মা বাঙালীর বাহুতে আবার বল দাও।

"প্রসীদ ভগবত্যম্ব! প্রসীদ ভক্ত বৎসলে। প্রসাদং কুরু মে দেবী! দুর্গে দেবী! নমোহস্তুতে।" ভক্তবৎসল দেবী ভগবতী তুমি—প্রসীদ মাতা—তোমায় প্রণমি।

এরপর আসে গণেশের প্রসঙ্গ। কলা বৌ গণেশের পাশে থাকেন বলে তাঁকে গণেশের বৌ বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। গণেশ পার্বতীর পুত্র। সর্বশুভকারী, সিদ্ধিদাতা, বিঘ্ন নাশন। পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত আগমনী গান আছে:

'গিরি গণেশ আমার শুভকারী—গণেশের কল্যাণে আসেন গৌরী—"ইত্যাদি

গণেশের অপর নাম বিনায়ক। তিনি মহাদেবের পুত্র। মহাদেবের স্ত্রী পার্বতীর দেহমল থেকে গণেশের জন্ম। সেই কারণে, অর্থাৎ নায়ক বিহনে স্বামীর সাহায্য ব্যতীত গণেশের জন্ম, তাই তিনি বি-নায়ক। (বামনপুরাণ)

এইবার দেব গণপতির কথা। সিদ্ধিদাতা গণেশ শিব এবং পার্বতীর পুত্র। সকল কর্মের সূচনায় গণেশের পূজা কর্তব্য। খর্ব-স্থূলতনু, গজেন্দ্র বদন, ত্রিনয়ন, চারিহস্ত গজানন। এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে চক্র, তৃতীয় হস্তে গদা, এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। এর বাহণ মূষিক (মূষিক শস্য নাশক বটে কিন্তু এখানে

* চণ্ডীর বাঙলা অনুবাদ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী কর্তৃক লিখিত।

সেটি প্রতীক, আমাদের নানাবিধ মোহ সে কর্তন করে)। শাস্ত্রে কথিত আছে মূষিক বৃষরূপধারী ধর্মের অবতার। গণেশ সিদ্ধিদাতা বলেই সকল দেবতার পূর্বে পূজ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণেশ জন্মের বিবরণ আছে, উভয়ই প্রায় এক।

গণেশ জন্মের অপর কাহিনী সূচনায় বলা হয়েছে! গণেশ সর্বদা তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। তুলসী তাঁকে পতিরূপে পাওয়ার আকাঙ্খা করেন, গণেশ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি অভিশাপ দেন গণেশের দানব-পত্নী হবে। সেই কারণে পুষ্টি নামক এক কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। পুষ্টি যে কে পুরাণে তার বিবরণ নেই।

ব্রহ্মার উপদেশে ব্যাসদেব গণেশকে তুষ্ট করে মহাভারত তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন এ কথা সকলের জানা। সংক্ষেপে এই হল কলা-বউ এবং গণেশের বিবরণ। গণেশের নানা কথা ৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে।

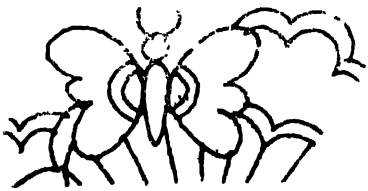

মহাভারতে দুর্গার কথা

বাল্মীকি রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণে দুর্গা পূজার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বেদব্যাস রচিত মহাভারতে দুর্গা পূজার দু-বার উল্লেখ আছে দেখা যায়। মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য একবার যুধিষ্ঠিরকে আর একবার অর্জ্জুনকে দেবীর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। কবি কৃত্তিবাস ষোড়শ শতকে রচিত তাঁর রামায়ণে রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে বোধন করে দুর্গাপূজা করেন বলে যা লিখেছেন সেটি তিনি সম্ভবত দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণ থেকে সংগ্রহ করে রামায়ণে সন্নিবদ্ধ করেছেন। তবে কালিকাপুরাণে রামচন্দ্রের কথা নেই, সেখানে আছে ব্রহ্মার কথা। এখানে উক্ত গ্রন্থের ৬০ অধ্যায়ের কিছু অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হলো।

লঙ্কায় যুদ্ধের সময় ব্রহ্মা দেবী দুর্গার অকাল বোধন করেন (রামচন্দ্র নয়)। অকালে বোধন করায় দেবী মহাসমর বাঁধিয়ে দিয়ে রাম কর্তৃক রাবণের বিনাশ সাধন করেন। তখন আনন্দিত হয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে দেবীর পূজা করেন। কিন্তু স্বয়ং রামচন্দ্র যে পূজা করেছিলেন সে কথার কোন উল্লেখ

এখানে নেই। দেবী ভাগবতে (৩ স্কন্ধ ৩০ অধ্যায়) যা আছে তাও উল্লেখ্য : নারদের উপদেশে রামচন্দ্র আশ্বিন মাসে নবরাত্র ব্রত ও দুর্গা পূজা করেন। অষ্টমীতে দেবী দর্শন দেন ও তাঁকে অভীষ্ট বর দেন। আর রামচন্দ্রকে তিনি আদেশ করেন যে, বসন্তকালে লঙ্কায় তুমি আমার অর্চনা করো। তবেই তুমি রাবণকে বধ করতে পারবে। এ থেকে রামচন্দ্র শরৎকালে ও বসন্তে দু-বার পূজা করেছিলেন বলে মনে হয় এবং বসন্তকালেই যে লঙ্কায় মহাসমর হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। এ ছাড়া ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র দেবীর পূজা করেছিলেন একথা আছে 'মহাভাগবতে'। সুতরাং কৃত্তিবাস এই সকল পৌরাণিক বিবরণ অনুসরণ করে তাঁর রামায়ণে নিজের কল্পনার সাহায্যে হয়ত রামচন্দ্র প্রসঙ্গটি সন্নিবদ্ধ করেছেন। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের 'সরল ক্রিয়া কৌমুদি' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বেশ কিছু লেখা আছে।

মূল বাল্মীকি রামায়ণে মহর্ষি অগস্ত্য রাবণ-বধ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে সবিতৃদেব-সূর্যের উপাসনায় মন নিবিষ্ট করতে উপদেশ দেন। তাঁর শক্তি বর্ণনা কালে মহর্ষি বলেন যে "ইনি রশ্মি দ্বারা সমস্ত উদ্ভাবন ও দেবাসুরকে পালন করে থাকেন ; ইনি সর্বদেবাত্মক, তেজস্বী, অমোঘ বেদত্রয় প্রতিপাদ্য, বেদ পুঃ এবং জলোৎপাদক।" কৃত্তিবাস কর্তৃক তাঁর রামায়ণে সবিতৃদেবসূর্য্যের পরিবর্তে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব প্রসঙ্গ অবতারণা করাও আশ্চর্য্য নয়।

মহাভারতে দুর্গার শরণাপন্ন হওয়ার কথা প্রথমে পাওয়া যায় বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। তারপর পাওয়া যায় ভীষ্মপর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে। প্রথমে দেবী দুর্গার স্তুতি করেন যুধিষ্ঠির এবং দ্বিতীয়বার শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে দুর্গার স্তব করেন অর্জুন। দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে অতিক্রান্ত হলে ত্রয়োদশ বৎসরটি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস করতে হবে, যাতে তাঁদের কেউ না চিনতে পারে। চিনতে পারলেই তাঁদের দ্বাদশবর্ষ বনবাস নিষ্ফল হয়ে যাবে, তাই পাঁচভাই পাঁচটি নাম গ্রহণ করে বিরাট রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। "জয়ো-জয়ন্তো বিজয় জয়সেনো জয়দ্বলঃ" প্রভৃতি।*

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভাবি নিজ মনে।
পাঁচের পাঁচটি নাম রাখিলা গোপনে॥

---

* সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিলে প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত হবে এই ভয়ে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা পদ্যানুবাদক কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের অবিকল অনুবাদ উদ্ধৃতি হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হলো।

জয় জয়ন্ত বিজয় আর জয়ৎসেন।
জয়বল এই পাঁচ নাম রাখিলেন ॥

বিরাট রাজ্যে প্রবেশ করেই যুধিষ্ঠির সর্বভয় নিবারণী জগত্তারণকারিণী দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননীর শরণাপন্ন হলেন। "ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী শ্রীদুর্গারে ধর্মপুত্র লাগিলেন স্তব করিবারে।" এই জননী দুর্গতিহারিণী দুর্গা যে নন্দগোপকুলে জাত যশোদাগর্ভসম্ভূতা, তা যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা থেকে বোঝা যায়।

যশোদানন্দিনি নারায়ণ প্রণয়িনি।
কুলবিবর্দ্ধিনি কংসবিধ্বংসকারিনী ॥
বরদে মা ভগবতী অসুরনাশিনি।
ব্রহ্মচর্যরূপা বাসুদেবের ভাগিনী ॥

এই ভাবে যুধিষ্ঠির দীনতারিণী দুর্গাকে স্তুতি করতে লাগলেন : কৃষ্ণে কুমারী! ব্রহ্মচারিণী! চতুর্ভুজে! তুমিই কৌমার ব্রত ধারণ করে স্বর্গ রক্ষা করেছিলে। ত্রৈলোক্য বিনাশের জন্য তুমিই মহিষাসুর বধ করেছিলে। তুমিই জয়া, তুমিই বিজয়া ও সংগ্রামে তুমিই বিজয় প্রদান করো। সম্প্রতি বরদা হয়ে মা তুমি আমায় বিজয় প্রদান করো।

মধুমাংসপশুপ্রিয়ে হে কামচারিনী।
নগেন্দ্রনন্দিনী বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥
ধনপুত্র লাভ তার হয় সুনিশ্চয়।
দুর্গমে তারিণী বলি দুর্গা নাম কয় ॥
সুরেশ্বরী তুমি কীর্তি লক্ষ্মী সিদ্ধি ধৃতি।
লজ্জা বিদ্যা সন্ধ্যা রাত্রি বুদ্ধি বা সন্ততি ॥
প্রভা, নিদ্রা জ্যোৎস্না তুমি কান্তি ক্ষমা দয়া।
অভীষ্টদায়িনী মাগো তুমি মহামায়া ॥

যুধিষ্ঠির আরো বললেন—তুমি সকলকে সব রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করো, মা আমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে আজ তোমার শরণাপন্ন, তুমি আমায় আশ্রয় দাও। "রাজ্যনাশ বনবাসে কষ্ট পেয়ে কত—শ্রীচরণে স্মরণ লয়েছি আমি মাতঃ" যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় দেবী আবির্ভূতা হয়ে বললেন হে রাজন! ভাইদের সঙ্গে তুমি প্রভূত সুখ পাবে। আর আমার প্রসাদে বিরাট নগরে তোমরা যখন থাকবে, তখন তোমাদের কেউ চিনতে পারবে না। তাঁর নাম নিষ্পাপ ব্যক্তি স্মরণ করলে কি হয়, সে বিষয়ে তিনি বলে তারপর অন্তর্হিতা হলেন।

নিষ্পাপী জনেতে নাম করিলে কীর্তন।
রাজ্য আয়ু ধন পুত্র দিই হে রাজন॥
প্রবাসে নগরে শত্রু সঙ্কটে সংগ্রামে।
গহনে কাননে শৈলে সাগরে দুর্গমে॥
বিপন্ন হইয়া যেবা স্মরয়ে আমারে।
দুর্লভ না থাকে কিছু কহিনু তোমারে॥

মহাভারতে দ্বিতীয় বার দুর্গার উল্লেখ আছে ভীষ্মপর্বে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের বিপুল সৈন্য সমাবেশ দেখে অর্জুনের হিতের জন্য তাঁকে শত্রুর পরাজয়ের আশায় (পরাজয়ায় শত্রুনাং) দুর্গাস্তব করতে বললেন। অর্থাৎ ভগবতীর যশোগাথা গান করতে বললেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশানুসারে দুর্গাস্তব মুখে জগজ্জননীর তুষ্টিসাধন ছাড়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জুনের বিজয়ের কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। "শত্রুদের পরাজয় হেতু এই ক্ষণ—যুদ্ধ মুখ হয়ে কর দুর্গার স্তবন।" অর্জুন তখন ভয়বিহ্বল চিত্তে রথ থেকে নেমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁকে আশ্রয় দেবার জন্য জানালেন কাতর প্রার্থনা। স্তুতিমুখে অর্জুন দেবীকে বললেন :

হে সিদ্ধসেনানি আর্যে মন্দরবাসিনি।
কুমারি কপালি কালি কল্যাণদায়িনি॥
করালি বিজয়ে জয়ে উমে কাত্যায়নি।
মহিষরুধিরপ্রিয়ে চণ্ডি নারায়ণি॥
স্তব তব করি আমি অন্তরাত্মা সনে।
প্রণিপাত করি মাতা তোমার চরণে॥
মানববৎসলা দুর্গা অর্জুনের স্তবে।
তুষ্ট হয়ে দেখা দিল দূর শূন্য নভে॥
কৃষ্ণের সমীপে দুর্গা কহিলা অর্জুনে।
অল্পকালে শত্রুদলে জিনিবে স্বগুণে॥

হে জননী তুমি যোগসিদ্ধকরী। তুমি সর্বরূপসমন্বয়ভূতা, তুমিই কালী, তুমিই কপিলা, তুমিই কৃষ্ণপিঙ্গলা, তুমি ভদ্রকালী, চণ্ডী, চণ্ডা, তারিণী বরবর্ণিনী। তুমিই কাত্যায়নী, করালী, জয়া, বিজয়া, শিখিপুচ্ছধ্বজধরা, মহাশূলপ্রবহনা, খড়্গখেটকধারিনী, মহিষরক্তপ্রিয়ে, কৌশিকী, পীতবাসিনী, অট্টহাসে, কোকমুখী। তুমিই উমা, শাকম্ভরী, শ্বেতা, কৃষ্ণা, কৈটভনাশিনি, পীতনয়নী। তুমিই

হিরণ্যাক্ষী, বিরূপাক্ষী, সুধাম্রাক্ষ। তুমিই বেদশ্রুতি-মহাপুণ্যা, ব্রহ্মণ্যা বা বেদহিতা এবং জাতবেদসী অর্থাৎ ব্রহ্মাদির সুপরিজ্ঞাতা বা অতীতজ্ঞা।

জ্ঞানিরা তোমাকে স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, বেদমাতা, গায়ত্রী এবং উপনিষদ বলে থাকেন। মহাদেবি! আমি পবিত্র চিত্তে তোমার স্তব করলাম, তুমিই রতি, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, দীপ্তি, প্রকৃতি ও জগতের জননী স্বরূপা। দেবী তখন সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডবকে "তুমি শত্রুগণকে জয় করবে" বলে অন্তর্হিতা হবার আগে বলেছিলেন :

নর তুমি নারায়ণ তোমার সহায়।
তোমারে জিনিতে পারে কে হেন কোথায়॥
কিবা সে অন্যের কথা নিজে বজ্রধর।
ইন্দ্রও তোমার রণে হইবে কাতর॥
এতেক কহিয়া দুর্গা হৈলা অন্তর্হিত।
বর লভি পার্থ হৈলা রথে আরোহিত॥

বাঙালীর দুর্গাপূজা

যিনি দুর্গতি নাশ করেন, তিনিই হচ্ছেন দুর্গা॥ চণ্ডীতে তিনি স্বয়ং বলেছেন, শরৎকালে যে মহাপূজা হয়, সেই পূজায় যে ভক্তির সঙ্গে আমার মাহাত্ম্য শুনবে, আমার দয়ায় সে সব দুর্গতি থেকে মুক্ত হবে। শরৎকালে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা হয় তবে এই মহাপূজাকে বলা হয় শারদীয় পূজা। শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে সীতা উদ্ধারের জন্য দেবীর প্রথম পূজা করেছিলেন এবং মায়ের কৃপায় তিনি জয়ী হয়েছিলেন এবং তাই তিনি করেছিলেন বিজয়ার দিন উৎসব। আমরা এখন পূজাটি বাদ দিয়ে কেবল করি উৎসব।

ভারতের অন্যান্য স্থানেও দুর্গাপূজা ভিন্ন ভিন্ন নামে হয় তা আগে বলেছি। কিন্তু ষড়ৈশ্বর্যশালী জগন্মাতার যে দশভূজা মূর্তি আমরা পূজা করি, সে রকম বিরাট

পূজা আর কোন প্রদেশে কেউ করেন না। দশপ্রহারণী মা পরমাসুন্দরী তাঁর ডান পা সিংহের পিঠে ও বাঁ পা অসুরের কাঁধে দিয়ে তাকে বর্শাবিদ্ধ করেছেন ও তার গা দিয়ে ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা এবং মায়ের মুখমণ্ডলে রয়েছে রোষের ভাব। তার ডান দিকে রয়েছেন লক্ষ্মী ও গণেশ এবং বাঁদিকে রয়েছেন সরস্বতী ও কার্ত্তিক। মায়ের এই রণরঙ্গিনী রাজসী মূর্তি ধ্যানের মূর্তি হলেও এই দেবী মূর্তি আমরা পূজা করি, আমাদের উদ্দেশ্য শক্তি সঞ্চয়ের।

শাস্ত্রে আছে কলিযুগে অশ্বমেধের বিকল্প হচ্ছে দুর্গা পূজা। তাই বোধহয় রাজা গণেশ সর্বপ্রথম গৌড়বঙ্গকে শত্রুমুক্ত করে এই মহাপূজা করেছিলেন। এই পূজায় দরকার সর্বস্থানের মৃত্তিকা, সপ্তসিন্ধু, সর্বতীর্থের বারি ও মহৌষধি। তাই সাধারণের পক্ষে এই সব জিনিষ সংগ্রহ করে মহাপূজা করা ছিল খুবই শক্ত। তারপর সম্রাট আকবরের আমলে আবার দুর্গাপূজা করেছিলেন তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায়। তাঁর তখন খরচ হয়েছিল আট লক্ষ টাকা। তাঁরই অনুকরণে পরে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরে প্রবর্তন করেছিলেন রাজরাজেশ্বরী দুর্গাপূজা!

ইংরেজ আমলে বাঙলাদেশে জমিদার শ্রেণীর ধনীব্যক্তিরাই দুর্গাপূজার বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে একমাত্র সমর্থ ছিলেন বলে, তাঁরাই কলকাতা সহ বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এই মহাপূজা সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে তিনি জগৎ জননী বলে এই পূজা অর্দ্ধশতাব্দী ধরে হচ্ছে আবার সার্বজনীন পূজা রূপে। এই শারদীয়া পূজার অর্থ হচ্ছে একমাত্র শক্তির আরাধনা, তাই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন "বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" তিনি শক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করতে বলেছিলেন ভক্তি! এ ভক্তি মানে দেশকে ভক্তি, দেশের মাটিকে ভক্তি, মহাপ্রভুর কথায় যাকে বলে শুদ্ধভক্তি। এই জগজ্জননী মা দুর্গা কত রূপেই না আবার প্রকাশ পেয়েছেন। কখনও তিনি চণ্ডী, কখনও তিনি চামুণ্ডা, কখনও তিনি কালী, কখনও বা তিনি কাত্যায়ণী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, উমা, পার্বতী, অম্বিকা, মাহেশ্বরী, ভগবতী, জগদ্ধাত্রী বা আরও কত কী? কিন্তু সকলের মূল হচ্ছে এক মাত্র শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রার্থনা।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গামণ্ডলীর মধ্যে শক্তিকে কেন্দ্র করেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতির অবস্থানও বলা যায় শক্তিরই দ্যোতক। এই শক্তির মূলকেন্দ্র হচ্ছেন দুর্গা আর লক্ষ্মী হচ্ছেন সম্পদরূপ শক্তি, সরস্বতী হচ্ছেন

গণশক্তি ও কার্তিক হচ্ছেন সামরিকরূপ শক্তি। শক্তিকে সংহত করার জন্যই দেবী পুত্রকন্যা সমভিব্যহারে উপস্থিত হয়েছিলেন অসুর বিনাশের জন্য। বলা-বাহুল্য শ্রীরামচন্দ্রও তাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই আশায় বুক বেঁধে পূজা করেছিলেন দেবীর। তিনি জয়ী হয়ে তাই সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন।

বাঙালীর এই দুর্গাপূজার মধ্যে রয়েছে যে শক্তিসাধনার বিশিষ্টতা তা বিস্মৃত হয়ে যেদিন থেকে বাঙালী সুরু করেছে ভক্তিহীনের মত মাকে দাঁড় করিয়ে আত্মতৃপ্তির জন্য কেবল উৎসব; সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে দেশের তথা আমাদের দুঃখ দুর্দশা। মাতৃ প্রণামে এই প্রত্যয়ের জন্যই পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। আর প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সুলেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন:

'এই মাটিতেই দশভুজার প্রতিমা গড়িয়া বাঙালী জীবন সার্থক করি। এই মাটিকে মা-মা বলিয়া বাঙালী একবার গড়াগড়ি দাও। তোমার দেহ পবিত্র হউক, তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হউক।' বন্দেমাতরম্॥

বাঙলায় প্রচলিত দুর্গাপূজার প্রতিমার পূর্ণ পরিকল্পনাটি কালীবিলাসতন্ত্রে পাওয়া যায়। "বাহু ভানু শশি সন্নিভং,"—তাঁহার ত্রিনয়ন পরিকল্পিত হইয়াছে। তৎসম্পর্কে বলা হইয়াছে,—'এনসাং দহনং' 'অজ্ঞান তমোহারি' এবং 'হর্ষ পরিবর্ধনং নৃণাম' অর্থাৎ তাঁহার অগ্নিনেত্রে আমাদের পাপ ভস্মসাৎ করেন, সূর্যনেত্রে তিনি জ্ঞানালোক দান করিয়া আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির্লোকে লইয়া যান এবং তাঁহার তৃতীয় সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাবর্ষী চন্দ্রনেত্রে তিনি আমাদিগকে আশৈশব আমরণান্ত কাল পর্যন্ত আনন্দ বর্ষণ করিয়া যান।

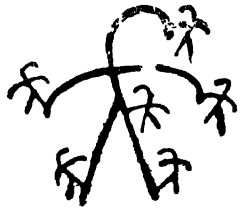

সেকালের সমাজে দুর্গাপূজা

'সেকালে বাঙলার জনসাধারণ মাসে এক টাকা আয় করলে পেট ভরে কালিয়া পোলাও খেতে পারতো।' এ কথা লিখেছেন রিয়াজ-ইস-

সালাতীন'-এর অজ্ঞাতনামা মুসলমান লেখক। সম্রাট সাজাহান ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের এক আদেশ বলে সাম্প্রতিককালে নির্মিত সমস্ত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করবার আদেশ দেন। তাঁর পুত্র সম্রাট আওরঙ্গজেবও মেদিনীপুরের একটি মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে আদেশ দেন যে, ওই মন্দিরকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং সেই সঙ্গে বিগত বারো বছরের মধ্যে যত মন্দির নির্মিত হয়েছিলো সে সবও ধ্বংস করতে হবে। এছাড়া প্রাচীন মন্দিরাদির সংস্কার করাও তিনি নিষিদ্ধ করে দেন। ওম্যালী সাহেব লিখেছেন ;

That every idol-house built within the last twelve years shall be destaoyed and that no repairs to Hindu Shrines shall be allowed. (History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule. L. S. S. O'Malley.)

হিন্দু বিদ্বেষী আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা খুব প্রবল থাকলেও তাঁর সুদীর্ঘ রাজ্যকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) অন্নকষ্টের কোন উল্লেখ নেই। বরং সেই সময় সমগ্র বাঙলাদেশের যে ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে নবাব সায়েস্তা খাঁর সুশাসনে বাঙলায় কিছুকাল টাকায় আট মন চাউল পর্যন্ত বিক্রিত হয়েছিল। একথা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তাই সায়েস্তা খাঁ মহা উল্লাসে ঢাকায় একটি তোরণদ্বার নির্মাণ করে তাতে লিখে দিয়ে যান, যে রাজার রাজত্বকালে পুনরায় এরূপ সুলভ মূল্যে জিনিষপত্র পাওয়া যাবে, তিনি ছাড়া আর কেউ যেন এই দ্বার উদ্ঘাটন না করেন।

ফরাসী পরিব্রাজক বার্নিয়ে সেই সময় ভারত ভ্রমণ করতে করতে বাঙলায় আসেন, তিনি ১৬৫৬ থেকে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করে লিখেছিলেন, যে বাঙলাদেশ হচ্ছে স্বর্গভূমি 'জিন্নেৎ-উল- বলাৎ'। এখানে তাঁর বর্ণনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো। তিনি লিখেছেন :

মিশর দেশই চিরকাল পৃথিবীর মধ্যে সমধিক উর্বর ও শস্যশালী বলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমি দুবার বাঙলাদেশে গিয়ে যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে বাঙলারই এ বিষয়ে প্রধান দাবী, মিশর নয়। এখানে তণ্ডুল এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে নিকটবর্তী প্রদেশের কথা দূরে থাকুক বহু দূরবর্তী দেশের লোকেরাও বাঙলার অন্নে পালিত হয়। করমণ্ডল উপকূলে মছলী-পত্তন প্রভৃতি বন্দরে এবং সিংহল মালদ্বীপ প্রভৃতি নিকটবর্তী দ্বীপে বাঙলার চাউল প্রেরিত হয়। চিনিও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং দক্ষিণাপথে

ও আরব মেসোপটিমিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রেরিত হয়। এ ছাড়া নানারূপ সুখাদ্য ফল ও মিষ্টান্নের জন্য বাংলাদেশ সুবিখ্যাত। মিশরের মত না হলেও গোধূম এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। বাঙলার লোক অন্নভোজী বলে গোধূমের চাষ হয় এখানে অল্প। চাউল ঘৃত ও নানাপ্রকার তরিতরকারী এখানে অতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রী হয়। এক টাকায় কুড়িটার বেশী পক্ষী পাওয়া যায়। ছাগল ও মেষ প্রচুর। শূকর এত প্রচুর যে, পোর্তুগীজরা শূকরের মাংস খেয়ে প্রাণ ধারণ করে। মৎস মেলে এখানে অপর্যাপ্ত। এক কথায় লোকের জীবনধারণের উপযোগী নানা রকম জিনিষে বাঙলাদেশ পরিপূর্ণ। তাই স্থায়ীভাবে পোর্তুগীজরা এ দেশে বাস করেছে।

সেই সময় বাঙলায় পাঁচ টাকায় দোল দুর্গোৎসব হতো বলে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙলার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লিখেছেন। অষ্টাদশ শতকে প্রথমে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বেও টাকায় ৫।৬ মন চাউল পাওয়া যেতো। তাই এক টাকায় এক মাস পোলাও কালিয়া খাবার কথা মুসলমান ঐতিহাসিক লিখে গেছেন। মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর আমলে যশোবন্ত রায় ঢাকায় রাজকার্য নির্বাহ করতেন। তাঁর সুশাসনে তখন কৃষিকর্মের এত উন্নতি হয় যে, আবার টাকায় আট মন চাউল হলো দেখে যশোবন্ত রায় সায়েস্তা খাঁর তোরণ দ্বার মহাসমারোহে একবার উদ্ঘাটন করলেন।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বর্গীর হাঙ্গামার জন্য পশ্চিমবঙ্গে অন্নকষ্ট সুরু হয়েছিল। ১১৫৮ সালে রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র কয়েক লাইন এখানে উল্লেখ্য :

বরগির তরাসে কেহ বাহির না হয়।
চতুর্দিকে বরগির ভয়ে রসদ না মিলে॥
চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি।
তেল ঘি আটা চিনি লবন একসের করি॥
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে না পাএ।
খুদ্র কাঙাল জত মইরা মইরা জাএ॥

ওম্যালি সাহেবও বঙ্গ-বিহার-ওড়িষ্যার ইতিহাসে বর্গীদের বিষয় লিখেছেন :

North and Eastern Bengal alone escaped the ravages of the Marathas. Both Indian and English records agree as to the atrocities committed by them and the miseries of the people···To Holwell the annual invasion of murders,

oppression and distress, of marches counter-marches, retreats and skirmishes with varying success but with uniform misery to the people.

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতার প্রবীণ তহশীলদার গোবিন্দরাম মিত্র ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর বর্গীর হাঙ্গামায় রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে অন্নকষ্টের উল্লেখ করে রিপোর্ট করেছেন যে, "ষাট বছর ধরে যেরূপ দুর্ভিক্ষ ঘটেনি, অধুনা দু বছর ধরে অন্নকষ্টের জন্য কোম্পানীর মাশুলখানায় অল্প জমা ধার্য করতে হয়েছে।" তারপর ছিল ধর্মদ্বেষী শাসকের অত্যাচার।

That every idol-house built within the last twelve years shall be destroyed and that no repairs to Hindu Shrines shall be allowed. (History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule. by L.S.S. O'Malley.)

তাঁর নির্দেশ মতে ১৭৫১ ও ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে চাউলের দাম হয়েছিল যথাক্রমে টাকায় বত্রিশ সের ও ষোল সের। এ ছাড়া অন্য শস্যের দাম ছিল টাকায় একমন ও বার সের। তেল ছিল টাকায় যথাক্রমে আট সের ও পৌনে চার সের।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কাটোয়ার কাছে একটি গ্রামের দুর্গাপূজায় ব্যয় হয়েছিল আশি টাকা চৌদ্দ আনা বলে জানা যায়। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাটোয়া অঞ্চলে মহাভারতের হাতে লেখা পুঁথি অনুসন্ধানের সময় একখানি মহাভারতের মধ্যে জনার্দন শর্মার বাড়ীর দুর্গোৎসবের একটি হিসাব পান। সেই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা ১১৮৭ সালে। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' উহার উল্লেখ করেছেন। দুই শতক আগে দুর্গোৎসবে কি রকমের খরচ হতো, তার একটা আভাস নিম্নের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে।

দুর্গা প্রতিমা	৫·০০
পুরোহিতের দাক্ষণা	৮:০০
ডাল চাউল ১৭ মন	৬·২৫
কাপড়	৮·০০
ডাল আতপ চাউল ৪ মন	২·২৫
কলাই	·৫০
ঘৃত ১ মণ	৫·০০

ময়দা ৪ মণ	২·৩৭
ক্ষীর ১ মন	৫·০০
সন্দেশ	৭·০০
তরকারী দিঃ	২·০০
তেল—১॥ মণ	২·০০
ফল ফুলারী	১·০০
মসলা দিঃ	১·১২
চুণ	·০৩
চন্দন, ধূপ	·৪০
বাদ্যকর	৩·০০
গুড়	৬·০০
দধি	৫·০০
দুগ্ধ	৩·০০
চিনি	·৫০
কাষ্ঠ	২·০০
নারিকেল	২·০০
লবণ	·৫০
পান সুপারি	১·০০
শপ ১টা	·৫০
নাপিত	·৫০
বেয়ারা	১·০০
মোট খরচ	৮৫·৯০

তারপর উনিশ শতকে কলকাতায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাহেবদের আমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করেন সর্বপ্রথম রূপলাল মল্লিক। এর উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠা। তাঁত ভ্রমণকারী হাচিসন সাহেব এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

oopla! was the first native who diverting himself of the bigotry which surrounds the Hindoo religion, threw open the house for the entertainment of Europeans during the celebration of one of the most important Hindoo festivals called the Doorga Puja.

বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক থেকে সুরু হয়েছে সার্বজনীন পূজা। এই ধরণের দুর্গা পূজায় খরচের বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। পাঁচ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয় এমন পূজাও এখন কলকাতায় বিরল নয়। তাই এখানে কালীঘাটের ছোট সার্বজনীন পূজায় ১৩৮৩ সালে কত ব্যয় হয়েছিল তার হিসাব একটা দেওয়া হলো। স্মরণ রাখতে হবে যে, সেকালের পূজায় 'দীয়তাং ভূজ্যতাং' ছিল প্রধান। তাই পূজায় সতের মণ চাউল, চার মণ ময়দা ও এক মণ ঘৃতের প্রয়োজন হয়েছিল। নিম্নে যে পূজার হিসাব দেওয়া হলো তাতে লক্ষ্মীপূজা সমেত ব্যয় হয়েছিল ৬৯২৫৲ টাকা এবং ভোজনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এই হিসাব কলকাতা ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ ডিফেন্স ইউনিট থেকে গৃহীত।

মণ্ডপ	১৫৪৮·০০
ফেস্টুন	২৫·০০
প্রতিমা	১৬৫০·০০
পূজা ও ভোগ	৭১৬·০০
আলোকসজ্জা	৭২৫·০০
পুরোহিত	৭৫·০০
বিসর্জন	২০০·০০
যাতায়াত বাবদ	৩৫·০০
রেশন	৫৮·০০
ঢাকী	১৬৫·০০
ছাপা	৬৪৫·০০
লক্ষ্মীপূজা	১৯৬·০০
সাজসজ্জা	৪৩৮·০০
অস্ত্র	৩৫·০০
কুলী	৯০·০০
বিবিধ	৮২·০০
বিজয়া সম্মিলনী	২১৩·০০
মোট খরচ	৬৯২৫·০০

আলোচ্য তালিকা দুটি হতে বিগত দুশো বছরে প্রতিমার মূল্য যেখানে বেড়েছে (৫ : ১৬৫০) তিনশো তিরিশ গুণ, বাজনদারের খরচ বেড়েছে যেখানে (৩ : ১৬৫) পঞ্চান্ন গুণ; সেখানে পুরোহিতের দক্ষিণা (৮ : ৭৫) মাত্র সাড়ে নয় গুণ বৃদ্ধি আজকের দিনে খুবই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

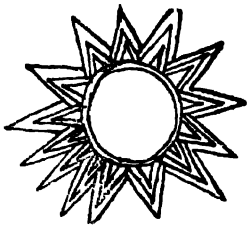

অর্জুনের দুর্গাস্তব

ভারতবর্ষ মুখ্যত ছিল একটি হিন্দুধর্মরাষ্ট্র। ভারতের বুকে রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু শক্তির যে প্রাধান্য ঘটেছিল তা উজ্জ্বল হয়ে আছে ইতিহাসে তার আপন বৈশিষ্ট্যে। ভারতের জনগণের মন রামায়ণ-মহাভারতের সূত্রে গাঁথা। এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে রচিত কাহিনীর ব্যাঞ্জনা আছে। আর সে কাহিনীর অন্তরালে আছে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল মন্ত্র। তাই রামায়ণ মহাভারতের সেই পৌরাণিক যুগেও শিবজায়া দুর্গা শক্তির উৎসরূপে দেবতা মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন বলে রামচন্দ্র ও অর্জুন তাঁরা উভয়েই জগন্মাতার স্তব বা পূজা করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্যোধনের বিপুল সৈন্য দেখে যুদ্ধের আগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের হিতের জন্য দুর্গাস্তব করতে বলেন। অর্জুন রথ থেকে নেমে নত জানু হয়ে শত্রুগণের পরাজয়ের জন্য দুর্গাস্তুতি করে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রামচন্দ্রও রাবণের বধের জন্য অকালে (শরৎকালে) দুর্গাপূজা করেন। রামচন্দ্র একশো আটটি নীলপদ্ম দিয়ে দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু দেবী দুর্গা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একটি নীলপদ্ম লুকিয়ে রাখেন। একটি পদ্ম কম দেখে রামচন্দ্র তাঁর নিজের একটি চক্ষু উৎপাটন করে দেবীর পাদপদ্মে যখন অর্পণ করতে অগ্রসর হন, তখন দেবী দুর্গা আবির্ভূতা হয়ে রামচন্দ্রকে নিবৃত্ত করেন এবং তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

স্মরণমাত্রেই ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শত্রুর সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছিলেন বলে ইঁহার নাম 'দুর্গা'। এই দুর্গার সহস্র নাম আছে। দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নামনিরুক্তি সম্বন্ধে দেবীপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। দেবী দুর্গার ত্রিনেত্র, তাই মুনিগণ তাঁকে 'ত্র্যম্বকা' বা 'ত্রিনয়নী' বলে থাকেন। চন্দ্র, সূর্য ও বায়ু—এই তিনটি হচ্ছে দুর্গার ত্রিনেত্র স্বরূপ।

সোমসর্ষপানিলাস্ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি ভার্গব।
তেন সা ত্র্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্তিতা॥

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই তাঁর সামনে যে দুর্গাস্তুতি করেছিলেন, সেই স্তোত্র প্রত্যহ সকাল বেলা যে ব্যক্তি পাঠ করেন, যক্ষ রক্ষ, পিশাচ, শত্রু, সর্প প্রভৃতি দস্তী ও রাজকুল হতে তার আর কোন ভয় থাকে না। তিনি বিবাদে ও সংগ্রামে জয়প্রাপ্ত, বন্ধন ও চৌর হতে বিমুক্ত, দুর্গ হতে উত্তীর্ণ, লক্ষ্মীবান্ ও আরোগ্য এবং বলসম্পন্ন হয়ে শতবর্ষ জীবিত থাকেন বলে মহাভারতে লেখা আছে। তাই অর্জুনের দুর্গাস্তবে মাতৃবন্দনা ছিল কিরূপ তা দেখাবার জন্য এখানে উদ্ধার করছি :

(১)

নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্যে! মন্দরবাসিনি।
কুমারি! কালি! কপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে॥

হে সিদ্ধসেনানি! আর্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! আপনাকে নমস্কার করি।

(২)

ভদ্রকালি! নমস্তভ্যং মহাকালি! নমোহস্তু তে।
চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্তভ্যং তারিণি! বরবর্ণিনি॥

হে ভদ্রকালি! আপনাকে নমস্কার; মহাকালি! আপনাকে নমস্কার, চণ্ডি! চণ্ডে! তারিণি! বরবর্ণিনি! আপনাকে নমস্কার।

(৩)

কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে!
শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে॥

হে কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে! শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে! আপনাকে নমস্কার।

(৪)

অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গখেটকধারিণি।
গোপেন্দ্রস্যানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপকুলোদ্ভবে॥

হে অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গখেটকধারিণি! কৃষ্ণানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোকুলোদ্ভবে! আপনাকে নমস্কার।

(৫)

মহিষাসৃকপ্রিয়ে ! নিত্যং কৌশিকি ! পীতবাসিনি !

অট্টহাসে ! কাকমুখি ! নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে ॥

হে মহিষরক্তপ্রিয়ে ! কৌশিকি ! পীতবাসিনি ! অট্টহাসে ! কাকবদনে ! রণপ্রিয়ে আপনাকে নমস্কার ।

(৬)

উমে ! শাকম্ভরি ! শ্বেতে ! কৃষ্ণে ! কৈটভনাশিনি ।

হিরণ্যাক্ষি ! বিরূপাক্ষি ! সুধূম্রাক্ষি ! নমোঽস্তু তে ॥

হে উমে ! শাকম্ভরি ! শ্বেতে ! কৃষ্ণে ! কৈটভনাশিনি ! হিরণ্যাক্ষি ! বিরূপাক্ষি ! ধূম্রাক্ষি ! আপনাকে নমস্কার ।

(৭)

বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ! ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি ।

জম্বুকটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে ॥

হে বেদশ্রবণজনিত মহাপুণ্যে ! ব্রহ্মণ্যস্বরূপ ! হুতাশনস্বরূপ ! জম্বু-কটক-চৈত্যবাসিনি ! আপনাকে নমস্কার ।

(৮)

ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্ ।

স্কন্দমাতর্ভগবতি ! দুর্গে ! কান্তারবাসিনি ॥

আপনি সমুদায় বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাণিগণের মহানিদ্রা ! হে কার্ত্তিকেয়জননি ! ভগবতি ! দুর্গে ! মহারণ্যবাসিনি ! আপনাকে নমস্কার ।

(৯)

স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী ।

সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যসে ॥

আপনি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী ও বেদান্ত, আপনাকে নমস্কার ।

(১০)

স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি ! বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ।

জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্রণাজিরে ॥

হে মহাদেবি ! আমি বিশুদ্ধ অন্তরে আপনার স্তব করলাম । আপনার অনুগ্রহে রণক্ষেত্রে যেন জয়লাভ করতে সমর্থ হই ।

(১১)

কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্॥

আপনি ভক্তগণের রক্ষার জন্য সর্বদাই দুর্গমপথে, ভয়স্থানে দুর্গমদেশে, ভক্তগণের গৃহে ও পাতালে বাস করেন, আর দানবগণকে যুদ্ধে পরাজয় করে থাকেন।

(১২)

ত্বং জম্ভনী মোহনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা॥

আপনি রতি, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, লক্ষ্মী, সন্ধ্যা, দীপ্তি, প্রকৃতি ও জগতের জননী।

(১৩)

তুষ্টিপুষ্টিধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্যবিবর্দ্ধিনী।
ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষসে সিদ্ধতারণৈঃ॥

হে দেবি! আপনি তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্রসূর্য্যউজ্জ্বলকারিণী দীপ্তি ও সম্পন্নদের সম্পদ, আর যোগি ও পরিব্রাজকগণ ধ্যানে আপনাকে সন্দর্শন করেন।

অর্জুনের ভক্তি দেখে মানববৎসলা বরদা ভগবতী অন্তরীক্ষে আকাশমার্গে অবস্থান করে বললেন 'হে বীর! তুমি অল্পকাল মধ্যেই শত্রুগণকে পরাজিত করবে। নর, নারায়ণ তোমার সহায়। অন্য শত্রুর কথা কি, স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রও তোমাকে জয় করতে সমর্থ হবে না',—এই কথা বলে দেবী দুর্গা সেই স্থানেই অন্তর্হিত হলেন।

নাট্যকার কবি রাজকৃষ্ণ রায় বাংলা ভাষায় মহাভারতের যে প্রাঞ্জল অনুবাদ করেছেন, সেখান থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুনের দুর্গাস্তবের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

দুর্গাস্তব

শত্রুদের পরাজয় হেতু এইক্ষণ।
যুদ্ধমুখ হয়ে কর দুর্গার স্তবন॥
কৃষ্ণভাষে রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয়।
আরম্ভিলা দুর্গাস্তব সভক্তি হৃদয়।
হে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে মন্দরবাসিনি।
কুমারি কাপালি কালি কল্যাণদায়িনি॥

করালি বিজয়ে জয়ে উষে কাত্যায়ণি।
মহিষরুধিরপ্রিয়ে চণ্ডি নারায়ণি॥
স্তব তব করি আমি অন্তরাত্মা সনে।
প্রণিপাত করি মাতা তোমার চরণে॥
মানবঘৎসলা দুর্গা অর্জুনের স্তবে।
তুষ্ট হয়ে দেখা দিলা দূর শূন্য নভে॥
কৃষ্ণের সমীপে দুর্গা কহিলা অর্জুনে।
অল্পকালে শত্রুদলে জিনিবে স্বগুণে॥
নর তুমি নারায়ণ তোমার সহায়।
তোমারে জিনিতে পারে কে হেন কোথায়॥
কিবা সে অন্যের কথা নিজে বজ্রধর।
ইন্দ্রও তোমার রণে হইবে কাতর॥
এতেক কহিলা দুর্গা হৈলা অন্তর্হিত।
বর পাভি পার্থ হৈলা রথে আরোহিত॥

প্রথম দুর্গোৎসব

বাঙলাদেশে দুর্গাপূজা যেরূপ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না তা আগে বলেছি। পাঁচশো বছর আগে এ পূজা আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল না। বাল্মীকি রামায়ণে তাই দুর্গাপূজার কোন কথা নেই। সেখানে মহর্ষি অগস্ত রাবণ বধ করবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে সবিতৃদেব সূর্যের উপাসনায় মন নিবিষ্ট করতে উপদেশ দেন এবং তাঁর শক্তি বর্ণনাকালে মহর্ষি তাঁকে বলেন :

"ইনি রশ্মি দ্বারা সমস্ত উদ্ভাবন ও দেবাসুরকে পালন করেন। ইনি সর্বদেবাত্মক, তেজস্বী, অমোঘ বেদত্রয় প্রতিপাদ্য, বেদবপুঃ ও জলোৎপাদক।"

মূল বাল্মীকি রামায়ণে দুর্গাপূজার কথা না থাকলেও, কবি কৃত্তিবাস তাঁর রচিত বাঙলা রামায়ণে রাবণ বধের জন্য অকালে বোধন ক'রে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গা পূজা করার কথা যা লিখেছেন তা হচ্ছে কৃত্তিবাসের নিজস্ব কল্পনা। কিন্তু ব্যাসদেবের মূল মহাভারতে দুবার দুর্গা পূজার উল্লেখ আছে। প্রথমে যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময় তাঁদের কেউ যাতে পরিচয় না পায়, তার জন্য তিনি দুর্গার স্তব করেন। পরে অর্জুন কুরুক্ষেত্রের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে কৌরবদের পরাজয় ও রাজ্য প্রাপ্তির জন্য নতজানু হয়ে স্বমরক্ষেত্রেই দুর্গাস্তুতি করেন। এ কথা পূর্বেই বিধৃত হয়েছে। দেবী দুর্গা সন্তুষ্ট হয়ে উভয়ের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। "দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্তিতা" তাই যিনি দুর্গতি নাশ করেন, তাঁকেই আমরা বলি দুর্গা।

বাঙলাদেশে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায় সর্বপ্রথম দুর্গার প্রতিমা নির্মাণ ক'রে দুর্গোৎসব করেন বলে কিম্বদন্তী। কেউ কেউ আবার লিখেছেন যে, দিনাজপুরের রাজা গণেশ সর্বপ্রথম দুর্গা পূজা করেন, তারপর করেন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় পাল রাজত্ব-কালের একটি দশভুজা প্রস্তরমূর্তি আছে। সুতরাং সে-সময়ে যে গৌড়বঙ্গে দুর্গার মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।*

রাজা কংসনারায়ণ বৃদ্ধ বয়সে পুণ্য অর্জনের জন্য প্রাচীন কালের মতো যজ্ঞ করার ইচ্ছা করেন। তখন তার পুরোহিত বংশে খুব বড় এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নাম পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী। রাজা পণ্ডিতদের যজ্ঞ করার জন্য আহ্বান করলে পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী রাজাকে যজ্ঞ করতে নিষেধ করে বলেন যে, ঋষিরা বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারটি যজ্ঞকেই বলেছেন মহাযজ্ঞ। যাঁরা সকল রাজ্য জয় ক'রে সম্রাট হতে পারেন, একমাত্র তাঁরাই এইসব মহাযজ্ঞ করতে পারেন। আপনি দিল্লীর বাদশাহের অধীনে একজন সামন্তরাজা মাত্র। সুতরাং আপনি সম্রাটের মত এইসব যজ্ঞ করার অধিকারী নন। এ ছাড়া, অশ্বমেধ ও গোমেধ এ দুটি যজ্ঞ কলিযুগে করাও শাস্ত্র কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে। অধিকন্তু, একমাত্র ক্ষত্রিয় ছাড়া এই যজ্ঞ করার কারুর অধিকার নেই। আপনি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র যদি মানেন, তাহলে এ যজ্ঞে আপনার কোনো অধিকার নেই।

রাজা পণ্ডিতের কথায় একটু দুঃখিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এমন কি

---

* প্রথম দুর্গা পূজা কে করেছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় খুব মতভেদ আছে।

কোনো যজ্ঞ নেই যা আমি করতে পারি? শাস্ত্রী মশাই তখন বললেন: একটি মহাযজ্ঞ আছে, সেটি হচ্ছে জগন্মাতার উদ্দেশে দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করা।

দুর্গোৎসব? কই, এরকম কোনো কথা তো কখনও শুনিনি। দুর্গাপূজার কথা শুনেছি; প্রাচীন কালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য এ পূজা করেছিলেন —এ কথা বললেন রাজা।

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী তখন রাজাকে বললেন যে, হোম আর পূজা যে আকারেই করা হোক, তাকেই দেবতার অর্চনা বলা যায়। সত্যযুগে সুরথ রাজা ও বৈশ্য সমাধি দুর্গাপূজা ক'রে মহাফল লাভ করেছিলেন, আপনিও যদি তাঁর মতো দেবীর পূজা করেন, তাহলে আপনারাও সকল যজ্ঞের ফললাভ হবে। অন্যান্য পণ্ডিত যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও সকলে রমেশচন্দ্র শাস্ত্রীর কথায় সায় দিলেন। একজন পণ্ডিত তখন বললেন যে, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য কি নিয়মে কি ভাবে পূজা করেন? সে সব কথা কোন পুরাণে নেই। কেবল চণ্ডীতে আছে যে, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য তিন বছর ধ'রে অল্পাহারে, তারপর অনাহারে তারপর নিজের বুকের রক্ত বলি স্বরূপ মাকে নিবেদন ক'রে তবে দেবীর সাক্ষাৎ পান, কিন্তু কলিযুগে কি তা সম্ভব? চণ্ডীতে আছে:

দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি করিয়া নির্মাণ।
পত্রপুষ্পে পুজে তাঁরা করিয়া ধেয়ান॥
অল্পাহারে অনাহারে ব্যাপী বর্ষত্রয়।
বক্ষরক্তে ফলে-ফুলে উভয়ে পুজয়॥*

অতঃপর, পণ্ডিতবর্গ বিভিন্ন পুরাণে দুর্গার বিষয় সে সব বিভিন্ন ক্রিয়া ও পূজাপদ্ধতি আছে, তার সঙ্গে নূতন কিছু সংযোজন ক'রে শরৎকালীয় দুর্গাপূজার একটি পদ্ধতি তাঁরা ঠিক ক'রে দেন এবং বলির জন্য নিজের গায়ের রক্তের পরিবর্তে যে কোনো পশু রক্ত দেবার জন্য তাঁরা বিধান দেন। যে পূজাপদ্ধতি তাঁরা স্থির করেন তাতে বহু দূর দূর স্থানের নানারকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস ও পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদীর জল প্রভৃতি সংগ্রহ করতে রাজার ব্যয় হয় প্রায় আট লক্ষ টাকা। কলা বৌ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে দুষ্প্রাপ্য নদনদীর জল ও অন্যান্য পূজাপোকরণের কথা বলা হয়েছে। যা হোক কংসনারায়ণের পূজা দেখে দেশের লোক তখন মুগ্ধ হয়ে যায়। তারপর ক্রমশঃ দেশের অন্যান্য ভূমধ্যকারীগণ তাঁকে অনুসরণ করেন। এইভাবে দুর্গাপূজা বাঙলাদেশেপ্রচলিত হয়।

---

* ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী কৃত চণ্ডীর অনুবাদ থেকে গৃহীত।

চিতু ডাকাতের দুর্গাপূজা

আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে গঙ্গার দুই কূল যখন ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তখন কাশীপুর চিৎপুরের গভীর অরণ্যে চিতু ডাকাত নরবলি দিয়ে যে দশভূজা দুর্গার পূজা করতো, সেই দেবী আজও বিদ্যমান। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর রাজত্বেও চিৎপুরের জঙ্গলের বিষয় পত্র-পত্রিকায় উল্লিখিত আছে। রেভারেণ্ড লঙ সাহেব লিখেছেন :

Northward was the native town with the old Chitpur Road, as now, in the centre the houses were much mixed up with jungle and surrounded by stagnant pools and all kinds of filth. The jungle on all sides of the city was very thick. (Calcutta Review, 1846)

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'চিৎপুর রোড কলিকাতার একটি অতি পুরাকালের পথ। মোগল বাদশাহদিগের আমল হইতে এই পথটির অস্তিত্ব। তখন ইহার দুই পার্শ্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল। ঐ জঙ্গলের মধ্যস্থলে অপ্রশস্ত বনপথ। এই পথে যাত্রীরা, কাপালিক এবং শাক্ত-সন্ন্যাসীরা, সেই পুরাকালে চিত্রেশ্বরী ঠাকুর দেখিয়া, জঙ্গল সমাচ্ছন্ন চোরঙ্গীর মধ্য দিয়া কালীঘাটে যাইতেন। চিত্রেশ্বরীর নাম হইতেই এই পথটির নাম 'চিৎপুর' হইয়াছে। চিত্রেশ্বরীর মন্দির বহুকালের। স্বনামপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেবের আমলের ব্লাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র এই মন্দিরটি নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়া দেন।'

আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে পুণ্যার্থীগণ পুণ্য সঞ্চয়ের ও ডাকাতরা অর্থ সংগ্রহের জন্য কালীর কাছে নরবলি দিত। ডাকাতদের ধারণা ছিল দেবী প্রসন্না হলে তারা বহু ধনরত্ন পাবে। এখনও বাঙলা দেশের সর্বত্র "ডাকাতে কালী" দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু "ডাকাতে দুর্গা" একমাত্র কাশীপুর-চিৎপুর ছাড়া আর কোথাও আমার নয়নগোচর হয়নি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে লেফটেন্যাণ্ট হিকস্ এই নরবলি প্রথা রদ করতে বিশেষ চেষ্টা করেও তিনি ফলবতী হন নি। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রথা বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল বলে লঙ সাহেব লিখেছেন। Human sacrifices

were also frequent even as late 1832. ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ছয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্যাপ্টেন ক্যাম্বেল ও মেজর ম্যাকফারসন পূজায় নরবলি দেওয়া এ দেশ থেকে বিদূরিত করেন। কিন্তু ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখেও 'সমাচার দর্পণে' হুগলী জেলায় একটি নরবলির সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এই :

কিয়দ্দিবস হইল জেলা হুগলীর অন্তবর্তী কালীপুর গ্রামে এক সিদ্ধেশ্বরী আছেন, তাঁহাকে পূজা করিয়া এক দিবস পূজারীরা দ্বার বন্ধ করণান্তর গমন করিয়াছিল। পর দিবস তথায় আসিয়া ঐ পূজারীরা দেখিলেন যে কতক গুলি ছাগ ও এক মহিষ ও এক নর ঐ সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ছেদিত হইয়া পড়িয়া আছে, ইহাতে তাহারা অনুমান করিলেন যে পূর্বরজনীতে কেহ পূজা দিয়া থাকিবেন ইহাতে পূজারীরা নরবলি দেখিয়া রিপোর্ট করাতে তত্রস্ত রাজপুরুষ অস্ত্র-শস্ত্রাদি সম্বলিত বহু লোক সমভিব্যবহারে তথায় আসিয়া অনেক সন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু অবধারিত হয় নাই, আমরা অনুমান করি যে দস্যুদিগের কর্তৃক এরূপ কর্ম হইয়া থাকিবেক। (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ, ১ম খণ্ড)।

গুণের দিক দিয়ে শক্তির প্রকাশ ত্রিবিধ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। দুর্গাপূজা হচ্ছে রাজসিক পূজা, আসুরিক শক্তির ধ্বংস এই পূজার লক্ষ্য। শক্তি উপাসনার মনস্কামনা সিদ্ধি হয় বলে এ দেশের জনগণ ধন, যৌবন, রূপ, যশ, শত্রু জয় ও সুন্দরী স্ত্রী লাভের জন্য যেমন দুর্গাপূজা করেন, ডাকাতরা ঠিক তেমনি অর্থলাভের জন্য সেকালে কালী পূজা করতো। দুর্গা প্রথমে কিরাত ও শবরগণের উপাস্য দেবী ছিলেন বলে জানা যায়। চিতু ডাকাত কিন্তু কালী পূজা না ক'রে দুর্গাপূজা করতো, এইটি ছিল তার বিশেষত্ব।

চিতু ডাকাতের পুরো নাম ছিল চিত্তেশ্বর রায়। সেকালে তার ভয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোক কম্পিত হতো। আগে থেকে চিঠি দিয়ে, সে ডাকাতি করতে যেতো ও যাবার আগে দেবী দুর্গার ষোড়শোপচারে পূজা ক'রে নর-বলি দিয়ে তার পর চিতু ডাকাত যাত্রা করতো। এই ডাকাতের বংশে পরে রঘু ডাকাতের আবির্ভাব হয়েছিল। ডাকাতির জন্য রঘুর নামও বাঙলাদেশে খ্যাতিলাভ করে এবং তার সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক কথা আজও প্রবাদের মতো প্রচলিত আছে। চিতুর দুর্গা চিতুর দেবী বা চিত্তেশ্বর বলে প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে। নিউরেল সাহেব লিখেছেন :

This traverses the ancient village of Chittrapur, now pronounced Chitpur once famed for the temple of Chittrue Dabi, worshipped here with human sacrifices. (Calcutta —H A. Newell).

প্রাচীন আগমশাস্ত্রে দুর্গামূর্তির নয়টি রূপের বিষয় জানা যায়। মহিষাসুরমর্দিনীর রূপ-কল্পনায় দেখা যায় যে, দেবী দুর্গা দশহস্ত প্রসারিণী, ত্রিলোচনা, নীলোৎপলা ও মস্তকে চন্দ্রকলা সমন্বিত জটামুকুট। অতসী ফুলের ন্যায় গায়ের রঙ, তন্বীকটি, ত্রিভঙ্গিম ঠাম, দক্ষিণ হস্ত সকলে ত্রিশূল, খড়্গ, শক্তায়ুধ, চক্র ও গদা, আর বাঁদিকের হস্ত সমূহে পাশ, অঙ্কুশ, ঘেটক, পরশু ও ঘণ্টা। পদতলে স্কন্ধবিহীন রক্তঝরা মহিষ। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নাগ-পাশবদ্ধ অসুর—অসুরের হস্তে তরবারী ও ঢাল। দেবীর ত্রিশূল অসুরের বক্ষস্থল ভেদ করেছে—রক্তাক্ত অসুরের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর। দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহের উপর ও বাম পদ স্থাপিত মহিষের উপর।

চিতুর পূজিত দুর্গার কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। দেবী অসুরদলনী সিংহবাহিনী হলেও, তাঁর দু-পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী ও কার্তিক-গণেশ নেই। প্রচলিত দুর্গা মূর্তিতে কোথাও ব্যাঘ্র দেখা যায় না, কিন্তু চিতুর দুর্গা প্রতিমার পরিবেশের মধ্যে আছে একটি বাঘ। প্রাচীনকালে কাশীপুর থেকে কলকাতা যখন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল, তখন ডাকাতরা 'বনে-জঙ্গলে বাঘকে সন্তুষ্ট করে পুজো করতো। দক্ষিণরায়ের বাহন হচ্ছে বাঘ। এখনও ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ রায় ও বাঘের পূজা একত্রে হয়। চিতু ডাকাতের পূজিত দেবী দুর্গার নাম হয় চিত্তেশ্বরী ও কাশীপুরের গভীর অরণ্য ছিল চিতু ডাকাতের আবাসভূমি, তাই তার নাম হয় চিত্রপুর। কালক্রমে চিত্রপুর হয়ে যায় চিৎপুর। ডাকাতরা কালীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেকালে নরবলি দিতো, এখানেও চিত্তেশ্বরীর কাছে নরবলি হতো বলে একেও কালী বলে ভ্রমক্রমে অনেকে না দেখে লিখেছেন। রেভারেণ্ড লঙ সাহেব ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চিতু ডাকাতের দেবী চিত্তেশ্বরীর কাছে যে সর্বাপেক্ষা বেশী নরবলি হতো তাও লিখেছেন। তাঁর বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো :

It was then written Chittrapur and was noted for the temple of Chittreswari Devi or the Goddess of Chittru, known among European as the temple of Kali at Chitpore.

According to popular and uncontradicted tradition, this was the spot where the largest number of human sacrifices was offered to Goddess in Bengal, before the establishment of the British Goveanment. (Calcutta Review, Vol. III 1846)

চিতু ডাকাতের দুর্গা, দেবী চিত্তেশ্বরী খুব জাগ্রতা বলে সেকালে খ্যাতি-লাভ করেছিল, তাই দিনের বেলা বহু ধনী ব্যক্তি লোক-লস্কর নিয়ে মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য চিৎপুরের ঘন জঙ্গলে দেবীকে পূজা দেবার জন্য আসতেন। একবার নবাবের সেনাপতি চক্রপানি দত্ত বহু লোকজনসহ চিত্তেশ্বরীকে পূজা দিতে যান, চিতু ডাকাত তখন পূজায় আসীন, চিতু অত সৈন্য দেখে তাদের পূজা দিতে বাধা দিলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয় ও তাতে বহু হতাহত হয়। নবাব সৈন্য চিতুকে ধরে ফেলে, তারপর তার প্রাণদণ্ড হয়।

শ্রীরামপুরের রেভারেণ্ড ওয়ার্ড সাহেব তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও চিৎপুর ও কালীঘাটে নরবলির যে বর্ণনা রেখে গেছেন তাও উল্লেখ্য :

At Chit-pooru and at Kali-ghatue near Calcutta, it is said that human sacrifices have been occassionally offered. A respectable native assured me that at Chit-pooru, near the image of Chittreshwaree, about the year 1788, a decapitated body was found, which in the opinion of the spectator, has been evidently offered on the preceeding night to this Goddess. (History, Literature and Religion of the Hindoos —W. Ward)

চিতু ডাকাতের মৃত্যুর পর দারুবিগ্রহ চিত্তেশ্বরী জঙ্গলে পড়ে রইলেন, বন্ধ হলো তাঁর পুজা-পাঠ। এই ভাবে বহু বৎসর অতীত হবার পর ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নৃসিংহ ব্রহ্মচারী নামে এক তান্ত্রিক সাধু ভাগীরথী তীরে চিৎপুরের বনে যোগ সাধনা করতেন। তখন বহু মৎস্যজীবী এখানে গঙ্গায় মাছ ধরতো এবং তারাই ছিল সাধুর অনুগত ভক্ত। সাধু এখানে তারাচক্র আসন স্থাপনের পর একদিন গভীর রাত্রে চিত্তেশ্বরী তাঁকে জঙ্গল থেকে বের ক'রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বপ্নে নির্দেশ দেন। তিনি পরের দিন বহু অনুসন্ধানের পর দেবীকে উদ্ধার ক'রে তাঁর দারুমূর্তিতে পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী চিত্তেশ্বরীর মূর্তি উদ্ধারের সময় নৃসিংহ ব্রহ্মচারী দেবীর বক্ষস্থলে আটটি চরণে লেখা

দুটি শ্লোক দেখতে পান। তিনি সেই মন্ত্রে পূজা করেন এবং বলা বাহুল্য আজও সেই গুপ্ত মন্ত্রে চিতু ডাকাতের পূজিত দুর্গাদেবী চিত্তেশ্বরীর পূজা হয়।

ভাগীরথী তীরবর্তী কাশীপুরের উক্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম জমিদার মনোহর ঘোষের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বসতি স্থাপনের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় সাধুকে দুর্গা পূজা করতে দেখে কর্মচারীগণ তাঁকে স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু স্থানীয় প্রজাবৃন্দ সাধুর অলৌকিক শক্তির কথা জমিদারকে জানালে তিনি দেবীর জন্য ৩৬ বিঘা জমি সাধুকে ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ দান করেন এবং মনোহর ঘোষই চিত্তেশ্বরীকে প্রথম কুটির থেকে একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে তাঁকে সেখানে সংস্থাপিত করেন। পুরাতন মন্দির ভগ্ন হলে ১২৮৬ সালে কাশীপুর নিবাসী স্বর্গীয় কুমার কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের বণিতা শ্রীমতী সূর্যরাণি দাসী বর্তমান মন্দির নির্মাণ ক'রে দেন বলে একটি ফলকে উৎকীর্ণ আছে।

শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত বিরাট নাটমন্দিরের মধ্যে এই দেবীকে ভূসম্পত্তি দান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি আর একটি ফলকে লেখা আছে :

"শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দুর্গাদেবী* ৩৫৬ বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ অগ্রদ্বীপের ও ঘোষপাড়ার বাসুদেব ঘোষের বংশধর বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানায় কুলাই গ্রামের জমিদার মনোহর ঘোষ ও তাঁহার পত্নী শেওড়াফুলী রাজার কন্যা উভয়ে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির স্থাপন করিয়া কিছু ভূসম্পত্তিসহ তদীয় সেবায়েত মহান্ত ৺নৃসিংহ ব্রহ্মচারীকে দান করেন। পূর্বে চিতু ডাকাত এই দেবীকে পূজা করিতেন।"

দেবীর প্রথম সেবায়েত এই বিধান ক'রে যান যে, তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে যিনি সেবায়েত হবেন, তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকবে ও তিনি বিবাহ করতে পারবেন না। সাত পুরুষ ধরে শিষ্য পরম্পরায় উক্ত নিয়ম পালিত হয়। কিন্তু অষ্টম সেবায়েত শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী সর্বপ্রথম বিবাহ করেন ও তাঁর হয় দুটি কন্যা। কনিষ্ঠা কন্যা ক্ষেত্রমণির সঙ্গে হালিশহরের আনন্দমোহন রায়চৌধুরীর বিবাহ হয় ও তাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম চণ্ডীচরণ ও তারাচরণ। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীচরণের সময় ইংরেজ সরকার কাশীপুরে কামান ও গোলাবারুদ

---

* বহু প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী 'দুর্গা' দেবীকে কেবল 'কালী' বলে ভুল লেখা হয়নি, তাঁর নামও 'চিত্তেশ্বরী'র বদলে 'চিত্রেশ্বরী' বলে উক্ত হয়েছে দেখা যায়। এই দুটি ভুলই মারাত্মক। —লেখক

তৈরী করার কারখানা করার জন্য ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে চিত্তেশ্বরীর ২৪ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে গঙ্গার ধারে "কাশীপুর গান শেল ফ্যাক্টারী" প্রতিষ্ঠা করেন। চণ্ডীচরণের পর তাঁর ভাই তারাচরণ, তারপর তৎপুত্র পঞ্চানন সেবায়েত হন। তিনি অকালে একপুত্র ও দুই কন্যা রেখে পরলোকগমন করলে তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মচারিণী বিল্বমাতা দেবী সেবার ভার গ্রহণ করেন। এবং আজও তিনি সেবায়েতরূপে চিত্তেশ্বরী দুর্গামাতার সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে প্রত্যহ সম্পাদন করছেন। তাঁর পুত্রের নাম রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

চিতু ডাকাতের চিত্তেশ্বরী দুর্গার দারুমূর্তি পুরাবস্তু হিসাবে বাঙলাদেশের প্রাচীন অন্যতম পুরাকীর্তি। কারণ চারশো বছরের প্রাচীন দুর্গামূর্তি আর কোথাও দেখা যায় না। দেবী পূর্বে ছিলেন পশ্চিম-মুখিনী; কথিত আছে রামপ্রসাদকে গান শেখাবার জন্য তিনি হন দক্ষিণ-মুখিনী। একদা রামপ্রসাদ হালিশহর থেকে গান গাইতে গাইতে কলকাতা আসছেন, এমন সময় তাঁর প্রাণারাম সঙ্গীত লহরী শুনে চিত্তেশ্বরী মন্দির থেকে একটি কুমারী তাঁকে দাঁড়িয়ে গান গাইতে অনুরোধ করলে, মাতৃসঙ্গীতে বিভোর রামপ্রসাদ বালিকাকে বলেন—"গান শুনবি তো ফিরে তাকা"। বালিকা তখনি অন্তর্হিত হলেন, আর সাধানমগ্ন সেবায়েত পরে দেখলেন যে, দেবী চিত্তেশ্বরী হয়েছেন দক্ষিণাস্যা। ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পণ্ডিত শিবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ লেখকগণ তাঁদের গ্রন্থে এই অলৌকিক ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

রবিবাসরের একটি অধিবেশন ১৩৫৯ সালে লেখক চিত্তেশ্বরী মন্দিরে আহ্বান করেন এবং "দেবী চিত্তেশ্বরী ও চিৎপুরের ইতিকথা" নামে একটি প্রবন্ধও পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধটি ১৩৬০ সালে চৈত্র মাসে তৎসম্পাদিত 'সব্যসাচী' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। তারাচক্রে পঞ্চমুণ্ডির আসন ও বঙ্গের প্রাচীনতম দুর্গামূর্তি দর্শন করে সাহিত্যিকগণ অভীভূত হন। অসুরদলনী দুর্গা হচ্ছেন পূর্ণ শক্তির প্রতীক। তাঁর বিভিন্ন রূপ কল্পনা ও আরাধনার দিক বিচার করলে দেখা যায় যে, সেখানে যেমন আছে আত্মোন্নতির প্রার্থনা, সমষ্টি কল্যাণের ইঙ্গিত, তেমনি আছে দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। সেই আহ্বান সার্থক রূপ লাভ করুক, মায়ের কাছে দীনের এই প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথও দেশমাতৃকার বন্দনায় মায়ের উদ্দেশে তাই বলেছেন:

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,—
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র আগুনবরণ।

ওগো মা তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে !
তোমার দুয়ারে আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি—
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী।"

প্রাণকৃষ্ণবাবুর দুর্গোৎসব

দুর্গাপূজা বাঙলার জাতীয় উৎসব। এ রকম মহোৎসব ভারতবর্ষে আর কোথাও হয় বলে শোনা যায় না। আঠারো ও উনিশ শতকে দুর্গাপূজার জন্য ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে, একমাত্র কলকাতায় ব্যয় হতো পূজায় তখন পাঁচলক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যানি পার্কস তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে দুর্গাপূজার একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: 'দুর্গা' নামে হিন্দুদের যে প্রসিদ্ধ দেবী আছেন, তাঁরই সম্মানে যে উৎসব হয়, তার প্রস্তুতি চলে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষ থেকে। শুক্লপক্ষের পাঁচ দিন পরে ষষ্ঠীর দিন দুর্গা জেগে ওঠেন ও সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন চলে তাঁর পূজা ও মহাসমারোহে দেবীর 'অনারে' হয় উৎসব। নবমী পূজার দিন দেওয়া হয় বলিদান, এবং সেদিন এক কোপে পশু বলি দিতে না পারলে পূজা না কি নিরর্থক হয়। দশমীর দিন দুর্গাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে উৎসবের হয় পরিসমাপ্তি। ধনী বাঙালীবাবুরা পূজাব সময় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, তার কোন হিসেব পাওয়া যায় না। আর একজন ভ্রমণকারী "স্কেচেস অফ ইণ্ডিয়া"তে লিখেছেন Hindoos will profusely lavish his treasures in rist in festivities, তিনি ১৮১১—১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে ছিলেন।

সে সময় কলকাতায় যত ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হতো, তাদের সকলকে টেক্কা মারেন চুঁচুড়ার বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার। তাঁর কথা পূর্বের নিবন্ধে কিছু উল্লিখিত হয়েছে। পূজার কয়দিন বাইজীদের নাচগান ছাড়া সহেবদের জন্য থাকতো সুরার সুব্যবস্থা। হ্যাচিসন সাহেব তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা রেখেছেন। যথা:

Tables were spread with profusion of viands, wines of every species, sparkling in vases of crystal and every expensive European beverage that could be thought of to excite appetite and delight.

হালদার মশাই "অ্যাপিটাইট" ও "ডিলাইট" বাড়াবার জন্যে পূজোপলক্ষে চুঁচুড়ায় তার প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকায় পূজায় কেবল তিন দিন নয়, তিনি সমাগত আহূত অনাহূত অগণিত ব্যক্তিকে নাচগানে ও পানভোজনে দশ দিন ধবে আপ্যায়িত করতেন। প্রতি বছর দুর্গাপূজায় তাই তাঁর ব্যয় হতো লক্ষাধিক টাকা। তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রিত ও রবাহূতের মধ্যে ছিল না কোন ভেদাভেদ। এ সব ছাড়া তিনি দরিদ্রদের বিতরণ করতেন প্রতি বছর বেশ কিছু নতুন কাপড়।

প্রাণকৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণপ্রসাদ হালদার উনিশ শতকে কলকাতার ৮২ জন ধনী ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন ৩৩ তম ধনী। "A short accounts of the residents of Calcutta in the year 1822, classified according to the ranks at the town" নামক পুস্তকে এ কথা লেখা আছে। তিনিও তৎকালীন ধনী ব্যক্তিদের প্রথামত হিন্দু ধর্মোক্ত দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি নানা ক্রীড়া কলাপাদি করতেন কলকাতা ও চুঁচুড়া শহরে। কৃষ্ণপ্রসাদ কলকাতা শুল্কাগারের কালেকটার সাহেবের সঙ্গে প্রথমে কাজ করতেন, পরে ব্যবসায় অর্জন করেন প্রচুর অর্থ, ক্রয় করেন বিশাল জমিদারী এবং স্থান করে নেন কলকাতার বিলাসী ধনী সমাজের একজন প্রধান হিসেবে। তাঁর তিন পুত্র নীলমণি, বিশ্বম্ভর ও প্রাণকৃষ্ণের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ ছিল তাঁর সর্বকনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমণিও লাট সাহেবের ন্যায় আট ঘোড়ার গাড়ী ভিন্ন চলিতেন না। এবং পিতার সঞ্চিত বহু অর্থ অপব্যয়ের পর কলকাতায় জানবাজারের বাড়ী বিক্রি করে তিনি কটকে বাস করেন বলে পূর্বোক্ত পুস্তকে লেখা আছে। যথা:

CRISHNAPERSAUD HALDAR

..."a great part (of accumulated money) has been wasted extravagantly by his eldest son Neelmoney Haldar whose house and property in Jon Bazar being sold he resides now at Cuttack and his brothers Viswambher and Prancrishna Haldar are living happily at Chinsurah." (Page—14)

কৃষ্ণপ্রসাদের কনিষ্ঠপুত্র প্রাণকৃষ্ণের কথা ১৮২২ সালে প্রকাশিত পুস্তকে স্থান পায়নি। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীলমণির মতন তিনিও পরিণাম চিন্তা না করে সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য কী ভাবে ধ্বংস হয়েছিলেন আলোচ্য নিবন্ধটি তারই একটি জলন্ত প্রমাণ।

তাঁর দুর্গাপূজার বিষয়ে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর তারিখের "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত একটি সংবাদের এই প্রসঙ্গে কয়েক লাইন উল্লেখনীয়।

পূজায় স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত থাল গাড়ু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্বত্র এক দৃষ্টান্তস্থলের ন্যায় হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই ইহাতে বাবু মহাশয়েরা ও অধ্যক্ষ সকলে অবশ্য ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কলিকাতা ভবানীপুর চুঁচুড়া নপাড়া চন্দননগর প্রভৃতি নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি এবং ইংরাজ প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রাণকৃষ্ণের বিলাসিতার কথা সেকালে লোকস্মৃতিতে প্রবাহিত হতে হতে শেষে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। সুশীলকুমার দে 'বাংলা প্রবাদে' তার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রবাদটি হচ্ছে :

ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার॥

সেকালে অভিজাত পরিবারগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য পূজায় যে রকম অর্থব্যয় করতেন, তা দেখে সংবাদপত্রগুলিও মধ্যে মধ্যে (সমাচার দর্পণে) "এ নাচের সময় কয়েক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংলণ্ডীয়েরা সে স্থানে একত্রিত হইতেন তাঁহারা সাধারণ এবং মদ্যপান করলে আপনাদের ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম বলে" ক্ষীণস্বরে তারা প্রতিবাদ করতেন।

প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য যে, তিনি দুর্গাপূজা উপলক্ষে

ব্যক্তিগত ভাবে বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা ছাড়ও সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে সর্বসাধারণকে তাঁর বাড়ীতে দশদিনের জন্য উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ জানাতেন। এরূপ নজির বাঙলাদেশে আর কারও নেই। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই দশদিন হালদার মশাই তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হবার জন্য যে আমন্ত্রণ লিপি কলিকাতা গেজেটে (২০ সেপ্টেম্বর ১৮২৭) প্রকাশ করেন সেই লিপিটি "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" গ্রন্থের ২য় খণ্ড থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

Grand Nauches Doorga Pooja Holidays

Babooo Prankissen Holdar of Chinsurah

Begs to inform the Ladies and Gentlemen, and the public in general, that he has commenced giving a Grand Nauch this day, that it will continue till the 28th instt. Those Ladies and Gentlemen who have received Invitation Cards are respectfully solicited to favour him with their company on the days mentioned above, and to those to whom the Invitation Tickets have not been sent (strangers to the Baboo) are respectfully solicited to favour him with their company.

Baboo Prankissen Holdar further begs to say, that every attention and respect will be paid to the Ladies and Gentlemen who will favour him with their company, and that he will be happy to furnish them Tiffin, Dinner, Wines, etc. during their stay there.

PRANKISSEN HOLDAR

Chinsurah September 14, 1827.

পনেরো বছর ধরে বাঙলা দেশের সকলের ওপর টেক্কা দিয়ে দুর্গাপূজা করে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের পরিণাম চিন্তাহীন অপব্যায়ের জন্য তাঁর সর্বনাশ ঘনিয়ে এলো। সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য শেষে তিনি মাটির নীচে গুপ্তগৃহ তৈরী করে নোট জাল করতে শুরু করলেন। শেষের ঘটনা খুবই মর্মান্তিক। বাবুর মধ্যে যিনি ছিলেন অগ্রগণ্য সেই প্রাণকৃষ্ণ নোট জালের

অপরাধে ধরা পড়লেন। বাঙলার জনসাধারণ এই খবরে শুধু মর্মাহত নয় ব্যথিত হলেন। তাঁর বিচার হলো কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে। দেশের সব বিশিষ্ট লোক বিচারকের কাছে এক যুক্ত আবেদনে বলেন যে, প্রাণকৃষ্ণ হচ্ছেন দরিদ্রের বন্ধু, ব্রাহ্মণ ও ধনীব্যক্তি, তাঁকে দয়া করে শাস্তি কম দিন। কিন্তু বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন: যতদিন ইংরেজের আইন থাকবে ততদিন এক দোষে ব্রাহ্মণ বলে সে সাজা কম পাবে, তা কখনও হতে পরে না।

Brahmins should suffer a less severe punishment than any other person for an offence, for such a principle has never been recognised nor ever will be recognised so long the English law exists.

বিচারক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ মার্চ তাঁর দীর্ঘ রায়ে প্রাণকৃষ্ণ ৬০ লক্ষ টাকা জালিয়াতি করেছেন বলে, তাঁকে সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। কেন জানি না, বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার নোট জাল করেছিলেন, তখন একথা কেউ বিশ্বাস করেননি এবং তাঁর দ্বীপান্তরেব সংবাদে বাঙলার নরনারী তখন অশ্রুপাত করেছিল। তাঁর সতের বিঘা জমির ওপব চুঁচুড়ায় গঙ্গারধারে বিরাট প্রাসাদ মাত্র ২৩ হাজার ৩ শো ৩৩ টাকায় কিনলো সরকার; এখন সেই ভবনেই রয়েছে "হুগলী মহসীন কলেজ।" ম্যাকেঞ্জী ল্যায়াল কোম্পানী তাঁর কলকাতার হেয়ার ষ্ট্রীট, রাসেল ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট, থিয়েটার রোড, চৌরঙ্গী প্রভৃতি আটটি প্লটের "extensive and valuable landed property" সব ২৭ জুলাই ১৮২৯ সালে জলের দামে নিলামে বিক্রী করে দিলেন। এখনও হুগলী কলেজে গেলে প্রাণকৃষ্ণের কথাই আমার স্মৃতিপথে প্রথম উদয় হয় আর তাঁর পরিণতির কথা ভেবে চোখ হয়ে যায় অশ্রুসিক্ত।

পাণ্ডুয়ার দুর্গোৎসবের শতবার্ষিকী

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সারা বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় সব জমিদার বাড়িতেই দুর্গাপূজা সুরু হয়।

হুগলী জেলায় যে রকম ধুমধামের সঙ্গে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হতো, সে রকম ধুমধাম আর কোথাও হতো না। চুঁচুড়ায় বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের প্রাসাদোপম ভবনে পূজার উৎসব চলতো দশ দিন ধরে। আর তখন নৃত্যগীত পানাহার যে রকম হতো, তা কলকাতার পূজাকেও ম্লান করে দিতো। প্রাণকৃষ্ণবাবুর পূজায় ব্যয় হতো প্রায় লক্ষ টাকা। তাই এই দুর্গাকে লোকে বলতো লক্ষেশ্বরী দুর্গা। হালদার মশায়ের বাড়ীতে এখন হয়েছে হুগলী মহসীন কলেজ। পূর্বের নিবন্ধে তার বিষয়ে বলা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় চুঁচুড়ার পাশে হুগলী জেলার একটি বৃহৎঅঞ্চল পাণ্ডুয়া থানার একশো দশ বর্গ মাইল এলাকা দুর্গা পূজা বা তার উৎসব থেকে বঞ্চিত ছিল। একদা এই স্থান হিন্দু রাজার দ্বারা শাসিত হলেও, সাহাসুফি সেই হিন্দু রাজাকে হারিয়ে পাণ্ডুয়ার শাসনকর্তা হন; তখন থেকেই পাণ্ডুয়া হয়ে যায় একটি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানকার এই সব অবাঙ্গালী মুসলমানদের দোর্দণ্ড প্রতাপে হিন্দুরা বহু বর্ষ ধরে তাদেব হিন্দুধর্মোক্ত সব ক্রিয়া কর্ম থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই এখানে কোন হিন্দু তাদের ভয়ে দুর্গাপূজা করতে পারেনি।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় হিন্দুরা প্রথম দুর্গাপূজা করার জন্য জেলার তৎকালীন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেনরী জেমস নিউবেরীর কাছে আবেদন করেন। হিন্দুরা দুর্গাপূজা করবে জেনেই মুসলমানরা তখন শান্তিভঙ্গ হবে বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে পাল্টা আর একটি দরখাস্ত করে পূজা বন্ধ করতে বলেন। এই কথা শুনে হিন্দুরা আন্দোলন সুরু করলে কলকাতায়। মুসলমানদের বাধায় হিন্দুদের ধর্মকর্ম ব্যাহত হবে এ কি রকম কথা? কলকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী; সারা ভারতের সমস্ত নেতৃস্থানীয় হিন্দু রাজা মহারাজা ও দেশীয় নৃপতিরা সব তখন কলকাতায় যাওয়া আসা করেন। তাঁরা সকলে একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল "সোমপ্রকাশের" সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পাণ্ডুয়ায় দুর্গাপূজা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন সুরু করেন।

বলা বাহুল্য এক জোট হয়ে হিন্দুধর্মের জন্য বাঙলার হিন্দুদের ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হবার দশ বছর আগে হয় এই আন্দোলন।

পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী ইলছোর্ধ-মণ্ডলাই নিবাসী দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ ও পাণ্ডুয়ার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই পূজার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখনও স্থাপিত হয় নি। একটি পূজাকে উপলক্ষ্য করে সেই

প্রথম বাঙলার সব হিন্দু ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে একতাবদ্ধ হন। পাণ্ডুয়ার দুর্গাপূজা সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত হিন্দু পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হলে ইহা ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্যার রিচার্ড টেম্পল ছিলেন তখন বাঙলার ছোটলাট। তখনকার বাঙলাদেশ মানে বঙ্গ-বিহার-ওড়িষ্যা সহ বঙ্গপ্রদেশ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি।

পাণ্ডুয়ায় প্রথম যিনি দুর্গাপূজা করেন তাঁর Memorial বা দরখাস্ত ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের কাছে পৌঁছিলে তিনি তদন্ত করার জন্য ঐ মেমোরিয়াল হুগলীর জেলাশাসক নিউবেরী সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলে ও বলে দিলেন যে, তিনি স্বয়ং তদন্ত করে যেন সত্বর রিপোর্ট তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। কারণ পূজার ছিল তখন মাত্র তিন দিন বাকী।

নিউবেরী সাহেব স্বয়ং পাণ্ডুয়ায় গিয়ে যাবতীয় ঘটনার তদন্ত করে সমস্ত ছোটলাট টেম্পল সাহেবকে জানালে তিনি পাণ্ডুয়ায় দুর্গাপূজা করার আদেশ দেন। এবং বলে দেন যে, বিনাবাধায় যাতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, সে দিকে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে। দুর্গাপূজা করার সংবাদ যে দিন পাণ্ডুয়ায় পৌঁছে, সে দিন ছিল ষষ্ঠী। সংবাদ পাওয়া মাত্র হিন্দুদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। হুগলীর সমস্ত নেতৃস্থানীয় ও চিন্তাশীল হিন্দুরা সকলে একদিনের মধ্যে সব জোগাড় করে ফেললেন। কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে পাণ্ডুয়ায় প্রথম দুর্গাপূজা হবে এই বলে সংবাদ ঘোষিত হলো।

জেলা শাসক নিউবেরী সাহেব যাতে পূজা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, তার জন্য পাণ্ডুয়া থানায় নির্দেশ দেন। থানার দারোগা ছিলেন কৈলাসবাবু (কৈলাসচন্দ্র রায়) তিনি পূজা বাড়ীতে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীর দিন পূজার সময় বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করেন। পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রাম থেকে হাজার হাজার হিন্দু নরনারী দুর্গাপূজা দেখে গেলেন। কিন্তু ভয় ছিল বিজয়াদশমীর দিন; সেই দিন পাছে মুসলমানরা পথিমধ্যে বিসর্জনের আগে দুর্গা প্রতিমা ভেঙে দেয়। তাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং বেলা ২ টার সময় হুগলীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডবলিউ, ডি, প্রাট, দুজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর, চার জন হেড কনষ্টেবল ও ২০জন সশস্ত্র কনষ্টেবল নিয়ে ট্রেনে পাণ্ডুয়া এসে উপস্থিত হলেন। থানা তখন ছিল গ্রামের ভিতরে। তাঁরা সকলে থানায় গিয়ে কৈলাস বাবু ও তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের নিয়ে পূজা বাড়ীতে গেলেন। বিসর্জন দেখার জন্য সেদিনের মত এত জন-

সমাগম কোন গ্রামে কখনও এর আগে হয়নি।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন পূজা বাড়ীতে গেলেন তখন বেলা প্রায় ৩টা। তাঁর ইচ্ছা ছিল বেলাবেলি ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হবে, কিন্তু তা আর হল না। কারণ তখন ছিল বারবেলা; সন্ধ্যা ৫॥ টার পরে বারবেলা অতীত হয়ে গেলে দুর্গা প্রতিমা শোভাযাত্রা করে বিসর্জন দেওয়া হলো। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট সহ পুলিশ বাহিনী ও অসংখ্য ব্যক্তি শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন এবং মুসলমানরাও করুণ দৃষ্টিতে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য সেদিন দেখেছিল।

স্যার রিচার্ড টেম্পলের মুহানুভবতায় পাণ্ডুয়ার হিন্দুগণ তারপর কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজাও সেই বছর করেন। এই দুর্গা পূজার তেত্রিশ বছর পর হুগলী জেলার মুখপাত্র "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" (২১ কার্তিক ১৩১৬) লেখেন:

"কীর্তিযস্য স জীবতি"॥ স্যার রিচার্ড টেম্পল মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি পাণ্ডুয়ায় হিন্দুগণের নিকট অমর হইয়া রহিয়াছেন! পাণ্ডুয়ায় দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি প্রতিমা পূজা হওয়া স্যার রিচার্ড টেম্পলের ধর্ম সম্বন্ধীয় "রিলিজিয়াস মনুমেণ্ট" স্বরূপ। অতঃপরে যত কাল পাণ্ডুয়ায় দুর্গা-প্রতিমা পূজাদি হইবে, ততদিন তাঁহার কীর্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। পাণ্ডুয়ার মন্দির (মিনার?) যেরূপ মুসলমান বাদশাহার কীর্তি স্বরূপ, সেইরূপ তথায় দুর্গাপূজাদি স্যার রিচার্ড টেম্পলের কীর্তিস্বরূপ।"*

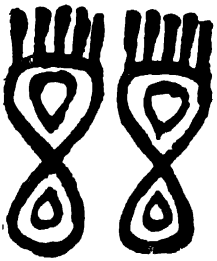

রঙ্গমঞ্চে প্রথম দুর্গাপূজা

কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে দুর্গাপূজার দৃশ্য প্রথম দেখান হয় ১২৮৮ সালের ১৬ শ্রাবণ ন্যাশনাল থিয়েটারে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের "রাবণ বধ"

---

* অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাণ্ডুয়া সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ এই লেখকের হুগলী জেলার দেবদেউল ও হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ নামক গ্রন্থগুলিতে পাবেন।

নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের দৃশ্যটি অভিনিত হবার পর, গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। যদিও এর আগে 'আনন্দ রহো" নামে তাঁর একটি নাটক ঐ রঙ্গমঞ্চে ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে অভিনীত হয়েছিল, তথাপি অভিনেতা হিসেবে তার সুনাম থাকলেও নাট্যকার বলে নাট্যরসিকদের কাছে তিনি রাবণবধের জন্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব রঙ্গমঞ্চে দেখাবার ভার নিয়েছিলেন সেকালের খ্যাতিমান নাট্যশিল্পী ধর্মদাস সুর। তিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্তি ও চালচিত্র প্রভৃতি পিসবোর্ড কেটে খুব সুন্দরভাবে তৈরী করেছিলেন এবং মাঝখানে সুবিখ্যাত অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণিকে দুর্গা সাজিয়ে অভিনয় করাব তিনি ব্যবস্থা করেন। দর্শকদের চমক লাগিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে ধর্মদাসবাবু কুমারটুলি থেকে আটটি মাটির হাত তৈরী করে আনেন। অভিনয়ের দিন তিনি মাটির হাতগুলি চিত্রিত ও রত্নালঙ্করে ভূষিত করে ক্ষেত্রমণির পিঠে খুব দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিলেন, যাতে হাতগুলি স্থানচ্যুত না হয়। তারপব দুর্গার মত গায়ের রঙ করার জন্য তাঁর মুখে হরিতাল ও গর্জন তেল মিশিয়ে খুব ভাল করে মাখিয়ে দিলেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় "কজ্জলে নয়ন, অলক্তে অধর, মসীতে ভ্রুদয় চিত্রিত করলেন।"

'রাবণ বধ' নাটকে সেদিন রামের ভূমিকায় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাবণ—অমৃতলাল মিত্র, লক্ষণ—মহেন্দ্রনাথ বল, নিকষা, কালী, দুর্গা ও ত্রিজটা —ক্ষেত্রমনি, সীতা—বিনোদিনী, বিভিষণ—অমৃতলাল বসু, মন্দোদরী--কাদম্বিনী হনুমান—অঘোরনাথ পাঠক, সুগ্রীব—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং ইন্দ্র—বেলবাবু অভিনয় করেন।

অভিনয় যেদিন খুব সুন্দর হয়েছিল। অভিনরের পরদিন "অমৃত বাজার পত্রিকায়" ৩১ জুলাই ১৮৮১ যে সংবাদটি অভিনয় সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকেও এটা বোঝা যায়। যথা:

There was a grand performance at National Theatre, last saterday and we congratulate the management on the signal success achieved on the occasin. A new drama Rabon Badh—destrnction of Ravana written in verse by the "Garrick of the Hindu stage" and the new and the splendid sceneries and the dress to say nothing of the histrioric

talents of the actors and actresses, called forth repeated and enthusiastic applanse.

রাবণ বধ নাটকে দুর্গোৎসব দৃশ্যটি অভিনীত হতো প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ক্ষেত্রমণি দশভূজা দুর্গা সেজে তার দুহাতে ঢাল তরোয়াল নিয়ে কাঁধে ও পিঠে দৃঢ়বদ্ধ আটটি হাতের আধমন বোঝা চাপিয়ে, তার এক পা সিংহের ওপর আর অন্য পা অসুরের কাঁধে রেখে নিশ্চল পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন। আর তাঁর দুপাশে আছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি ও তাদের মাথার উপর আছে বিরাট চালচিত্র।

প্রথমে গন্ধর্বগণ কর্তৃক একটি গান হবার পর রামচন্দ্র বিভীষণকে বলতে থাকেন: মিত্র, মায়ের পূজা করছি, কিন্তু অভয়ার অভয়বাণী শুনতে পাচ্ছি না। বিভীষণ তখন বললেন: দেবীদহ থেকে নীলপদ্ম এনে দেবীর পূজা করুন।

রামচন্দ্র বললেন: দেবীদহ দেবের অগম্যস্থান সেখানে কে যাবে? হনুমান বললেন: আপনার পদ ধূলি পেলে, আমি এখুনি ফুল আনতে পারি। রামচন্দ্র হনুমানকে আশীর্বাদ করলেন। হনুমান ফুল আনতে চলে গেল। শ্রীরামচন্দ্র তখন দেবীর স্তব করতে লাগলেন।

নমস্তে সর্বাণি শিব-সীমন্তিনী
নমস্তে বগলে, কল্যাণী কমলে,
মাতঙ্গি মহিষ-মর্দিনি!
নমঃ শবাসনা, দিগ্‌বসনা.
হরবরাঙ্গনা, চন্দ্রচূড়া চণ্ড-বিনাশিনি!

এদিকে দুর্গারূপী ক্ষেত্রমনির পিঠে আধমন ওজনের আটটি মাটির হাতের গুরুভার ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে উঠলো। তার ওপর বাদলার মালা। আঁচলা প্রভৃতি নানান সাজে আচ্ছাদিত হয়ে ও সামনে ধূপ ধুনার গন্ধে ও ধোঁয়ায় এবং গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় তাঁর শরীর এমন ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো যে, তিনি অত্যন্ত গরম বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ষ্টেজের ওপর। হনুমান পদ্ম এনে দিলে, রামচন্দ্র দেবীর পদে একটি একটি করে পদ্ম অর্পন করে দেখলেন যে, একটি পদ্ম কম। তিনি তখন হনুমানকে বললেন: আর পদ্ম কোথায়? হনুমান বললো: আমি ১০৮টি পদ্ম গুনে গুনে এনেছি। প্রভু এই ১০৮টি পদ্মই দেবীদহে ছিল।

রামচন্দ্র বললেন: তবে কি দেবী আমায় ছলনা করছেন? মা, অভাগা

সন্তানকে আর বিড়ম্বনা করোনা, বলে তিনি আবার দুর্গার স্তব করতে লাগলেন :

কাতরে করুণা কর, হর-হৃদি-বিলাসিনি !
দীন জনে দেখা দে মা, দনুজদল-নাশিনি।
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাখ মা অভয়পদে,
বর দে গো সুবরঙ্গে, রক্ষ রণে দাক্ষায়নি !

রামবেশী গিরিশচন্দ্র যখন রক্ষয়ণে দাক্ষায়নি বলে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন, তখন দুর্গারূপিনী ক্ষেত্রমনির সর্বাঙ্গে ঘাম ও রঙে মিশে তার চোখে পড়ছে। সারা দেহে তার তখন অসহ্য জ্বালায় যেন জ্বলে যাচ্ছে। তবুও তিনি ধৈর্য সহকারে পলকহীন নেত্রে প্রতিমার মত ঠিক দাঁড়িয়ে কেবল প্রার্থনা করতে লাগলেন, মা আজ আমায় রক্ষা কর।

প্রায় আধঘণ্টা এই ভাবে ক্ষেত্রমণি যখন দাঁড়িয়ে আছেন, তখন রামচন্দ্র বললেন : লোকে আমার পদ্মআঁখি বলে ডাকে, তাই আমি আমার একটি চক্ষু দেবীর পদে অর্পণ করবো। এই বলে তিনি যখন নিজের চক্ষু বিদ্ধ করতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় নিশ্চল দুর্গা প্রতিমা নড়ে উঠলো ; দুর্গা বেশধারিনী ক্ষেত্রমণি তাঁর হাত প্রসারিত করে "কি কর, কি কর' বলে উঠলেন, তখন দর্শকগণ বিস্ময় রসাপ্লুত মনে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল। কারণ বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই ধরনের দৃশ্য দেখানো হলো এই প্রথম। দর্শকগণ মহানন্দে তখন হর্ষধ্বনি করে ক্ষেত্রমনির জয়ধ্বনি করতে লাগলো।

রামচন্দ্রের প্রতি দুর্গাবেশধারিনীর দীর্ঘ অভয়বাণী শেষ করবার পর—যখন অন্যরাগণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সুমধুর স্বরে গান গাইছেন, ক্ষেত্রমণি তখন থর থর করে কাঁপছেন। তারপর ধীরে ধীরে তৃতীয় অঙ্কের যখন যবনিকা পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রমণিও অজ্ঞান হয়ে স্টেজে পড়ে গেলেন। দর্শকরা বাইরে যখন তাঁর অভিনয়ের জন্য করতালি দিচ্ছেন, ষ্টেজের ভিতরে তখন হৈ চৈ পড়ে গেল। তাঁর গা থেকে নানাপ্রকার সাজ, মাটির হাত সব খুলে ফেলা হলো। ডাক্তার এলো—অনেকক্ষণ চিকিৎসার পর ক্ষেত্রমনির জ্ঞান আবার ফিরে এলো।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি এই নাটকে তাঁদের অভিনয় ও দৃশ্যপটের জন্য হলেও গিরিশচন্দ্র কিন্তু শিল্পী ধর্মদাস সুরের উপর সেদিন খুব রেগে যান। যদিও তিনি জানতেন যে, ধর্মদাসের দুর্গার দৃশ্যটির জন্যই 'রাবণ বধ' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

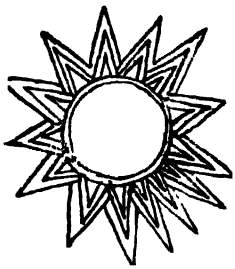

দুর্গাপূজা ॥ সেদিন থেকে এদিন

আমরা—বাঙালীরা—যেরকম ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা করি, এদেশের অন্য অন্য কোনো প্রদেশের লোকে ঠিক সে রকমটি করেন না।

দুর্গতি নাশ করেন, তাই তিনি দুর্গা। 'দুর্গতি নাশয়তি ইতি দুর্গা'—শাস্ত্রবাক্য। দেবী শক্তিশালিনী বীর্যবতী, তাই সিংহবাহিনী। পাপ দমনকারী তাই মহিষমর্দিনী। শোভারূপে তিনি কার্তিক জননী। সিদ্ধিরূপে তিনি গণেশ জননী। ঐশ্বর্যরূপে লক্ষ্মী ও বিদ্যারূপে সরস্বতী সহ বিরাজিতা।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে নানা বেশে শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত নবরাত্র ব্রতীঘট স্থাপন ক'রে সামান্য আয়োজন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান হয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আচার প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে সর্বভারতীয় ব্রতপূজাদির পরিচয় প্রদানে লেখা আছে—প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় দিন নবরাত্র নামে প্রসিদ্ধ। বাঙলা ভিন্ন আর কোনো প্রদেশে দুর্গাপ্রতিমা পূজার নিয়ম নাই। কিন্তু ওই প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া নয় দিন যাবৎ প্রায় সর্বত্রই ঘটস্থাপন, দেবীর পূজা ও চণ্ডীপাঠাদির বিধি আছে। নবরাত্রি উপলক্ষে দ্রাবিড়ে বেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুর পূজা* পঞ্চমীর দিন উপাঙ্গললিতা ব্রত, সপ্তমীর দিন পুস্তকমণ্ডল ও সরস্বতী পূজা, অষ্টমীর দিন দুর্গাষ্টমী বলিয়া দুর্গার পূজা এবং মহানবমীতে অস্ত্র আয়ুধাদির পূজার ব্যবস্থা আছে।

দেবীভাগবতে (৩ স্কন্ধে, ২ অধ্যায়) লেখা আছে—দেবী দুর্গা প্রথমে কোশলে প্রখ্যাতা ও পূজিতা হ'ন, তারপর ভারতের সর্বত্র সর্বসাধারণের মধ্যে দুর্গাপূজা প্রবর্তিত হয়।

প্রতিমা নির্মাণ ক'রে দশভূজা দুর্গার পূজা দিনাজপুরের রাজা গণেশ মতান্তরে তাহেরপুরের রাজা কন্দর্পনারায়ণ প্রথম করেন। তারপর নবাব

---

* লেখকের "দক্ষিণের দেবস্থান" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আলিবর্দীর সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আধুনিক দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। তাঁর অনুকরণে বড় বড় জমিদারগণ মহাপূজার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমশ তাঁদেরই চেষ্টায় তা বিস্তৃতিলাভ করে। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

কবি কৃত্তিবাস তাঁর রচিত রামায়ণে লিখেছেন, রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে বোধন করে দুর্গাপূজা করেছিলেন। কিন্তু বাল্মীকি রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণে দুর্গাপূজার কোনো উল্লেখ নেই। তৎকালীন দেশাচারের জন্য শাক্তকবি কৃত্তিবাস বাঙালীর মনস্তুষ্টির জন্য সম্ভবত এই কল্পিত ঘটনাটি তাঁর রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীকালে তুলসীদাস তাঁর হিন্দী 'রামচরিত-মানসে' বাল্মীকির মূল রামায়ণে নেই, এরকম বহু ঘটনা সন্নিবদ্ধ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, রামচন্দ্র বনবাসকালে যে-সব স্থান থেকে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, সে-সব রাজ্যে রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব হিসাবে কোথাও দুর্গাপূজা হয় না। রামচন্দ্রের রাজ্য অযোধ্যা তথা সমগ্র উত্তর প্রদেশের কোথাও দুর্গাপূজা হয় না; যদিও অযোধ্যায় একমাস ধরে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব হয় এবং তদুপলক্ষে দশাননের এক বিরাট কুশপুত্তলিকা দশমীর দিন দাহ করা হয়। আমাদের দেশে পাঁচ শতকের আগে ঘটে-পটে দুর্গাপূজা হয়তো হ'ত। কিন্তু, মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণ ক'রে এমন মহাসমারোহে দুর্গোৎসবের মূলে মহাকবি কৃত্তিবাসের অবদান বড় কম নয়। তিনি রামায়ণে পূজোর কথা এমনভাবে না লিখলে দুর্গাপূজা বাঙলা দেশে প্রচলিত হ'ত কিনা সন্দেহ।

দেবী দুর্গা হচ্ছেন সর্বশক্তির প্রতীক, তাঁর বিভিন্ন রূপ কল্পনার ও আরাধনার দিক থেকে বিচার করলে যেমন ধন, যৌবন, রূপ, যশ, শত্রুভয় ও সুন্দরী স্ত্রীলাভের জন্য আছে আকুল প্রার্থনা, তেমনই আছে সমষ্টি কল্যাণের ইঙ্গিত ও দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। তাই তমোগুণকে দলিত ক'রে রজোগুণরূপিণী মহামায়ার সিংহবাহনে আবির্ভাব। মহিষাসুর এখানে তমোগুণের প্রতীক। দেবীস্তুতিতে আছে দেবী দুর্গা হচ্ছেন ভবসাগরে অদ্বিতীয়া নৌকাস্বরূপা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরধারিণী' ব'লে দেশকেই দুর্গারূপে বন্দনা করেছেন। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দিনী মা'কে মুক্ত করার জন্য সর্বৈশ্বর্যময়ী সকল আরাধ্যাদেবী রূপে কল্পনা ক'রে 'বন্দেমাতরম্' গান গেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সেই ধ্যানমন্ত্র স্বদেশপ্রেমের যে উন্মাদনা একদা বাঙালীকে

জীবনদানে প্রণোদিত করেছিল, তার ইতিহাস আজ আর কারও অজানা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যে নব্যতান্ত্রিকতায় বাঙালী জাতিকে দীক্ষা দান করেছিলেন, তার মূল কথা মৃন্ময়ী দেশমাতৃকার মধ্যেই চিন্ময়ীকে উপলব্ধি করা।

দুর্গাপূজা প্রসারের জন্য হিন্দু জমিদার ও যুবসম্প্রদায় সেকালে সবিশেষ চেষ্টা করেন। এ-বিষয়ের একটি তদানীন্তন সংবাদ থেকে জানা যায়—'ওই প্রথা বহুকালবধি আছে। পূর্বে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন, তৎকালে ভদ্রলোক দুর্গোৎসব না করিতেন এমত লোক অত্যল্প পাওয়া যাইত। সর্বত্র প্রতিমা না হোক, ঘটপটাদি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলাদিতে হইতে। যবনাধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল। এ প্রদেশে বহুতর হিন্দু জমিদার আর রাজা থাকাতে উক্ত কর্ম লোপ হয় নাই। বিশেষ নদীয়া নাটুর বর্ধমান এই তিন-চারি জন রাজার অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত, তিনি পূজা না করিলে রাজারা তাহারদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন—পূজা অবশ্যই করিবা। এ প্রকারে কেহ কেহ পূজা করিতেন। যদ্যপি কেহ এমত রাজারদিগকে বুঝাইতে পারেন যে, আমার ধনাপরাধ মাত্র, ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই, তাহার পূজার ব্যয়োপযুক্ত ধনদান করিতেন, কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন, যাহাতে চিরকাল পূজা করিতে পারে। কোনো কোনো ব্যক্তি ধনবান অথচ পূজা করে না, তাহারদিগের বাটীতে প্রতিমা রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায়…।' [সমাচার দর্পণ, ১৮ কার্তিক ১২৪০]

বাঙলাদেশে দুর্গাপূজা প্রসার লাভ করলেও কোনো কোনো ধনী ব্যক্তি পূজা করতেন না। বেলঘরিয়ায় এরূপ এক ধনী কৃপণ ব্যক্তির গৃহে দুর্গাপ্রতিমা রেখে আসা সত্ত্বেও তিনি পূজা না ক'রে প্রতিমাটি জলে ফেলে দেন। এটি সেকালের একটি উল্লেখযোগ্য দুঃসংবাদ হয়েছিল এবং ৯ আশ্বিন ১২২৭ তারিখে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়েছিল :

'হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয়, বিশেষত গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অধিক সমারোহ হয়। যদি কোনো ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে, তবে রীতি আছে যে, রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায়। পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানি ধর্মভয়ে কিম্বা লোকভয়ে যেরূপে হয় তাহার পূজা করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোনো ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোমাটিয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল। ৬ আশ্বিন

বুধবার প্রাতে সেই ভগ্যবান আপন বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁশ ও কাষ্ঠ দ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা দেখিল যে, যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই। পরে অন্বেষণ করিতে করিতে জানিল যে, প্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারী স্থানে আপনারা পূজা করিবেন নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল। তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া মারিপিট করিয়া বিদায় করিল। পূর্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে যেখানে এইরূপে তাঁহার আগমন হয়, সেখানে কোনমতে অন্ন বস্ত্রে পুরস্কৃত হইয়া দশমীর দিবস জলে মগ্না হইয়া থাকেন। কিন্তু আগমন মাত্রে এরূপ পুরস্কৃত হইয়া জলে মগ্না হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই।'

এবং, সেই সেদিন থেকে এই এদিন পর্যন্ত দিনে দিনে দুর্গাপূজা গৃহস্থের অঙ্গন থেকে বারোয়ারির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত এমনই বিস্তার লাভ করেছে কেবল ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতেই বোধ হয় এমন এক মহোৎসবের জোড়া মিলবে না। বিভিন্ন যুগে দুর্গাপূজার নানা স্বপ্নের নিবন্ধাবলি তার নিদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়

কালী-কালী—মহাকালী

এক

কালী হচ্ছেন মহাকালের শক্তিমূর্তি। সুদূর অতীতকালে যা ছিল, বর্তমান কালে যা আছে এবং ভবিষ্যৎ কালে যা থাকবে এ সবই চিরবিদ্যমান রয়েছে মহাকালীতে। অনন্ত অতীত, অনন্ত ভবিষ্যৎ একটি নিত্য মূর্তি কালীর মধ্যে শাশ্বতভাবে বিরাজ করছেন, তাই এরূপ মূর্তি আর পৃথিবীতে কোথাও নেই।

সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ এই মহাশক্তির হচ্ছে বিবিধ প্রকাশ। বিশ্বজগত দেখে আমরা সেই অচিন্ত্যমহিমময়ী মহাশক্তি কালিকার পরিচয় লাভ করি। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশাল জগতে আমরা সেই মহাদেবীর অপূর্ব সৃষ্টিশক্তি, অপূর্ব পালিনীশক্তি ও সেই সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত সংহারিণী শক্তির পরিচয় পাই বলে তাঁকে আমরা বলে থাকি বিশ্বজননী পরমেশ্বরী। আমাদের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যতগুলি ভাব অভিব্যক্ত হয়, সে সকলই কালীতে বিরাজমান। তাই কালী হচ্ছেন মহাপ্রকৃতির একটি পরিপূর্ণ চিত্র।

যেখানে দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ ভোগলালসা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা সেখানেই অধর্ম ও অসুরভাব; আর যেখানে অমানিত্য অদম্ভিত্ব অহিংসা আর্জব ক্ষমা ত্যাগ ও সেবা সেখানেই ধর্ম ও দৈবভাব। মহামায়া চিরকাল এই দুরকম ভাবেরই সৃষ্টি কচ্ছেন। কখনো তিনি অসুর ভাবকে বাড়িয়ে দৈবভাবকে নির্যাতিত কচ্ছেন, আবার কখনও বা দৈবভাবকে প্রবল করে অসুর ভাবকে তিনি পরাভূত কচ্ছেন। এ দৃশ্য প্রতিনিয়তই আমরা দেখতে পাই।

দেবী কালিকার হাত চারটি। দু হাতে নিধন করেন। বাঁদিকের দুই হাতে তাঁর খড়্গ ও মুণ্ড ধ্বংসের চিহ্ন। ডান দিকের দুইহাতে বর ও অভয় মুদ্রায় পরম কল্যাণ প্রকটিত। এক হাতে আঘাত, আর এক হাতে সান্ত্বনা। এক হাতে ভীতি প্রদর্শন আর এক হাতে সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভাষায় এমন বিরুদ্ধতার অপূর্ব্ব সমন্বয়, সামগ্রিকতার

পূর্ণ অভিব্যক্ত—সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তির এমন পূর্ণতম প্রতীক সারা বিশ্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয়নি।

তন্ত্রমতে মহাশক্তির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে পূজা। পূজানুষ্ঠান তন্ত্রশাস্ত্রের নিজস্ব সম্পদ। পূজার দুটি বস্তুর প্রাধান্য, মন্ত্র ও উপচার। এই পূজার মন্ত্র সঠিক যদি উচ্চারিত না হয়, তাহলে মহামায়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় না, ফলে হয় দুঃখ ও অশান্তি। আর যদি সঠিক মন্ত্রে সকলের মঙ্গলের জন্য পূজা হয়, তাহলে আসে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি। ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী দেবী কালিকা সন্তুষ্ট হলে ইহকাল পরকালের অলভ্য কিছুই থাকে না। আসলে দেবী হলেন আমাদের অতীত ও বর্তমানের আধার। দেবী প্রতিমার মধ্যেই আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও গৌরব গাথার ইতিহাস যেমন ঘনীভূত, তেমনি তাঁরই মধ্যে রয়েছে নিহিত আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা।

সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্তিমতি।
অসাধুর করে তুমি কালরূপাকৃতি॥
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ দাস॥ (চৈতন্য ভাগবত)

প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় কালী সম্বন্ধে লিখেছেন: বাঙালী যবে যবে ডেকে বলে—আয় মা। হৃদয় আলো করে উপবেশন কর। বুকের রক্তে মায়ের চরণ অলক-রক্ত-রঞ্জিত করে, বাঙালী বলে, কালী করাল বদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী, অতি বিস্তারবদনা নরমালা বিভূষণা দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাকালীর যে দীর্ঘস্তব রচনা করেছেন, তা ভাবে ও ভাষায় বঙ্গ সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। পাঠকদের আস্বাদনের জন্য নিম্নে উক্ত কবিতার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হলো:

মহাকালীর স্তব

ত্রিপুরা ত্র্যম্বকবীরা, ত্রাণ হেতু নাম তারা।
ত্রিলেচনী ত্রিলোকতারিণী।
কার্য্য ধার্য্য যাহে হয়। কারণ তাহারে কয়,
কালী সেই কারণকারিণী॥
সোহং-তত্ত্বে, তত্ত্বধারা, জপাজপাশেষ করা,
সমাধি সমিধস্বরূপিণী।

ককারে আকারভূতা, কলি-কালী-গুণযুতা।
গিরিসুতা গিরিশগৃহিণী ॥
কুমতি সুমতি হয়, তোমা হতে হয় লয়,
মানুষের বৃথা করি দ্বেষ।
তুমি কৃপা কর যারে, সংসারে তরাও তারে,
ভব আসা আশা করে শেষ ॥
নিশা গতাগত দিবা, সুপথ দেখাও শিবা,
বিজ্ঞান নির্মলনেত্র দিয়া।
ক্ষম দোষ ছাড় রোষ, করগো মা পবিতোষ,
আশুতোষ আশুতোষ প্রিয়া ॥
অমর কাহারে কয়, দেবতা অমর নয়,
অমর কেমনে হবে প্রাণী।
একমাত্র তুমি পরা, ধরণ হরণ-করা,
মরণে মরণ হারিণী ॥
ভাবময়ি প্রেমময়ি, দেহি দীনে দয়াময়ি,
দূর কর দাসের দুর্দশা।
তুমি সর্বাদিদ্ধিকরা, পরমেশ প্রাণেশ্বরী,
ঈশ্বরের ঈশ্বরী ভরসা ॥

দুই

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন: "কালী কি কালো? দূরে তাই কালো। আকাশ দূরে তাই নীল, কাছে রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে দেখায় নীল, হাতে নাও, কোন রঙ নেই।" মহাকালের শক্তিমূর্তি কালী হচ্ছেন নিরাকার। তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। যা কিছু কালে ছিল, এখন আছে, এবং পরেও থাকবে—এ সবই মহাকালীতে চিরবিদ্যমান। সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ এই হচ্ছে মহাশক্তির পরস্পর সাপেক্ষ বিবিধ প্রকাশ। কালিকা-রূপিণী এই মহাশক্তি নিখিল বিশ্বের যাবতীয় নর-নারীর পরমা জননী। ইনি প্রসবিত্রী, ধাত্রী, পালয়িত্রী।

ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে শক্তিবাদ, মুনিঋষির সাধনার সম্পদ। শক্তি হতে জগৎ জাত, শক্তিতেই জগৎ স্থিত, শক্তিতেই জগৎ বিলয়প্রাপ্ত এই হল শক্তিবাদের মূল কথা। শক্তির উপাসনা বাঙলার একটা বিশেষ সম্পদ। স্মরণাতীত কাল থেকে বাঙালী তাই তন্ত্রধারায় সিদ্ধিলাভ করে এই সাধনাকে উজ্জ্বল করেছেন। কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। শ্রদ্ধেয় মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখেছেন :

শক্তিবাদ তন্ত্রবিজ্ঞানের বিরাট দান। দার্শনিক দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের মত শক্তিবাদ একটা মতবাদ নহে। কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি তর্ক, বিচার ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তি পরীক্ষিত সত্য (experimental truth)। অনুভূতি দুই প্রকার—ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সর্বজনীন অনুভূতি। কোন বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন হয়। যাহা সার্বজনীন তাহা ব্যক্তি নিরপেক্ষ, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। স্বতঃপ্রমাণিত বলিয়া উহা অখণ্ডনীয়। শক্তিবাদ অনুরূপ একটি অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত।

কালক্রমে এই শক্তিবাদ যখন তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে পঞ্চ-মকারে উন্মত্ত হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত তখন নবদ্বীপে ১৭শ শতকে আবির্ভূত হন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ! তান্ত্রিক ব্যভিচার থেকে দেশকে রক্ষার জন্য প্রামাণিক তান্ত্রিক নিবন্ধ সম্বলিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ রচনা করে বাংলাদেশে প্রথম মূর্তিনির্মাণ করে কালীপূজার প্রবর্তন করেন। এই গ্রন্থে তিনি শাক্ত বৈষ্ণব উভয় মতাবলম্বীদের দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে দেশের মহা উপকার সাধন করেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও সহাধ্যায়ী এবং কথিত আছে যে পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে তিনি তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর কথা পূর্বে কিছু বলেছি।

বর্তমানে কার্তিকী অমাবস্যায় যে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর রূপবর্ণনা তন্ত্রসার গ্রন্থে যা আছে, তা এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হলো। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল সংস্কৃত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালংকার রচিত সরল ক্রিয়াকৌমুদি গ্রন্থে দেখতে পাবেন।

দক্ষিণা কালিকা হচ্ছেন করালবদনা, ঘোররূপা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা,

মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, দিব্যধামস্থাতা। তাঁর বামদিকের অধঃ ও ঊর্ধ্ব করপদ্মে সদ্যোছিন্ন মস্তক ও খড়্গ এবং দক্ষিণের ঊর্ধ্ব অধঃ হস্তে অভয় ও বরদ মুদ্রাধারিণী। কণ্ঠলগ্ন নরমুণ্ডসমূহ হতে গলিত রক্তধারায় যাঁর দেহ চর্চিত, সেই দিগম্বরী মহামেঘের প্রভাযুক্ত শ্যামা, দুটি শব কর্ণের ভূষণ হওয়াতে ভীষণরূপা, স্থূল ও উন্নত পয়োধরবিশিষ্টা, করালবদনা, ভীষণ দন্তযুক্তা, শবের হস্তসমূহ দ্বারা যাঁর কটির মেখলা হয়েছে। হাস্যময়ী, ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় থেকে গলিত রক্তধারায় যাঁর মুখ শোভাযুক্ত ঘোর গর্জনকারিণী, মহারুদ্রশক্তি শ্মশান-বাসিনীকে, বালসূর্যমণ্ডলের মত তিনটি নয়নযুক্তা, উন্নত দন্তবিশিষ্টা, মুক্ত ও আলম্বিত কেশকলাপ যাঁর পৃষ্ঠদেশব্যাপী, এইরূপ মহাদেবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা ঘোর শব্দকারী শৃগালগণের দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিতা, পাপী অসুরদের নিপাত-কারিণী মহাকালের প্রিয়া রমণীকে, যাঁর মুখমণ্ডল সুখপ্রসন্ন ঈষৎ হাস্যযুক্ত সেই মহাশক্তি মহাপ্রভা কালীকে ধ্যান করি।

কার্তিকী আমাবস্যা ছাড়া মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে রটন্তী কালীপূজা জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালীপূজা, প্রতিমাসে চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যার প্রতিমাসীয় কালীপূজা এবং শ্মশানকালী ও রক্ষাকালী পূজা আমাদের দেশে এখন অনেক অনুষ্ঠিত হয়। তন্ত্রমতে বিশ্বের মূল যে শক্তি, যা সর্বভূতে বিরাজমান, তাকে অধীন করে ভোগ করতে গেলে সর্বনাশ অনিবার্য। শক্তিরূপা মহাকালীকে আত্মস্থ হয়ে জানবার পর তাঁর অনুগত হয়ে পূজা করলে তাঁর করুণায় বিশ্বের সকল সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। শক্তি-স্বরূপিণী দেবী মাতৃরূপা ও বিশ্বের সকল দেব ও মানবের পূজ্য। শক্তি ভোগের বস্তু নয়। শক্তিরূপিণী মাকে ভোগ করার চেষ্টা করলে শম্ভুনিশুম্ভের মত পরিণামে ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। তন্ত্র মতে এর নাম হচ্ছে আসুরিক প্রয়াস। রাবণ দেবশক্তিকে জয় করে তিনি সেই শক্তিকে নিজের সুখভোগে নিয়োজিত করে কি ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তা কারুর অজানা নেই।

মুসলমান রাজত্বকালে ভারত যখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ, তখন কৃষ্ণানন্দ যে মন্ত্র রচনা করে মহাশক্তির কাছে প্রার্থনা করেন, সে মন্ত্র আজও কালীমাতার কাছে উচ্চারিত হয়। নিম্নে তার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হলো :

"জয় জয় দেবী চরাচরসারে।
নয় নয় মাত রথার্ণবপারে॥

জহি জহি ভারতদুর্গতিঘোরং।
কুরু কুরু মাতরুপেক্ষিতত্রাণম্॥"

অর্থাৎ হে বিশ্বের সারভূত দেবী—তোমার জয় হোক, হে মাতা, তুমি দুঃখসাগরের পরপারে আমাদের নিয়ে যাও। ভারতের ঘোর দুর্গতি বিনাশ করো। হে মাতা, উপেক্ষিত ভারত সন্তানগণকে ত্রাণ করো।

কালী বাস করেন শ্মশানে, কারণ মহাশক্তির বাসস্থান হচ্ছে শ্মশান। যেখানে সকল ইন্দ্রিয় পিপাসা, সকল গর্ব, সকল অহঙ্কার, সকল পীড়নের ঘটে পরিসমাপ্তি। যেখানে সম্রাটে ও ভিক্ষুকের হয় সম অবস্থা, সেই পবিত্র শ্মশানই হচ্ছে মহাশক্তির বাসস্থান; কেননা শ্মশান বলতে বোঝায় শবের শয়ন স্থান। আর কর্মফল ভোগান্তে জীবেরও হচ্ছে শেষ বিশ্রামস্থান। ব্রহ্মপুরুষ শিব তাঁর চরণতলে থেকে প্রমাণ করেছেন যে, তিনিও সেই মহাশক্তির অধীন। মহাকাল ও মহাকাল শক্তি এখানে অভেদ।

কালিকারূপিণী এই মহাশক্তি নিখিল বিশ্বের যাবতীয় নরনারীর পরমাজননী। ইনি প্রসবিত্রী, ধাত্রী, পালয়িত্রী বলে তাঁর স্নিগ্ধ শীতল ক্রোড়ে আমরা সকলে শান্তিলাভ করি, আর তিনি আমাদের আধি, ব্যাধি, সন্তাপ, বিরহ-বেদনা সব ঘুচিয়ে দেন, যদি আমরা শবের মত নিরভিমান ও স্বার্থহীন হয়ে তাঁর একমাত্র উপাসনা করি।

মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে হয় সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও যুক্ততা নষ্ট হলে হয় কেবল দুঃখ আর অশান্তি। তাই সাধকগণ মায়ের আরাধনাতেই যুগ-যুগ ধরে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি করে চির শান্তির অধিকারী হয়েছেন। আমাদের জীবনে দুঃখ এলেই বুঝতে হবে যে, ব্যক্তিজীবনে মায়ের কাছ থেকে আমরা বিযুক্ত হয়েছি, তাই আমরা আজ এত দুর্বল ও শক্তিহীন।

মায়ের কাছে আমাদের তাঁর পূজার মন্ত্রই আজ প্রত্যেকের প্রার্থনা হোক যে, আমাদের কর্মে দৃঢ়তা, জিত বস্তুকে রক্ষা করার শক্তি, ধর্মবুদ্ধি ও পুরুষোচিত বীর্য দাও—যাতে আমরা স্বরাজ্য লাভ করতে পারি। লভেন যেন স্বরাজ্যং), যা সন্ততিদের সুখের আশ্রয়, যা মানসিক যাতনা, শারীরিক ব্যাধি ও পর-পীড়নাদি পাপ থেকে বিমুক্ত, অহিংস নীতির সহকারী ব্রহ্মজ্ঞান চর্চা ও ত্যাগের আদর্শ স্বরূপ ও জগতের হিত সাধনের উপায়ভূত হবে।

শাক্ত ও শক্তিবাদ

আমাদের এই বাঙলাদেশ হচ্ছে তন্ত্র ও শক্তিসাধনার কেন্দ্র, তাই বাঙলার বিশেষ সম্পদ হচ্ছে শক্তির উপাসনা। বাঙালী আজ নিজের সম্পদ সম্বন্ধে উদাসীন, তাই শক্তিবাদ ও শক্তিসাধনা এখন ছলধর্মে পরিণত হয়েছে। বেদান্তের সিদ্ধান্তের নাম ব্রহ্মবাদ—এর চরম তত্ত্ব ব্রহ্ম, আর তন্ত্রের সিদ্ধান্তের নাম শক্তিবাদ—এর চরম তত্ত্ব শক্তি। এই দুইয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও পরিণামে এরা অভেদের পরিপূরক হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুই ধারা এক অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করেছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়: "এই সনাতন ধর্মকে শাশ্বত ধর্ম বলিয়া ভাগবতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার অপর নাম বৈষ্ণবধর্ম। ভারবাহী বৈষ্ণবেরা শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু দায়গ্রাহী বৈষ্ণবগণ বিরল। অতএব অসাম্প্রদায়িক অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া পূর্বোক্ত পাঁচটি পারমার্থিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।"

শক্তিবাদ তন্ত্রবিজ্ঞানের একটি বিরাট দান। ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একে বলা যায় একটি অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত। ইহা বৈষ্ণব ধর্মেরও ভিত্তিপ্রস্তর। শক্তি নাই বলার সাধ্য কার আছে? ভগবান আছেন বললে, হয়ত কারুর আপত্তি হতে পারে কিন্তু শক্তি আছে বললে, কারুর আপত্তি করা চলে না। তাই শক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীতে অনস্বীকার্য। সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণাকে তন্ত্রে আদ্যাশক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বাঙলাদেশে সুদূর অতীতকাল থেকে তাই চণ্ডিকা ও কালিকাকে অবলম্বন করে প্রচলিত হয়েছিল তন্ত্রসাধনা। "যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা"—এটাই হচ্ছে শক্তিবাদের মূলমন্ত্র। শক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করে দেহের উচ্চতম স্তরে নিয়ে যেতে পারলে অমূল্য ফল ও অপার আনন্দ লাভ হয়। ভারতীয় এই অধ্যাত্মিক সম্পদ জীবনে যে অমৃতের সন্ধান দেয় রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষ্যাপা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণ যাঁরা শক্তির জাগ্রত পীঠে তন্ত্রধারায়

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে এই সাধনাকেই কবে গেছেন তাই উজ্জ্বলতম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধক কমলাকান্তের "কে জানে কালী কেমন—ষড়দর্শনে না পায় দর্শন" এই গানটি প্রায়ই গাইতেন।

ভারতের অমূল্য এই সম্পদ নদীর মত কালের প্রবাহে প্রবাহিত হতে হতে মরুপথে শুষ্ক হয়ে গেলে 'মধ্যমাধিকারীদের শাস্ত্রবিচার জন্য যদি কোন গ্রন্থি থাকিত, তাহা হইলে আর উপধর্ম, ছলধর্ম, বৈধর্ম ও ধর্মান্তরের কল্পনারূপ বৃহৎ অনর্থ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিত না' (শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা)। শক্তিপূজার নামে সেকালে ধর্মের যে কি নিদারুণ অবস্থা হয়েছিল শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তা সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। যথা :

ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
বাশুলী পূজায় কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

বৈদিক ও তান্ত্রিক চিন্তাধারা ভারতীয় ঋষিদের সাধনার অমূল্য সম্পদ। এই পরমার্থিক সম্পদ ধর্ম-ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে কলুষিত হয়েছে বলে এর মূল তত্ত্ব বর্তমানে মেঘাচ্ছন্ন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বলি দিয়ে কালীপূজা করলেই শাক্ত হওয়া যায় না—শক্তির প্রকৃত পূজারী হওয়া চাই। শক্তির পূজারী হতে গেলে যে সাধনার প্রয়োজন তা ব্যক্তিগতভাবে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ দেখিয়ে গেছেন।

এ বিষয়ে স্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতীর উক্তি উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন :

In India there has not been for many generation a collective cultivation of Sakti, though individulas may have worshipped and realised her. Sakti is neither force nor inertia. It is power as whole and perfect. It is constantly true, good and beautiful. Even Mother in her life so-called fearful and revolting aspects so."

এক সময়ে অতীতে ঘটস্থাপনা করে বাঙলার ঘরে ঘরে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হতো। কালীমূর্তি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। শ্রীচৈতন্য যেমন সাম্যভাবের

দ্বারা বিশ্বজনীন প্রেমভক্তিতে ঈশ্বর আরাধনার এক নূতন পথ প্রদর্শন করেন, তান্ত্রিক সাধনাবলম্বীগণও ঠিক সেই রকম শক্তির উপাসনার মধ্যেও সাম্যবাদের পথ দেখান। তন্ত্রসার, তারারহস্য, শ্যামারহস্য, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যের সময়ে তার সহাধ্যায়ী ছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এই তান্ত্রিক সাধক তাঁর জাগ্রত পীঠে কালীমূর্তি তৈরী করে বাঙলাদেশে প্রথম কালীপূজা করেন এবং তিনিই 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের লেখক। তিনি কালীমূর্তির রূপ কল্পনা করে শ্রীচৈতন্যের সাম্যভাবের সঙ্গে পাল্লা দেন এবং আগমবাগীশ কর্তৃক আবিষ্কৃত কালীমূর্তিই বাঙলাদেশের সর্বত্র আজ পূজিত হচ্ছে।

এ বিষয়ে পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন :

Agam Vageshu, a learned Hindoo, about five hundred years ago, formed the image of kalee according to the preceding description and worshipped it monthly, choosing for this purpose the darkest nights in the month he made and set up the image, worshipped it, and destroyed it on the same night. (The Hindoos, Vol. II By W. Ward. 1815,)

কৃষ্ণানন্দ তৎকালীন তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মর্ম হৃদয়সঙ্গম করতে না পেরে, তন্ত্রের দোহাই দিয়ে নরবলি পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত নয় দেখে, তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করেন। তাঁর গ্রন্থে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের দেবদেবীর উপাসনা ও পূজা পদ্ধতির যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা তন্ত্রশাস্ত্রের একটি অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত। নবদ্বীপে মালঞ্চপাড়ায় তার বাড়ীতে আজও দশ-বার হাত উঁচু প্রকাণ্ড এক কালীমূর্তি কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের ব্যয়ে প্রতিবছর পূজিত হয়। এই বিগ্রহ 'আগমেশ্বরী' বলে খ্যাত এবং এই প্রতিমাই হচ্ছে বাঙলার আদি শ্যামামূর্তি। আগমবাগীশের দুই পুত্র গোপাল ও মধুসূদন। গোপালের বংশধরগণ অদ্যাপি নবদ্বীপে বাস করেন। এই বংশের প্রবীণা শ্রীমতী হরিবালা দেবীর সঙ্গে একবার আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল, তিনি বলেন, মধুসূদনের বংশধররা এখনও শান্তিপুরের কাছে হরিপুর গ্রামে বাস করেন। তন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের উপলব্ধিজাত সত্য তন্ত্রবিজ্ঞানে মৌলিকতার দাবী করে বললে বোধহয় ভুল হবে না।

শাক্তগণ শক্তিস্বরূপিণী আদ্যাশক্তিকে জননী ও কন্যা রূপে প্রাণের আকুতি

নিবেদন করেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ শ্যামারূপে তিনি জননী, উমারূপে তিনি কন্যা এইভাবে সাধনা করেছিলেন। এঁদের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এঁদের রচিত যাবতীয় শ্যামা-সঙ্গীত যা আজও দেশের আপামর জনসাধারণকে মুগ্ধ করে রেখেছে। শাক্ত সঙ্গীতে নেই কোন কষ্টকল্পনা, নেই কোন কৃত্রিমতা; এতে আছে কেবল দেবতাকে ঘিরে মনের আনন্দ আবেগ বিশ্বাস ও ভাবতন্ময়তা যা সাধককে ঊর্ধ্বগামী করে এক অপার আনন্দলোকে নিয়ে যাওয়া। এক কথায় বৈষ্ণব পদাবলীর মূল রসকে যদি বলা যায় মধুর, তাহলে শাক্ত পদাবলীর মূল রসকে বলতে হবে বাৎসল্য। এখানে রামপ্রসাদী সুরে সাধক কমলাকান্তের রচিত একটি গান উদ্ধৃত হলো:

রামপ্রসাদী সুর—একতালা

পরের কথায় আর কি ভুলি
কত ভ্রমিয়া দেশ, পেয়েছি শেষ,
যা কয় দক্ষিণা কালি।
যত ইতি নাম, আদি শিব রাম,
সকলের কর্তা মুণ্ডমালী।
মায়ের চরণ কমল, অতি নিরমল,
মন, গিয়ে তার হওনা অলি॥
কালীনাম সুধা পান করলে মন!
নাচ গাও দিয়ে করতালি।
নীল শশধর করেছে আলো,
মহানিশি প্রায় হয়েছে কলি॥
ত্যজিয়ে বসন, বিভূতি ভূষণ
মাথায় লও কালী নামের ডালি।
কমল বলে দেখ দেখি মন,
কত সুখে সুখী হলি॥

রামপ্রসাদকে শ্যামা সঙ্গীতের আদি কবি বলা যায়।* শাক্তপদের জন্ম

---

* লেখকের 'দিব্য পথের দিশারী' নামক গ্রন্থে রামপ্রসাদের অলৌকিক জীবনকথা 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ' নিবন্ধে [পৃষ্ঠা ৩৪—৫১] বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে।

তাঁর খ্যাতি হলেও, তিনি ছিলেন মহাকালীর পরমভক্ত ও তন্ত্রসাধক। তাঁর অনেক পদে তন্ত্রসাধনার নানা ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। কালী মহাকালের শক্তিমূর্তি। যা ছিল, আছে ও থাকবে—তা সবই মহাকালীতে বিদ্যমান। সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ এ সবই কালিকাতে আছে বলে মহাপ্রকৃতির সম্পূর্ণ চিত্র হচ্ছেন মহাকালিকা। তিনি হচ্ছেন অন্ধকারবর্ণা, তাই সকল তত্ত্ব সেখানে অব্যক্ত। এই রূপই উদ্ভাষিত হয় সাধকের ধ্যাননেত্রে। এ রূপ সাধকের অধোক্ষজ অনুভূতির বিষয়। তন্ত্রের এই ছক বা ফরমূলা বিরাটের সামগ্রীক জীবনে যেরূপ সত্য, আমাদের মতন অনুচৈতন্য ক্ষুদ্র জীবেও ঠিক সেই রকম সত্য। সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণাকে তন্ত্রে আদ্যাশক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে, তাই তাঁর স্মরণে মৃত্যু-ভয় আধি ব্যাধি সব দূর হয়ে যায় "মৃত্যুব্যাধি-ভয়ং জস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌযুগে।"

রামপ্রসাদের পর অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য অন্যতম। তিনি বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় আড়াইশো পদ রচনা করে প্রখ্যাত হন। তাঁর পদাবলীতে অন্তরের আকুতি ও আত্মনিবেদনের কবচ সম্বল করে ভবার্ণব পার হবার যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, তা রামপ্রসাদের সমকক্ষ না হলেও রামপ্রসাদ অপেক্ষা ন্যূন নয়। কমলাকান্তের পদে ভাষা ভঙ্গিমাগত ঐশ্বর্যের সঙ্গে একটা আপত্তিহীন বৈরাগ্য মিশে গেছে, যা বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

কমলাকান্ত ছিলেন সাধক কবি ও সুপণ্ডিত। তাঁর জন্মস্থান অম্বিকা কালনায়। তাঁর সাধনস্থান ছিল বর্ধমানের কাছে কোলাঘাট গ্রামে। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে সভাপণ্ডিত করেছিলেন। শেষ জীবনে মহারাজ তেজচন্দ্র কমলাকান্তকে গুরুপদেও বরণ করেন। হুগলী বর্ধমান নদীয়া প্রভৃতি জেলায় তাঁর শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত এক সময়ে পথে ঘাটে রাখাল বালক থেকে সুরু করে শিক্ষিত লোকের মুখে গীত হতে শোনা যেতো। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু বিস্মৃতির অতল গর্ভে এখন নিমজ্জিত। তাঁর গানগুলিও আজ বিলুপ্তির পথে। এঁর অমূল্য সঙ্গীতাঞ্জলি সংরক্ষিত হলে শক্তি সাধনার অনেক তত্ত্ব স্থায়িত্ব লাভ করবে। তাঁর আরো চারটি গান সংরক্ষণের জন্য তাই এখানে উদ্ধৃত হলো :

কালাংড়া একতালা

শ্যামধন কি সবাই পায়।
অবোধ মন! বুঝনা একি দায়॥
শিবেরো অসাধ্য সাধন,
মন! মজনা রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে,
শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, যে পদ না ধ্যানে পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত, তবু সে চরণ চায়॥

রামপ্রসাদি সুর—একতালা

আমার মনে ইচ্ছা আছে।
এবার কালী বলে, বাহু তুলে,
যাব শ্যামা মায়ের কাছে॥
কালীনাম সারাৎসার নিঃসরে বদনে যার।
সেজন ভক্ত জীবন মুক্ত,
দোহাই দিয়ে শিব করেছে॥
যার কালীনাম আপ্তসার,
কালের ভয় কি আছে তার;
তুমি এই কোরো সতর্ক থেকো,
কালোবরণ ভোলো পাছে॥
কমলাকান্তের কথা ঘুচিল আমার মনের ব্যথা,
এবার নাম জেনেছি, ধাম চিনেছি,
পথ বড় সুগম হয়েছে॥

পূরবী—একতালা

পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে রে!
বিবসনা সমরে নর-কর কোমরে,
অসিবর বাম করে ধরে।

ডিমিকী ডিমিকী ডমরু বাজে,
হরহৃদি পরে শ্যামা বিরাজে,
রণ সমাজে, না করে লাজে,
কুলরমণী বামা কে এলো রে ॥
মৃদু মৃদু হাসে, চপলা প্রকাশে,
কমলেরি আশপুরে ॥

টোড়ী—কাওয়ালী

তবে কেন হইল মানবদেহ,
গুরুচরণে মতি হইল না।
যে কারণে এই তনু ধন্য
কেন সে পথে আমার মন গেল না ॥
আমার ধন, আমার পরিজন, আমার সুত দারা,
এই কোরে হইলাম পথ হারা,
সারাৎসারা পরাৎপরা, তারা নাম নাম লইলে না।
কমলাকান্ত হইল নিতান্ত উন্মত্ত,
কুপথে ভ্রমণে ক্ষমা দিল না
সুপথ মনেরে শিখাইলে না ॥

শাক্ত পদাবলীর লেখক অমরেন্দ্রনাথ রায় বলেন: 'বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণের সুর, মনের আশা, হৃদয়ের ভাব শুনিতে হইলে শাক্তসঙ্গীতের মত আর কিছু আছে কিনা জানি না। মা-গঙ্গার পলিমাটি স্তরে স্তরে সাজাইয়া বাঙ্গালাদেশ হইয়াছে; যেন মাতৃস্নেহ স্তর-বিন্যস্ত হইয়া এই দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সেই মায়ের গড়া দেশে মায়ের ছেলেরা যুগে যুগে সাধনার প্রভাবে মাতৃনাম কত রকমে উচ্চারণ করিয়াছে, মায়ের লীলা কেমন মাধুরী মাখাইয়া প্রচার করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।'

শক্তিবাদ বিষয় বলতে গিয়ে ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন: জগতে ঈশ্বরবাদী ধর্মমাত্রেই ঈশ্বর পুরুষ এবং পুরুষ রূপেই পূজিত। ভারতের সনাতনধর্মে তিনি যুগপৎ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরী। শক্তিমান এবং শক্তি। শক্তিমান এবং শক্তিতে ভেদ নাই। এই শক্তিবাদ ভারতের বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি-প্রস্তর। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন: "শক্তি শক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া, যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ

যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।" অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি এবং দুগ্ধ ও তাহার ধবলতার মত এই সমন্বয় সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। যথা :

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাঽহং অহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥

অর্থাৎ সদা সর্বদা দেবী ও দেব,—শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে—আমি একটি শ্লোকে বলিয়াছি :

জ্ঞেয়ং ধ্যেয়ং তত্ত্বং পরমং।
শক্তি শক্তিমচ্চোভয়লিঙ্গম্ ॥
জায়াপতিরিতি যুক্তবিচারঃ।
ব্যর্থো বাদো যুক্তি-বিকারঃ ॥

ইহাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের সিদ্ধান্ত (১/৪/৩)

নাম ও ও রূপ ব্যতীত আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বরের নির্বিশেষ নিরবয়ব সত্তা ধ্যান করিতে পারি না। তাঁহার প্রত্যেকটি রূপই রূপক (symbolical) বা ভাবরূপাত্মক প্রতীক। আমরা চোখ বুজিলেই অন্ধকার দেখি। আমাদের মানসিক শক্তি সীমিত ও ইন্দ্রিয়ের অনুবর্তী। তাই—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" ইহাতে দোষ হয় না, যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান অরূপ, স্বরূপ, সর্বরূপ।

শ্যামাসঙ্গীতের আদি কবি রামপ্রসাদ ও বিশ শতকের শেষ কবি নজরুল ইসলাম-এর গান দিয়ে শাক্ত ও শক্তিবাদ নিবন্ধ শেষ করছি। পাঠক স্যার জন উডরফ রচিত শক্তি ও শাক্ত গ্রন্থে অনেক তথ্য পাবেন।

প্রসাদী একতালা

কাজ কি মা সামান্য ধনে,
(ও কে) কাঁদছে গো তোর ধন-বিহনে ॥
সামান্য ধন দিলে তারা পড়ে রবে ঘরের কোণে,
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে ॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলেন কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে ॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে 'জয় দুর্গা' বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে ॥

মায়ের রূপের অপরূপ বর্ণনা রয়েছে ভক্ত নজরুলের গানে যথা :

কালো মায়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে
(তা'র) একটুখানি রূপের ঝলক স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন।
সিন্ধুতে ঐ বিন্দু খানিক ঠিকরে পড়ে রূপের মাণিক,
বিশ্ব মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্বসন।

ডানকুনির চামুণ্ডা

চণ্ডীতলা পশ্চিম বাংলার ঐতিহাসিক সংস্কৃতি কেন্দ্রের অন্যতম পীঠস্থান। এই অঞ্চলের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন দুর্ধর্ষ সরস্বতী নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও অগণিত ভগ্ন অর্ধভগ্ন দেব দেউলের মধ্যে আজও যা টিকে রয়েছে তার মধ্যে ডানকুনির মনোহরপুর গ্রামের চামুণ্ডা কালীর নাম উল্লেখ্য। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রাম কলকাতা থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইস্টার্ণ রেলপথের ডানকুনি নামে এখানে একটি স্টেশনও আছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ উভয় পথেই ট্রেনে ডানকুনিতে যাওয়ার বিশেষ সুবিধা আছে।

চামুণ্ডা ডানকুনির গ্রাম্য দেবী; প্রতি বছর বৈশাখ মাসে চামুণ্ডার পূজা ও উৎসবকে ডানকুনির সর্বজনীন উৎসব বলা চলে। হুগলী হাওড়া বর্ধমান থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার নরনারী প্রত্যক্ষভাবে সেই উৎসবে যোগদান করেন। মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য সেদিন দেবীর কাছে ভক্তগণ মানত করা পশুকে বলি দেন। উৎসবের দিন চামুণ্ডা দেবীর সামনে ব্যাপক ও নির্বিচারে বলিদান হয় প্রায় চার পাঁচ শো। বর্ধমানে চামুণ্ডা পূজা একাধিক স্থানে হয়। কিন্তু হুগলী জেলায় চামুণ্ডা পূজা আর কোথাও হয় বলে শুনি নি।

চামুণ্ডা বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেব দেবী মণ্ডলের অন্যতম বলে প্রাচীন কালে পূজিতা হতেন। পাল যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবদেবীর মধ্যে পারস্পরিক এই মিলন-মিশ্রণ ও একাত্মীকরণের ফলে এই পূজা হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবেশ করে। এই পূজা একদা পূর্বভারত থেকে নেপাল তিব্বত হয়ে চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। চীনে যে সব দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে চামুণ্ডা মূর্তি অন্যতম। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য রচিত "নিষ্পন্ন-যোগাবলী" গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকগণের তৎকালে একমাত্র লক্ষ্য ছিল অনার্যদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণ করা। তাই অনার্যদের বহু দেবীর পূজা ধীরে ধীরে আর্যদের পুরুষরূপী ঈশ্বরবাদী হিন্দুদের মধ্যে প্রবেশ করে। বিনয় ঘোষ লিখেছেন যে, চামুণ্ডা হিন্দু দেবী হলেও একেবারে বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত নন, এবং হিন্দু বৌদ্ধ যাই হন তাঁর অনার্য বৈশিষ্ট্যও কিছু অল্প নয়। এই সময় অন্যান্য আরও অনেক দেবদেবীর মতন চামুণ্ডা কালীও বাঙলার ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।

ডানকুনির চামুণ্ডাকালী ১১৩৬ সালে (১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আগমশাস্ত্রে চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি ও রূপের বর্ণনা আছে। গঙ্গাপ্রসাদ চামুণ্ডার যে ভীষণ মূর্তি প্রথম স্থাপন করেন—সেই দেবী ত্রিলোচনা, কোটরাক্ষী অর্থাৎ তাঁর তিনটি নয়নই কোটরে মগ্ন, নির্মাংসা অস্থিসা।, দেহে মাংস নেই অস্থিমাত্র সার, ঊর্ধ্বকেশী কৃশোদরী—কেশ ঊর্ধ্বগ, উদর কৃশ, দ্বীপিচর্মধরা আর পরিধানে দ্বীপিচর্ম। তাঁর বাম হাতে কপাল পটিশ ডান হাতে শূল ও কর্তী। আর দেবীর ভূষণ অস্থি ও আসন হচ্ছে শব।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মিউ কর্ড রেল লাইন যখন প্রথম তৈরী হয়, তখন চামুণ্ডা তলার উপর দিয়ে লাইন হওয়ায় দেবীর বহু জমি তখন রেলওয়ে বোর্ড অধিকার করেন। এখন দেবীর নিজস্ব জমির পরিমাণ প্রায় আশি বিঘা। ডানকুনি রেল স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে লাইন ধরে পাঁচ মিনিট হেঁটে গেলেই মন্দিরে যাওয়া যায়। আগে চামুণ্ডার কোন পাকা মন্দির ছিল না। কিম্বদন্তী দৈবাদেশ ছিল যে, দেবীকে পাকা ঘরে স্থাপন করে পূজা করা চলবে না। তাই দেবী ছিলেন পূর্বে চণ্ডীমণ্ডপে, পরে চণ্ডীমণ্ডপের খড়ের ছাউনি ভক্তদের দ্বারা রূপান্তরিত হয় করোগেট টিনে। এ প্রায় একশো বছর আগের কথা!

১৩২৩ বাংলার প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে চামুণ্ডার ঘর বিধ্বস্ত ও দেবীমূর্তি ভগ্ন হলে দেবীর বর্তমান পাকা মন্দির সর্বসাধারণের চাঁদায় নির্মিত হয়। এবং চামুণ্ডার ভয়ঙ্করী মূর্তির পরিবর্তে তখন চামুণ্ডার কালীরূপে এক নূতন মূর্তি তথায় পুনঃস্থাপিত হয়। কিন্তু দেবীর পদতলে শিব এখানে থাকেন অনুপস্থিত। ১১ বৎসর বয়স্ক শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়, চামুণ্ডা কালীর বর্তমান সেবায়েত। তাঁর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের এই অঞ্চলে পণ্ডিত বলে বিশেষ খ্যাতি ছিল! এবং তিনিই দেবীর বর্তমান শিবহীন বিগ্রহের রূপকার। মন্দিরের মধ্যে চামুণ্ডা কালীর পাশে পরবর্তীকালে শনিঠাকুর ও শীতলা মায়ের মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। দেবীর রহস্যময় অনেক অলৌকিক কাহিনী এখানে বহুদিন থেকে লোকমুখে প্রচলিত আছে আজও।

চামুণ্ডার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তা হচ্ছে: এক সময় দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়ে হরিহরের কাছে অসুর বধের জন্য প্রার্থনা করেন। দেবগণের কাহিনী শুনে ক্রোধান্বিত হরিহরের বদনমণ্ডল থেকে তেজোরাশি তখন নির্গত হতে লাগলো। দেবতাদের শরীর থেকেও তেজ নির্গত হয়ে সেই দিগন্তব্যাপী তেজের মধ্যে থেকে আবির্ভূতা হলেন এক অপরূপা সুন্দরী দেবীমূর্তি। অসুর বধ করে দেবতাদের বিপন্মুক্ত করে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁদের বর দিয়ে গেলেন যে, বিপদে পড়ে তাঁকে ভবিষ্যতে স্মরণ করলে তিনি দেবতাদের আবার রক্ষা করবেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কথায়: "তবু যদি দিবে বর দাও এই বর—স্মরণ করিলে মাতঃ আসিবে সত্বর।" উত্তরে দেবী বললেন, 'তথাস্তু'।

এরপর অসুরপতি দুই ভাই শুম্ভ ও নিশুম্ভের সময় কর্তৃত্বে দেবতারা আবার পরাজিত হয়ে স্বর্গরাজ্যচ্যুত হলেন। দেবী ভগবতীর পূর্বের বর তাঁদের স্মরণ হলো। পুনরায় তাঁরা দেবীর স্মরণাপন্ন হলেন। দেবী আবির্ভূতা হয়ে দেবতাদের অভয় দিলেন, মাভৈঃ। দেবীর রূপের কথা শুনে অসুরপতি শুম্ভ প্রলুব্ধ হয়ে তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে দূত পাঠালো দেবীর কাছে। দেবী বললেন: 'সমবল, যুদ্ধে জয়, দর্প চূর্ণ করি—পত্নীরূপে পাবে মোরে, হলেও সে অরি।'

দেবীর কথা শুনে অসুর রাজ প্রথমে পাঠালেন ধূম্রলোচনকে; কিন্তু দেবীর হাতে সে হলো নিহত। ক্রুদ্ধ শুম্ভের আদেশে তারপর তাঁদের সেনাপতিদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড চতুরঙ্গ বাহিনী সেনা নিয়ে এলেন যুদ্ধ করতে।

তাঁদের রণমূর্তি দেখে দেবীর মুখ তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল কালীবর্ণ। পরক্ষণেই তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ললাট থেকে আবির্ভূতা হলেন করালবদনা কালী। হাতে তাঁর অসি, পাশেও বহু বিচিত্র খট্টাঙ্গ। ভূষণ তাঁর নরমাল্য, বসন ব্যাঘ্রচর্ম। শরীরের মাংস শুষ্ক। বদনমণ্ডল বিস্তৃত। লাল জিহ্বা, রক্তবর্ণ চক্ষু, মূর্তি ভয়াবহ। এই মূর্তি ধারণ করে দেবী অসুর সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বধ করলেন চণ্ড ও মুণ্ডকে। তারপর তাদের মুণ্ডসহ দেবী অম্বিকার কাছে উপস্থিত হয়ে দেবীকে সেই মুণ্ড উপহার দিতেই দেবী বললেন :

চণ্ডমুণ্ড শির ঘরে আনিয়াছ হেথা।
পৃথ্বীতে চামুণ্ডা নামে হইবে বিখ্যাতা॥
(মহানামব্রত ব্রহ্মচারী কৃত চণ্ডীর কাব্যানুবাদ)

এই হলো চামুণ্ডা কালীর উৎপত্তি কাহিনী। এবং এই মূর্তিই ডানকুনিতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাহিনীর মধ্যে দেবতা ও অসুর অর্থাৎ আর্য ও অনার্যের সংগ্রাম এবং অনার্য দেবতার আর্যীকরণের যে সত্য রূপকের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আছে, তা থেকে হিন্দুধর্মের সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রাচীন কৌশলটিকে অভিনব বললে অত্যুক্তি হয় না। দেবী চামুণ্ডার কাছে ভক্তবৃন্দ যে প্রার্থনা করেন সেটি হচ্ছে : ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে (হে বিশ্বের সারাভূত দেবী তোমার জয় হোক) নয় নয় মাত রথ্যার্নবপারে (তুমি দুঃখ সাগরের পরপারে আমাদের নিয়ে যাও) জহি জহি ভারত দুর্গতি ঘোরং (ভারতের ঘোর দুর্গতি বিনাশ কর) কুরু কুরু মাতরুপেক্ষিতত্রাণম্ (হে মাতঃ উপেক্ষিত ভারত সন্তানগণকে ত্রাণ কর)। আর বন্দনাটি হচ্ছে এই :

হে মাতঃ, সেবক আমি শত জন্মের পাপ শান্তির জন্য এবং বীর্যশালী ও সর্বলোকজয়ী পুত্রকন্যাদিরূপ বিভূতি লাভের জন্য তোমার প্রভাতময় চারুপাদপদ্ম স্মরণ করি, যা নরনারীগণকে অগণিত সুখধারা প্রদান করে এবং অমরগণ সদা যাতে পারিজাত কুসুম অর্পণ করেন।

ভকত বৎসল দেবী ভগবতী তুমি।
প্রসীদ প্রসীদ মাতঃ তোমায় প্রণমি॥
যার জন্য গীত হবে মহিমা তোমার।
দেহে গেহে, হে শঙ্করী কল্যাণ তাহার॥

চামুণ্ডা দেবীর জমি নিয়ে রেল লাইন হয়েছিল বলে এখানে একাধিকবার রেল দুর্ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কৃপায় এখানে কোন জীবন হানি হয়নি।

দেবীর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত [৩ নভেম্বর ১৯৮২] নিম্নোক্ত সংবাদটি উল্লেখ্য :

অথ চামুণ্ডা মন্দির কথা : ডানকুনি স্টেশনের কাছে যে বাফার এলাকায় মঙ্গলবার সকালে হাওড়া-অমৃতসর ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় তার কাছেই চামুণ্ডা দেবীর মন্দির। মন্দিরের পুরোহিত দুর্ঘটনায় কারো প্রাণহানি না হওয়া বা গুরুতরভাবে আহত না হওয়ার ঘটনাকে দৈবমাহাত্ম্য বলেছেন। তিনি বলেন বছর দেড়েক আগেও ঠিক এই মন্দিরের সামনে এমনি ভাবে একটি ট্রেন লাইন চ্যুত হওয়া সত্ত্বেও কারো প্রাণহানি হয়নি। এবারেও হয়নি। স্থানীয় লোকদের মধ্যেও এ ধরনের একটা প্রচার রয়েছে। একটি বালিকা এদিন মন্দিরের সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ওই বালিকাটিও রক্ষা পায়। সামান্য আহত হয়েছে সে। এসব মিলিয়েই চামুণ্ডাদেবীর "মাহাত্ম্য" প্রচারের পালা চলেছে এদিন ওই এলাকায়।

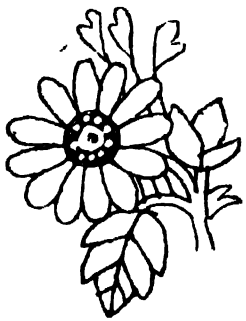

তমলুকের বর্গভীমা

অতি প্রাচীনকাল থেকে তাম্রলিপ্ত হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলে খ্যাত ছিল। তাম্রলিপ্তের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বর্গভীমার জন্যই এই খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়। হিন্দুশাস্ত্রীয় ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থেও তাম্রলিপ্তের নাম উল্লিখিত আছে। এর মধ্যে ব্রহ্মপুরাণে দেখা যায় যে, মহাদেব দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতিকে নিহত করলে ব্রহ্মহত্যা বশতঃ দক্ষের মস্তক মহাদেবের হাতে সংস্পৃষ্ট হয়ে যায়। মহাদেব কোন রকমেই দক্ষের মস্তক থেকে তাঁর হাত মুক্ত করতে না

পেরে, তিনি পাপমুক্ত হবার জন্য পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু তাতেও দক্ষের মস্তক তাঁর হস্তচ্যুত হলো না। তখন তিনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি মহাদেবকে বলেন যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত নামে মহাপুরীতে এক গূঢ় তীর্থ আছে; সেখানে স্নান করলে লোকে বৈকুণ্ঠে যায়। আপনি সেখানে গিয়ে তীর্থরাজের দর্শন করুন। বলা বাহুল্য, মহাদেব তখন বিষ্ণুর কথামত তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হয়ে সেই সরসী নীরে অবগাহন করলে দক্ষ শির তাঁর হস্তচ্যুত হয়। ব্রহ্মপুরাণের উক্তিটি এখানে উদ্ধার করছি:

অস্তি ভারতবর্ষস্য দক্ষিণস্যাং মহাপুরী
তামালিপ্তং সমাখ্যাতং গূঢ়ং তীর্থং বরং বসেৎ।
তত্র স্নাত্বা চিরাদেব সম্যগেষ্যসি মৎপুরীং
গচ্ছতু তীর্থরাজস্য দর্শনার্থং মহাশয়॥

এখন রূপনারায়ণ নদের স্রোতপ্রবাহে ঐ পবিত্র সরোবরটির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। কিন্তু সেখানে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেবী বর্গভীমা। তাই এখনও প্রতি বৎসর বর্গভীমার মন্দিরের পাদদেশে অবস্থিত নদে অবগাহন করে পুন্যার্থীগণ মকরসংক্রান্তি, মাঘী পূর্ণিমা ও অক্ষয় তৃতীয়ায় পাপমুক্ত হন। বর্গভীমার প্রকাশ সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তমলুকের রাজা গরুড়ধ্বজ দেবীর প্রস্তরময়মূর্তি যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে মন্দির নির্মাণ ও পূজাদির ব্যবস্থা করেন। বর্গভীমা এই অঞ্চলে বহু প্রাচীন কাল থেকে স্বাগ্রতা ও তাম্রলিপ্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে পূজিতা হচ্ছেন। দেবী উগ্র তারা মূর্তি, এরূপ কতকাংশ প্রস্তরে খোদিত মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। ইহার ধ্যান ও পূজাদি যোগিনী-তন্ত্র ও নীল-তন্ত্র মতে অনুষ্ঠিত হয়। কালাপাহাড় এই পথ দিয়ে যখন হিন্দু দেব-দেবী চূর্ণ করতে করতে উড়িষ্যা বিজয়ে যান, তখন তিনি দেবী বর্গভীমা দর্শন করে বিশেষ প্রীত হন এবং এই দেবীর বা মন্দিরের তাই তিনি কোন ক্ষতি করেন নি, বরং তিনি পারসী ভাষায় এখানে একখানি দলিল লিখে দিয়ে যান। সেই দলিলখানির নাম "বাদশাহী-পঞ্জ"। এবং উহা এখনও দেবীর পূজকদের কাছে রক্ষিত আছে।

দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় বর্গী সৈন্য সমস্ত নিম্নবঙ্গ লুণ্ঠন করলেও তাঁরাও বর্গভীমা দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা দিয়ে তাঁকে বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিতা করেছিলেন এবং তমলুকের তাঁরা কোন ক্ষতি করেন নি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় সময় তারার যে গানটি গাইতেন

তা এখানে উল্লেখ করছি :

(আমার) মা ত্বং হি তারা।
তুমি ত্রিগুণ ধারা পরাৎপরা॥
তোরে ডাকি মা ও দীন দয়াময়ী।
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে তুমি স্থলে।
তুমিই আদ্যমূলে গো মা॥
তুমি সর্বঘটে, অক্ষপুটে।
সাকার আকার নিরাকার॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী।
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা॥
তুমি অকূলের ত্রাণকর্তী।
সদাশিবের মনোহরা॥

দেবী বর্গভীমার প্রকাশ সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব তাঁর "উড়িষ্যা" নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, পুরীর জগন্নাথ ও তমলুকের বর্গভীমার প্রকাশ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা প্রায় এক। জগন্নাথদেব জঙ্গলের দেবতা ছিলেন, তাই তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল এক ব্যাধের বাড়িতে আর তমলুকের বর্গভীমাকে আবিষ্কার করেছিল এক ধীবর। জগন্নাথের মূর্তি কাঠের আর বর্গভীমা দেবীর মূর্তি পাথরের। উভয়কেই পূজা করতো নীচজাতীয় লোকেরা। পরে উহা ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ব্রাহ্মণগণ তখন নিজেদের পুঁথিপত্র বার করে এঁর পূজা-পদ্ধতি ও নানা প্রকার উপাদান প্রকাশ করেন।

বর্গভীমাদেবী মন্দিরের আকার ও গঠন প্রণালী উড়িষ্যা অঞ্চলের মন্দিরের অনুরূপ। কিন্তু ভিতরের গঠন বৌদ্ধ বিহারের মতন অনেকটা যেন ঠিক বুদ্ধগয়ার একটি ছোট মন্দির। পাথরের এই মন্দিরটি একটি উচ্চ ভিত্তি বেদীর উপর সংস্থাপিত। উহা সমতল রাস্তা থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখতে হয়। মূল মন্দিরের ঠিক সামনে আছে যজ্ঞমন্দির নামে আর একটি মন্দির। এই দুটি মন্দির একটি সুন্দর খিলান দিয়ে সংযোজিত করা হয়েছে। এই খিলানটি "জগমোহন" নামে পরিচিত। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল এবং এর মধ্যে খোদিত আছে বহু অমূল্য বাণী। নিম্নে কয়েকটি 'বাণী' উল্লেখ করছি :-

১ "কায় বাক্য মনে—ডাকো সরল প্রাণে !"
২ "ভাবের ঘরে চুরি—এইটি মানা করি।"
৩ "ভাষণ যার সত্য বলা—তার থাকেনা তাপের জ্বালা।"
৪ "কামিনী কাঞ্চন ছাড়—তবে দেখা পাবি তার।"
৫ "সদাশিবের অংশে পুরুষ—কালীর অংশে মেয়ে।
যে দেখে সে পরম জ্ঞানী—কে জ্ঞানী তার চেয়ে ?"
৬ "কয়লা হয় ময়লাহীন—আগুন ছুঁলে তায়,
মানুষ হয় মানুষ যদি—গুরুর কৃপা পায়।"
৭ "মন্দ ঠেলে ভাল রাখে—সৎস্বভাবী হলে,
কুলা যেমন উড়ায় তুঁষ— চালকে রেখে কোলে।"
৮ "চাহ যদি পরব্রহ্ম হাতে অবস্থান,
ওঁকারে মিলায়ে ভাই, গাও তাঁর নাম।"

বাঙলাদেশে পাথরের মন্দির খুবই অল্প আছে, কারণ দূর দেশ থেকে পাথর আনিয়ে মন্দির তৈরি করা সেকালে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্গভীমার পাথরের মন্দির নির্মাণ সেকালে কি করে সম্ভব হয়েছিল, তা এখন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। দেবীর বেদীর নীচে এক তলায় সিড়ির ভিতরে আছেন ভূতনাথ ভৈরব। প্রত্নতত্ত্ববিদ হাণ্টার সাহেব তাঁর Statistical Account of Bengal নামক পুস্তকে এই প্রাচীন মন্দিরের শিল্পকলার বিশেষ প্রশংসা করে, একে একটি প্রাচীন পূরাকীর্তি বলে উল্লেখ করেছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত বর্গভীমা মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যে ও এর ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেখে মুগ্ধ হন। শক্তিসাধনা যাঁরা করেন, তাঁদের দেবী বর্গভীমার করুণাময়ী মূর্তি কেবল মুগ্ধ করেনা, এই মন্দিরের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের অতীত কীর্তিকাহিনীর গৌরবময় স্মৃতিকেও সমুদ্ঘাটিত করে বলেছেন। এই দেবীমূর্তি কেবল পৌরাণিক উপাখ্যানের দৃশ্যপটে আঁকা দর্শনীয় চিত্র নয়, এই দেবী মন্দিরকে কেন্দ্র করে তাম্রলিপ্তের অতীতের শক্তি-সাধনায় সিদ্ধির কথা প্রকাশিত—মন্দির ও মূর্তিতে এবং তাম্রলিপ্তের অতীত ইতিহাসে সে কাহিনী জড়িয়ে আছে কালের অবক্ষয়কে পশ্চাতে রেখে। তারারূপী বর্গভীমা দেবীমূর্তিকে অতীতের ইতিহাসের একটি প্রাণময়ী প্রকাশ বলা চলে।

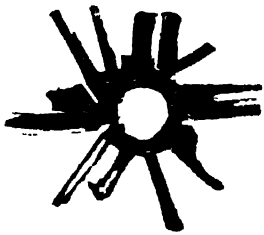

মহানাদের ব্রহ্মময়ী

মহানাদ হুগলী জেলার একটি সুপ্রাচীন স্থান। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন থেকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে ১৯নং বাসেও মহানাদে যাওয়া যায়। দক্ষিণ পাড়া বাস ষ্টপ থেকে দশ মিনিট হাঁটা পথে গেলে মহানাদের বিখ্যাত ব্রহ্মময়ী দক্ষিণাকালীর নবরত্ন মন্দির দেখে দর্শককে থমকে দাঁড়াতে হবে। কারুকার্য খচিত ৮৫ ফুট উচ্চ এই দ্বিতল নবরত্ন মন্দির কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগীর এক অতুলনীয় কীর্তি। ১২৩৫ সালে এই বিরাট কালী মন্দির নির্মিত হয় ও প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে দক্ষিণ কালিকা ব্রহ্মময়ীদেবীর অপরূপ বিগ্রহ।

মন্দিরটি দ্বিতল। ত্রিখিলানযুক্ত একতলার সমতল ছাদের চার কোনে আছে চারটি শিখর। প্রান্তবর্তী শিখরগুলি মন্দিরের দুটি দেওয়ালের ছাদের কোনায় সমান্তরাল ভাবে সংস্থাপিত। একতলার ছাদের কেন্দ্রস্থলে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট কক্ষের উপর আর চারটি শিখর বিরাজিত। আর দ্বিতল কক্ষের কেন্দ্রস্থলে আছে একটি বৃহৎ চূড়া। এই চূড়াভ্যন্তরে ত্রিতলে আছেন হংসেশ্বর নামক শ্বেত শিবলিঙ্গ। মন্দিরের প্রবেশ খিলান একতলায় তিনটি ও দোতলায় আছে একটি। একতলা থেকে তেতলার সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠবার জন্য আছে সিঁড়ি। মন্দিরের মধ্যে বিরাজ করছেন ব্রহ্মময়ী দেবী কালিকা ও তাঁর চার কোণে আছে চারটি শিবলিঙ্গ। এছাড়া সিংহাসনে আছেন বিষ্ণু ও নিয়োগী বংশের কুলদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের শালগ্রাম শিলা।

ব্রহ্মময়ী কালীমাতার বিগ্রহ এক বিশেষ কমনীয়তায় বিধৃত। শিবোপরি দণ্ডায়মানা চতুর্ভুজা দেবীর উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। বর্তমানে কালীমূর্তি ও তাঁর পূজাপদ্ধতি যা আমাদের দেশে প্রচলিত তা প্রবর্তন করেন নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। পূর্বে ঘটস্থাপন করে কালীমাতার পূজা করা হতো; প্রায় পাঁচশো বছর আগে কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী কালীর মূর্তি নির্মাণ করে

পূজা বাঙলাদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহপাঠী; তাঁর রচিত তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত "তন্ত্রসার" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে দেবীর রূপ বর্ণনা ও পূজা পদ্ধতি সমস্ত খুব সুন্দরভাবে বিধৃত আছে। যথা:

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকা দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্ ॥*

দিব্যধামজাতা দক্ষিণাকালিকা হচ্ছেন করালবদনা, ঘোররূপা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা। তাঁর বামদিকের অধঃ ও ঊর্দ্ধকরপদ্মে সদ্যছিন্ন মস্তক ও খড়্গ এবং দক্ষিণের ঊর্দ্ধ ও অধোহস্তে অভয় ও বরদ মুদ্রা-ধারিণী, কণ্ঠলগ্ন নরমুণ্ড থেকে গলিত রক্তধারায় যাঁর দেহ চর্চিত, সেই দিগম্বরী মহামেঘের প্রভাযুক্তা শ্যামাকে, দুটি শব কর্ণের ভূষণ হওয়াতে যিনি ভীষণরূপা, স্থূল ও উন্নত পয়োধরবিশিষ্টা, করাল বদনা, ভীষণ দন্তযুক্তা, শবের হস্তসমূহ দ্বারা হয়েছে যাঁর কটির মেখলা, মুখে যাঁর সদা হাসি, ওষ্ঠপ্রান্ত হতে গলিত রক্তধারায় যাঁর মুখ শোভাযুক্ত, ঘোরগর্জনকারিণী, মহারুদ্রশক্তি শ্মশানবাসিনী বালসূর্যমণ্ডলের মত ত্রিনয়নী, উন্নতদন্তবিশিষ্টা, মুক্ত ও আলম্বিত কেশকলাপ যাঁর পৃষ্ঠদেশব্যাপী, শবরূপ মহাদেবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা ঘোরশব্দকারী শৃগালগণের দ্বারা যিনি চতুর্দিকে বেষ্টিতা, পাপী অসুরদিগের নিপাতকারিণী মহাকালের প্রিয়া রমণী, যাঁর মুখ সুখপ্রসন্ন, যাঁর মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত সেই মহাশক্তি মহাপ্রভাই কালী। তাঁকে ধ্যান করবে এই রূপে। এই তাঁর আসল রূপ।

যে ধ্যানমূর্তির কথা তন্ত্রসারে আছে। মহানাদের ব্রহ্মময়ী দক্ষিণাকালী ঠিক অনুরূপভাবেই প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন ১৭৫১ শকাব্দে। মন্দিরে উৎকীর্ণ সংস্কৃত ও বাঙলা লিপি দুটি থেকে কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী ভবসিন্ধু তরিবার জন্য ব্রহ্মময়ী কালীমাতার বিগ্রহ ও পঞ্চশিব প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। বাঙলা লিপিটি হচ্ছে:

ব্রহ্মময়ীর বাস জন্য, নির্মিত নবরত্ন,
পঞ্চশিব তাহাতে বেষ্টিত।
পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ চারি, ঊর্দ্ধে এক শ্বেত তারি,
দেখিবারে অতি সুশোভিত ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাম, অশেষ গুণে গুণধাম,
সদগোপ কুলে উৎপত্তি।

---

* বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য শ্লোকগুলির কেবল বাঙলা অনুবাদ দেওয়া হলো।

ভবসিন্ধু তরিবারে, সুযত্ন করি অন্তরে,
কালীপদে করিয়ে প্রণতি ॥

সন ১২৩৬ সাল

কালীপূজার রাত্রি ছাড়া দুর্গাষ্টমী ও জগদ্ধাত্রী পূজার নবমী তিথিতে দেবীর বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান খুব সমারোহে এখনও হয়। প্রাত্যহিক পূজা এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রে মাতৃমন্দিরে তান্ত্রিক মতে বিশেষ পূজা, বলিদান, স্তব কবচ ও অপরাজিতা স্তোত্র পাঠ, আপদুদ্ধার বচন, মঙ্গলাচরণ ও কালীকীর্তন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। দেবী জাগ্রতা বলে দেশদেশান্তর থেকে বহু যাত্রীর সমাগম আজও অব্যাহত আছে। দেবীর বর্তমান সেবায়েতের নাম শ্রীসৌরেন্দ্র নাথ নিয়োগী। *

মা-কালী সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি। করাল তোর নাম,
মৃত্যু তোর নিশ্বাস প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ
প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী, তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মাগো,
আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তার কাছে আছে।
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ)

আর সিষ্টার নিবেদিতা বলতেন : Kali, the giver of manhood, the giver of womanhood and withholder of victory,

স্বামী বিবেকানন্দ তারা ব্রহ্মময়ীর এই গানটি সব সময়ে গাইতেন :

আমার)মা ত্বং হি তারা,
তুমি ত্রিগুণধারা পরাৎপরা।

* স্বাধীন হিন্দুরাজ্য মহানাদের বিষয় লেখকের হুগলী জেলার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

তোরে জানি মা ও দীন দয়াময়ী,
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥
তুমি জলে তুমি স্থলে,
তুমিই আদ্যমূলে গো মা।
তুমি সর্বঘটে, অক্ষপুটে,
সাকার আকার নিরাকারা ॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী।
সদা শিবের মনোহরা ॥

পূর্ণশক্তির প্রতীক দেবী দুর্গার অন্যতম রূপ হচ্ছেন কালী। যাকে দুঃখে অতি কষ্টে লাভ করা যায় তিনিই দুর্গা। তাঁর বিভিন্ন রূপ কল্পনা ও আরাধনার দিক বিচার করলে একটা সাধারণ জিনিস চোখে পড়ে যে, সেখানে যেমন আছে আত্মমুক্তি ও সমষ্টি কল্যাণের ইঙ্গিত, তেমনি দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে আছে সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। দেবীভাগবতানুসারে মহিষাসুর প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে যখন দেবগণকে পীড়ন করতে আরম্ভ করলেন, তখন দেবগণ মহিষাসুরকে বধ করার জন্য নিখিল শক্তি মিলিত করে দেবী দুর্গাকে সৃষ্টি করেন, কারণ ঐ অসুর তপস্যা দ্বারা এরূপ বর পান যে, কোন পুরুষ তাকে কখনও বধ করতে পারবে না। সর্বদেবগণের নিখিলশক্তিরূপা সিংহবাহিনী মহাদেবী আবির্ভূতা হয়ে তাই মহিষাসুরকে বধ করেন।

পরে দেবী গিরিরাজ গৃহে আবির্ভূতা হয়ে গৌরী পার্বতী নামে অভিহিতা হন। তখন দৈত্য শুম্ভ ও নিশুম্ভ আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করে দেবগণকে উৎপীড়ন করতে থাকেন। দেবী একবার দেবগণকে বর দিয়েছিলেন যে, কোন সময় দেবতারা যদি বিপন্ন হন, তাহলে তাঁকে স্মরণ করলে তিনি তা নাশ করবেন। দেবতারা সকলে তখন "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা—নমস্তস্যৈ নম স্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ" এই মন্ত্রে ২১টি নমস্কার বাক্যে দেবী বিষ্ণুমায়ার স্তুতি করতে লাগলেন। যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে, নিদ্রারূপে, ক্ষুধারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, তৃষ্ণারূপে, ক্ষান্তিরূপে, জাতিরূপে, লাজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে, ভ্রান্তিরূপে, সংস্থিতা তাঁকে নমস্কার, তাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার।

দেবতারা যখন হিমালয়ে এইভাবে স্তুতি করছেন তখন গিরিরাজ কন্যা পার্বতী যাচ্ছেন গঙ্গাস্নানে। তিনি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কার স্তুতি করছো? তখন পার্বতীর শরীরকোষ থেকে নির্গতা হলেন শিবা অম্বিকার, তিনি বললেন: নিসম্ভ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দেবতারা আমার স্তব করছেন। শরীরকোষ থেকে নির্গতা হওয়ায় অম্বিকার নাম হলো কৌষিকী, আর পার্বতীর গৌরদেহ তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল ঘোর কালো। তখন থেকেই তিনি "কালী" নামে খ্যাত হলেন।

কেবল মহানাদ নয় বাঙ্গলার সর্বত্র বিরাজ করছেন এই মা-কালী, দেবী হলেন আমাদের অতীত ও বর্তমানের আধার। দেবীর মধ্যেই আমাদের সংস্কৃতি ঐশ্বর্য ও গৌরবগাথার ইতিহাস যেমন ঘনীভূত, তেমনি তাঁরই মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা।

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী

আমাদের বাঙলাদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন আগে ছিল না। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম প্রবর্তন করেন, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। প্রথমে এই পূজা হয় কৃষ্ণনগরে, তারপর চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর উদ্যোগে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রী পূজা হয় চন্দননগরে। অতঃপর এই পূজা প্রচলিত হয় বঙ্গের সর্বত্র।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একরাত্রে স্বপ্নাদেশে যে দেবী মূর্তি ধ্যানে দেখতে পান, সেই মূর্তি এখন পূজিতা হন এবং ধ্যানে তাঁর দেবী দর্শনও এক অলৌকিক ঘটনা। কথিত আছে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জমিদারীর রাজস্ব বাকী পড়ায় নবাব আলীবর্দী খাঁ কৃষ্ণচন্দ্রকে মুঙ্গেরে আটক করেন; কারণ তিনি জানতেন যে, দুর্গা পূজার সময় সমস্ত রাজস্ব মহারাজা নিশ্চয়ই পরিশোধ করবেন। আলীবর্দীর

সে আশা পূর্ণ হয়েছিল। রাজস্ব শোধ দিয়ে মহারাজা যখন কারাপ্রাচীরে বাইরে এলেন, তখন দেখলেন যে, মহানবমী পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মহারাজা জগন্মাতা দেবী দুর্গার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার আশায় দ্রুতগামী একটি ছিপে উঠে চললেন কৃষ্ণনগরের দিকে।

কোথায় মুঙ্গের আর কোথায় কৃষ্ণনগর। নবমীর সন্ধ্যায় রুকুনপুরের ঘাটে অগ্রদ্বীপের কাছে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মহারাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, এক অপরূপা সুন্দরী সিংহারূঢ়া কিশোরী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যেন তাঁকে বলছেন: মহারাজ তুমি জল গ্রহণ করো। আমি যে মূর্তি তোমাকে আজ দেখাচ্ছি, সেই রকম আমার মূর্তি তৈরি করে আগামী শুক্লা নবমীতে একত্রে সপ্তমী অষ্টমী নবমীর পূজা শেষ করে আমায় পুষ্পাঞ্জলি দিও। এই কথা বলেই চতুর্ভুজা সেই দেবী মূর্তি যেন অদৃশ্য হলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাঠক হুগলী জেলার দেব দেউল গ্রন্থে দেখতে পারেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিতমণ্ডলীকে অতঃপর কৃষ্ণনগরে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর স্বপ্নে দেখা এটি কোন দেবীমূর্তি? দক্ষিণ ভারতের এক পণ্ডিত মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, এটি হচ্ছে জগদ্ধাত্রী দেবীর মূর্তি এবং প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতের কোন কোন জায়গায় নাকি এই দেবীর অর্চনা হতো। অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পূজা করে দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করে কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন।

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে দশমীযুক্ত নবমী তিথিতে প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে জগদ্ধাত্রী পূজার অনুষ্ঠান হয়। দেবীর ধ্যান মন্ত্রে আছে: সিংহের স্কন্ধে আরূঢ়া, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, চতুর্বাহুযুক্তা, জগতের ধাত্রীকে, সর্পরূপ যজ্ঞোপবীত যিনি ধারণ করেছেন, যাঁর বাম দিকের হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনুক এবং ডান দিকের হস্তদ্বয়ে যিনি চক্র ও শরবাণ ধারণ করেন, যাঁর পরিধানে রক্তাম্বর এবং প্রভাত সূর্যের মত যাঁর গায়ের রঙ, নারদাদি মুনিগণ সেবা করছেন যে শঙ্কর গৃহিনীকে, যাঁর নাভিদেশে তিনটি মাংসাবলী বলয়াকারে রয়েছে এবং নাভি থেকে উত্থিত নালে ফুটে আছে পদ্ম, যিনি সিংহাসনযুক্ত রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে প্রস্ফুটিত পদ্মে সমাসীনা, সেই পরমেশ্বরীকে ধ্যান করি।

কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজার চেয়ে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার খ্যাতি দীর্ঘদিনের। এখানকার মত প্রকাণ্ড ও নানা মনোহর ডাকের সাজে সুসজ্জিতা দেবী জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা বাঙলাদেশে আর কোন জায়গায় হয় না। এখানকার

প্রতিমার উচ্চতা হয় কুড়ি থেকে পনের ফুট এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি চালচিত্র সমেত উচ্চতা হয় প্রায় ত্রিশ ফুট।

চন্দননগরের পূজার বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য স্থানের পূজার মতো'ন এক দিনের বদলে এখানকার পূজা হয় দুর্গাপূজার মত সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই চার দিন। চন্দননগরের মত জাঁকজমক ও সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজা পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও হয় না। কালের বিবর্তনে এই পূজা এখন চন্দননগরের সীমানা ছাড়িয়ে তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত চলে গেছে। বিরাটত্বের দিক থেকে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা একটা দর্শনীয় জিনিষ।

বাঙলাদেশে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা সার্বজনীন হিসেবে হয় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায়। বার জন ব্রাহ্মণ এই পূজা প্রথম করেছিলেন বলে এর নাম হয় বারো-ইয়ারী পূজা। সার্বজনীন নামটি এসেছে অনেক পরে। তখন এর নাম ছিল বারোয়ারী পূজা। সর্বপ্রথম কার মাথায় যে এই পরিকল্পনাটি এসেছিল, তা আজ আর জানবার কোন উপায় নেই, তবে কালীপ্রসন্ন ন্যায়ালঙ্কারের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ছিলেন গুপ্তপাড়ায় এই দ্বাদশ গ্রহের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। কলকাতায় প্রথম বারোয়ারী পূজা হয় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

মা লক্ষ্মীর পূজা

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙলার প্রতি ঘরে লক্ষ্মী হচ্ছেন একমাত্র দেবী যাঁর পূজা গৃহলক্ষ্মীরা ব্যাপকভাবে আজও করে থাকেন। ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর সবচেয়ে বড় পূজা হয় কোজাগরী পূর্ণিমায়। শারদীয়া দুর্গা পূজার পরের পূর্ণিমায় লক্ষ্মীদেবী তাঁর ভক্তকে বরদান করেন। সে দিন

মধ্যরাত্রে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে তাঁর যে ভক্ত সে দিন কেবল ভাবের জল খেয়ে থাকেন, পাশা খেলায় রাত্রি অতিবাহিত করছে দেখেন, তাঁকে তিনি দেন বিত্ত "এশ্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি।" এ ছাড়া নিত্য লক্ষ্মী পূজা বা প্রতি বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক লক্ষ্মী পূজা বাঙলার মহিলাদের দ্বারা প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়। বারমাসের পূজা এবং সোমবার, শুক্রবার ও রবিবারও ঘটে দেবীর পূজা বাঙলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে বরণ করার প্রচলিত একটিগান হচ্ছে :

এসো মগো লক্ষ্মীদেবী কণকবরণী।
কমল লতিকা কৃপা কর নারায়ণী॥
সাজায়েছি ধান-দুর্বা আর গুয়া পান।
ঘটেতে আসিয়া মাগো হও অধিষ্ঠান॥
করি পূজা লক্ষ্মীমায় সবে সযতনে।
তুমি মা আশিষ করো আমা সবা জনে॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রত' নামক পুস্তকে লক্ষ্মীব্রত সম্বন্ধে লিখেছেন : আমাদের দেশে মেয়েরা প্রধানত তিনটি বড় লক্ষ্মীব্রত করে থাকেন। প্রথম ফাল্গুন মাসে বীজ বপনের পূর্বে। চাষীরাই বেশী এই ব্রত করে—রবিবারে আর বৃহস্পতিবারে। এঁকে বলা যেতে পারে হরিতা দেবী—সবুজ বর্ণ। এই পূজা করে তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে আশ্বিন কোজাগর পূর্ণিমায় যখন সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। ইনি হলেন স্বর্ণলক্ষ্মী—হলুদ বর্ণ। তৃতীয় লক্ষ্মীব্রত হল অঘ্রানে, যখন পাকাধান ঘরে এসেছে ইনি অরুণা লক্ষ্মী। মেয়েরা বছরে আরো কয়েকবার লক্ষ্মীব্রত করেন, যেমন ভাদ্রে, কার্তিকে ও চৈত্রে। কিন্তু সেগুলি ঐ তিন লক্ষ্মীরই ছাঁচে ঢালা।

লক্ষ্মী পূজাকে এক কথায় বলা যায় আমাদের দেশের শস্য উৎসব। ধনী দারিদ্র, ইতর ভদ্র সর্ব হিন্দুগৃহে এই ধরণের অন্য কোন পূজা আর হয় না। লক্ষ্মীর বারমাসীতে ফাল্গুন মাসের পূজায় অর্থাৎ বীজ বপনের আগে যে লক্ষ্মী পূজা হয়, তাতে আছে :

"ফাল্গুনে ফাগের খেলা কৃষ্ণ সনে হয়।
এসো মাগো লক্ষ্মীদেবী পূজিব তোমায়"॥

এবং আশ্বিন মাসের পূজায় আছে :

"আশ্বিনে আম্বকা সনে তব পূজা হয়।
কোজাগরী রাত্রে পুনঃ পূজিব তোমায়"॥

বলে লেখা আছে। আর অগ্রহায়ণ মাসের বারমাসীতে লেখা আছে :

"অঘ্রাণে আমন ধান্যে মাঠ গেছে ভোরে।
লক্ষ্মী পূজি মনোসাধে অতি যত্ন করে" ॥

ঘটে বা শালগ্রামে দশোপচারে ধান দিয়ে লক্ষ্মীপূজা হিন্দু গৃহলক্ষ্মীরা করে থাকেন বাঙলার প্রায় সব গৃহে। প্রতিমা নির্মাণ করে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা একমাত্র সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে হয়। তখন দেবীর করতে হয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা। অন্য পূজায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার কোন দরকার হয় না। পৌষ মাসে নূতন ধান দিয়ে লক্ষ্মীর পূজা হয় এবং সেই ধান একটি হাঁড়িতে সযত্নে রক্ষা করা হয়। তার নাম লক্ষ্মীর হাঁড়ি। সোনা দানা এবং টাকা পয়সায় সিন্দুর মাখিয়ে সব রাখা হয় সেই হাঁড়িতে, বলা বাহুল্য সেই সব সোনাদানা মা লক্ষ্মীর সেবা ছাড়া ব্যয় করা হয় না। প্রতি বার লক্ষ্মীপূজার সময় এক বছর ধরে সযত্নে রক্ষিত হাঁড়ি থেকে সেই ধান বার করে নূতন ধান দিয়ে আবার লক্ষ্মীপূজা করা হচ্ছে আমাদের দেশের সুপ্রাচীন প্রথা।

দেবীর যে মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়, তা হচ্ছে . প্রভাত কালীন সূর্যের মত যাঁর দ্যুতি, যাঁর মুকুট ও হার শশিকলার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, রত্নভূষণে বিভূষিতা, হাতে যিনি ডালিমের শাখা, শালিধানের মঞ্জরী, পদ্ম ও কৌস্তুভরত্ন সতত ধারণ করেন, উত্তম হাস্যযুক্তা প্রফুল্ল কমল সদৃশ্য তিনটি নয়নযুক্তা, সেই পরমা অম্বিকাকে ধ্যান করি। হে হরিপ্রিয়ে! তোমাকে নমস্কার তুমি সর্বজীবের বরদায়িনী। তোমার শরণাপন্নদের যে গতি হয়, তোমার অর্চনা দ্বারা আমার যেন সেই গতি হয়।

লক্ষ্মী পূজার পর শ্রদ্ধা সহকারে লক্ষ্মীব্রত পাঠ করা পূজার একটি অঙ্গবিশেষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ব্রত মাহাত্ম্যে আছে :

"কোনই অভাব তার না থাকে কখন।
শান্তিপূর্ণ থাকে সদা তাহার ভবন ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
ইহলোকে সুখী অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন ॥

লক্ষ্মীর বার মাসের ব্রত যাঁরা করেন, তাঁরা বৈশাখ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে এক একটি পাঠ করেন নূতন কাহিনী। তাকে বলা হয় পালা। যেমন বৈশাখ মাসে রতা ঠাকুরের পালা, জ্যৈষ্ঠ মাসে তিলোত্তমার

পালা, আষাঢ় মাসে বিনন্দ রাখালের পালা, শ্রাবণ মাসে রম্ভাবতীর পালা, ভাদ্র মাসে পেঁচাপেঁচীর পালা, আশ্বিন মাসে জগৎশেঠের পালা, কার্তিক মাসে রাজকন্যা পুষ্পবতীর পালা, অগ্রহায়ণ মাসে দীননাথের পালা, পৌষ মাসে ননদভাজের পালা, মাঘ মাসে এক রাজার পালা, ফাল্গুন মাসে হর হর বামুনের পালা ও চৈত্র মাসে তিল ফুলের পালা সুর করে শ্রোতাদের সামনে গান করা হয়। এই সব পালাগানে যে কত রকমের কাহিনী আছে তা বলা শক্ত। আগে হাতে লেখা পুঁথি দেখে এই সব পালা মেয়েরা পাঠ করতো। এখন ছাপা বই পাওয়া যায়। এতে বার মাসের বারটি পালা ছাড়া, লক্ষ্মীর বন্দনা, ধ্যান, প্রণাম স্তোত্র, কবচ, পুষ্পাঞ্জলি, মন্ত্র প্রভৃতি লক্ষ্মীর পূজা পদ্ধতি সব কিছুই লেখা আছে। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে আছে নানা রকমের সব গল্প, তবে মূল তত্ত্ব হচ্ছে, যিনি ভক্তি ভরে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করবেন ও তাঁর ব্রতকথা পাঠ শুনবেন, তাঁর তো ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবেই. এমন কি লক্ষ্মীর ব্রত করতে যিনি উপদেশ মাত্র দেবেন, তাঁর প্রতিও মা লক্ষ্মী তুষ্ট হবেন।

"এ ব্রত করিতে যেবা দেয় উপদেশ-
লক্ষ্মীদেবী তার প্রতি তুষ্ট সবিশেষ।"

লক্ষ্মী ব্রতের ফল কী সে সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে যা লেখা আছে, তা হচ্ছে :

"যে রমণী ব্রত করে প্রতি গুরুবারে।
হইবে নির্মল চিত্ত সে আমার বরে॥
ব্রতকালে সেই গৃহে যত বামাগণ।
অন্য কার্য ছাড়ি কথা কবয়ে শ্রবণ॥
সেই গৃহে থাকি আমি হইয়া অচলা।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি আমি শ্রীকমলা॥"

লক্ষ্মীপূজায় আলপনা দেওয়া মেয়েদের হচ্ছে একটি প্রধান কাজ। লক্ষ্মীর ধান যে চৌকিতে রাখা হয় কেবল সেইটি অলঙ্কৃত করা নয়. বাড়ীর সদর দরজার চৌকাট থেকে শুরু করে সমস্ত বাড়ীতে লক্ষ্মীর চরণ চিহ্ন এবং যে ঘরে তাঁর পূজা হচ্ছে সেখানে মেঝেতে বিচিত্র আলপনায় পদ্ম, লতাপাতা গাছ প্রভৃতি ছবি আঁকা হয়। এই শিল্প সমতল ভিত্তিতে চিত্রণ যে কতখানি ক্ষমতার কাজ তা চিত্রকর মাত্রেই জানেন। পূজাকে উপলক্ষ্য করে মেয়েদের মধ্যে শিল্পবোধ জাগরণ আল্পনার মধ্যে দিয়ে যা হয়, তা মেয়েরা শিল্পচর্চা না করেই যে অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি করেন তা প্রশংসার যোগ্য।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর বর্ণনা কবি মনোমোহন বসু 'আগমনী' কবিতায় যা লিখেছেন তার কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত হলো :

"দুই ভিতে সুতা সুত— ভিন্ন রূপ গণমত—
জ্যেষ্ঠা কন্যা বামে স্থিত, মুকুট শিরে ;
পদ্মভরে, পদ্ম করে ; পদ্ম বর্ণ ধরে
বামে হেলা ; চঞ্চলা প্রায় চঞ্চলা জ্ঞান হয় গো তারে ;
মৃদু হাসি, কিবা বিম্বাধরে।
দক্ষিণে অম্ব নন্দিনী, ধীরা স্থিরা সুবয়ানী,
মণিময়, চূড়াধারিণী, বীণা-বাদিনী ;
শ্বেতাঙ্গ-দল-বাসিনী, শ্বেতাম্বরণী ;
মূর্চ্ছনা রাগ রাগিনী, সঙ্গীত, কবিত্ববানী, মূর্তিধরে
সেবা করে তারে।"

দেবী পক্ষের শেষে পদ্মাসনার পূজা—'চঞ্চলা' দেবীকে অচঞ্চলা করে হিন্দুদের ঘরে রাখার প্রয়াস। কারণ দেবীর কৃপা হলে গৃহস্থের আর কোন দুঃখই থাকে না। লক্ষ্মীপূজা প্রধানত গৃহস্থের পূজা, যাকে কথায় বলে ঘরোয়া। কিন্তু এখন কলকাতার সার্বজনীন দুর্গা পূজা যে সব মণ্ডপে হয় এবং চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি বহু শহরেও সেই পূজা পূজামণ্ডপে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে পদ্মাসনার হয় পূজা। এবং লক্ষ্মী প্রতিমার পূজার চল ক্রমশঃ কলকাতা ছেড়ে গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। অদূর ভবিষ্যতে লক্ষ্মীও হয়ত সার্বজনীনে পরিণত হবেন। প্যাঁচা হচ্ছেন লক্ষ্মীর বাহন।

লক্ষ্মীর শ্রীচরণ আঁকা বাড়ীর সদর দরজা থেকে আলপনায় 'অরুণ বাঙা চরণ' ফেলে দেবী যেখানে এসে বসবেন, সে জায়গাটি একটি পবিত্র ভাবের উদ্রেক করে এবং বলা বাহুল্য তাঁর হাতের ঝাঁপিটি হচ্ছে লক্ষ্মীর ধন সম্পদের প্রতীক এবং গৃহলক্ষ্মীদের নিষ্ঠাই এ পূজার প্রধান উপাচার।

কোজাগরী কথাটি ভেঙ্গে পড়লে দাঁড়ায় কো জাগর্তি ? অর্থাৎ মা লক্ষ্মীর পূজার দিন তোমরা রাত্রে কে জেগে আছ ? কোজাগরীর আভিধানিক অর্থ সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছেন : "কঃ জাগর্ত্তি, জাগিয়া আছ, ইহাতে বহুব্রী (পৃষোদরাদি) পুং। স্ত্রী-রী।" পৃষ্ঠা ৪৮০ দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মী পূজা সাধারণত ঘরোয়া পূজা এবং এই পূজার মুখ্য ভূমিকা গৃহলক্ষ্মীদের। পূজায় প্রয়োজন ধূপ দীপ নারকেল নানারকম ফলমূল ধানের শীষ মিষ্টান্ন ইত্যাদি

নানা সামগ্রীর। বহু জায়গায় লক্ষ্মীর সরাও পূজায় প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়।

দুর্গা পূজার বিসর্জনের দিন ঢাকের বাজনা থামতে না থামতেই বেজে ওঠে কোজাগরীর লক্ষ্মী পূজার শাঁখ। আশ্বিনের শারদ পূর্ণিমায় হয় এই পূজা। প্রতিটি দুর্গা-মণ্ডপে তো লক্ষ্মী পূজা হয়ই, তা ছাড়া হয় ঘরে ঘরে গোধূলিতে। লক্ষ্মী-পূজায় রাত জাগার নিয়ম আছে। মা লক্ষ্মী নাকি এই দিন ঘরে ঘরে ঘুরে দেখেন কে জেগে আছে? যে জেগে আছে, সেই পায় ধন। কে জাগে এই থেকেই পূজার নাম কোজাগরী। লক্ষ্মীর পাঁচালীতে আছে, লক্ষ্মী বলেন এই পূর্ণিমায় যে জাগে তাকে দিব ধন। দাশরথি রায়ও তাঁর পাঁচালিতে বলেছেন: ঘুমে লক্ষ্মী হন বিরূপা, জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, নৈলে কেন জাগে কোজাগরে?

এই শারদ পূর্ণিমাকে ব্রত পূর্ণিমাও বলা হয়ে থাকে। তিথ্যাদিত্তে বলা হয়েছে: অক্ষ ক্রীড়া, নারকেলের জল পান এবং চিপিটক অর্থাৎ চিঁড়া খাওয়া উচিত হচ্ছে এই পূজায়।

দুর্গা পূজার পর এই লক্ষ্মী পূজা তারপর কার্তিক ও সরস্বতী পূজার মধ্যে লক্ষ করা যায় এক আশ্চর্য ক্রম। প্রথমে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আরাধনা, তারপর আসে ধন ঐশ্বর্যদাত্রী লক্ষ্মীর অর্চনা, তারপরই সন্তান লাভের আশায় কার্তিক পূজা এবং এরপর সেই সন্তানের বিদ্যার জন্য হয় সরস্বতীর বন্দনা।

কমলা লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। এর মধ্যেই যেন রয়েছে এক প্রতীক ব্যঞ্জনা। পেঁচা দিবান্ধ আর ঐশ্বর্য মদেও মানুষ হয় অন্ধ, তাই যেন লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা সব সময় সাবধান বাণী উচ্চারণ করছে যে, ঐশ্বর্যে মত্ত: হয়ো না, ভুলো না তোমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং দেশের অন্যান্যদের। তাই এই পূজা শুধু ঐশ্বর্য দেবীর পূজা নয়, এ পূজাকে বলা যায় আত্মোপলব্ধিরও পূজা।

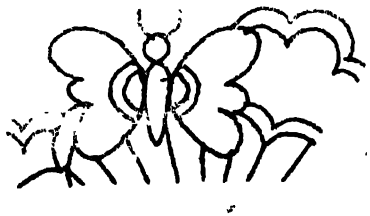

বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী

সরস্বতী এই নামটি স্মরণ করলেই শুভ্রবর্ণা, শ্বেতবসনা, হংসবাহনা, পদ্মাসনা,

বীণাহস্তা ও পদতলে গ্রন্থলেখনা—এই লাবণ্যময়ী দেবী মূর্তি ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। যিনি আবহমান কাল থেকে পূজা পেয়ে আসছেন বিদ্যার্থী কিশোর সমাজের। এই মূর্তির মাধ্যমে তাই তিনি হচ্ছেন বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, কিন্তু তাঁর এই রূপ কেবল একটাই নয়। বেদে-তন্ত্রে-পুরাণে দেখা যায় তাঁর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, তা সে যেমন বৈচিত্রময় তেমনি চমকপ্রদ। শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে যা লিখেছেন সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

জ্ঞানান্বেষণ সভ্যতার প্রথম স্তর। প্রাকৃতিক সম্পদ অন্বেষণ জ্ঞান ও সম্পদকে রক্ষার চেষ্টা দ্বিতীয় স্তর। আর অশুভ বিন্যাস করার চেষ্টায় শক্তি অর্জন তৃতীয় স্তর। এই তিন স্তরের প্রকাশ হয়েছিল একই সঙ্গে—সেই প্রাচীন যুগে সরস্বতী নদীর তীরে, যে স্থানটি ছিল মুনি ঋষিদের জ্ঞানচর্চার একমাত্র কেন্দ্র। সভ্যতার তিন স্তরের ত্রিশক্তি দেবতা জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে ভেসে উঠলেন ঋষিদের ধ্যানমগ্ন নেত্রে—সেই ধ্যানমগ্ন রূপই দেবী সরস্বতী।

সরস্বতী ঐশ্বর্য-জ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের প্রাণদেবী হয়ে রূপ পেলেন প্রতীকে; শুভ্র জ্যোতির্বর্ণা শব্দস্বর-বর্ণের দ্যোতক বীণা পুস্তক হস্তে—পৃথিবী ঐশ্বর্যের স্মারক পদ্মে আসীন। তিনি একাই পৃথিবী, দুর্গা, সবিতা (সূর্য), শ্রী, ঐশ্বর্য দেবী (লক্ষ্মী) হয়ে উঠলেন। শুক্রনীতিসারে শুক্রাচার্যের বর্ণনায় সাত্বিক লক্ষ্মীর ছবি—বীণাবাদিনী। তিনি ফল, বরাভয়, মুদ্রাধারিনী এই তো সরস্বতীর প্রতিরূপ।

দুর্গা-সরস্বতী-শ্রী। সরস্বতী অর্থে ধরা-সাবিত্রী-শ্রী। মহাশক্তি আবার লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমন্বয়। দুর্গাই সরস্বতী। নবদুর্গার ধ্যানে হংসবাহিনী, ময়ূর বাহিনী সরস্বতীর উল্লেখ আছে।*

অজ্ঞান নাশের প্রতীকদেবতা লয়কর্তা মহেশ্বরের মূলশক্তি, মহেশ্বরী সরস্বতী, জ্ঞানের নবোন্মেষের সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মার আরাধ্যা শক্তি ব্রাহ্মী সরস্বতী জ্ঞান-রক্ষীর স্থিতির নিয়ন্তা বিষ্ণুর অন্তর শক্তি বৈষ্ণবী সরস্বতী।

বীণার তারে শুধু সুরের ঝঙ্কার তোলায় নয়, জনগনের কল্যাণের জন্য

---

* পুরাণে বহুবার সরস্বতী তাঁর বাহন বদল করেছেন দেখা যায়। কখনো সিংহ, কখনো ময়ূর, কখনো বা মেষ হয়েছে তাঁর বাহন। বোম্বাইতে ময়ূর বাহনা সরস্বতী হয়। কাশীতে সরস্বতী মন্দিরে বাগীশ্বরী মূর্তি সিংহ বাহিনী। কলকাতা যাদুঘরেও সিংহবাহনা বাগেশ্বরী মূর্তি আছে।

শক্রদের সঙ্গে সংগ্রামও করছেন তিনি। দেহধ্বংসকারী অনিষ্টকারী শক্রকে পরাজিত করে প্রাণকে রক্ষা করছেন তিনি।

যুদ্ধ চলছে সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে। সুপ্রবৃত্তি চৈতন্যময়ী বাগ্দেবী শক্র কুপ্রবৃত্তিকে দমন করেছেন। তাই শক্রবিনাশিনী এক অদ্বিতীয় দেবী রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিতা। তান্ত্রিক—পৌরাণিক যুগেও নানা মূর্তিতে তিনি প্রতিভাত। অসুর সংহার কর্ত্রী বিণাবাদিনী আবার জ্ঞানদাত্রী। ভিন্ন ভিন্ন নামে রণদেবী হিসাবেও সরস্বতীর আরাধনা চলে। তিনি হচ্ছেন বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সিংহবাহিনী রূপে দুহাতে তার পরশু গদা, অন্য দুহাতে দানবের জিভ উৎপাটনে ব্যস্ত। তন্ত্রের মহা সরস্বতীর অস্ত্র মুষল, চক্র, ধনু, খড়্গ ও ত্রিশূল। আবার এই রণদেবী মূর্তির ভিন্ন রূপও আছে। যে রূপ অন্নদাত্রীর। সকল রকমের অন্ন দিয়ে তিনি সকল জীবের প্রাণরক্ষা করেন।

সরস্বতী নামের আদি সূত্র 'সরস' শব্দে। 'সরস' শব্দের নিগূঢ় অর্থ জল তেজ। আর এই জল তেজ অন্ন উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদান। জল হল জল-স্থল অর্থাৎ পৃথিবী। আর তেজ হল সূর্যরশ্মি। এই জল স্থল তেজের সংহতি শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল ঋষি মন্ত্রে—'সরস' শব্দে। এই জল তেজ রূপিনী সরস্বতী বেদে পৃথিবী নামেও অভিহিতা হয়েছেন।

তন্ত্র-পুরাণের অনেক জায়গাতেই সরস্বতীকে অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জন্মমৃত্যু ও জীবিত অবস্থার সঙ্গে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের সংযোগ সাধন করে রেখেছেন সরস্বতী।

এই ভারতেরই কোন কোন স্থানে সরস্বতী চতুর্ভূজা ময়ূরবাহিনী। কোথাও বা তিনি দ্বিভূজা হংসবাহিনী, আবার কোথাও বা তিনি অষ্টভূজা। বেদে-উপনিষদে তন্ত্রে-পুরাণে আবার কখনও তিনি পুরুষও। এই নারী পুরুষের মিলিত রূপ নিয়ে তিনিই আবার অর্ধনারীশ্বর নীল-সরস্বতী। ঋগ্বেদে বাগ্দেবী নিজেকে বলেছেন, আমিই স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম জগতের ঈশ্বরী। সরস্বতী কিন্তু প্রথমে ছিলেন নিরাকারা। ধীর ধীরে পরে তিনি রূপ থেকে রূপান্তরে প্রকাশমানা হলেন।

ভগবান বিষ্ণুর অন্যতমা পত্নী সরস্বতী বৈদিক দেবী। সুদূর অতীত কালে বৈদিক সংস্কৃতির সুরু থেকে বাঙলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করেছিল কেবল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অধীষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবেই নয়, সরস্বতীকে তারা গ্রহণ

করেছিল, "সর্বদঃখদারিদ্র্য পরবশয়োশান্তিনিমিত্তক।" অর্থাৎ সব রকম দুঃখ-দারিদ্র-পরবশ থেকে শান্তির দেবী হিসাবে। ঋগ্বেদে দেবমাতা অদিতি সৃষ্টিধাত্রী পৃথিবী ও নদীরূপা দেবী সরস্বতীর বর্ণনা আছে। বাংলার সংস্কৃতিতে এই দেবী শক্তি রূপায়ণের মধ্যে দুর্গা ও তাঁর কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়া দেবী। দেবীরূপেই এই পরিকল্পনা ভারতবর্ষে অতিশয় প্রাচীন এবং এই দেবী মূর্তি হচ্ছে মাতৃশক্তির প্রতীক। এই তিন নারী দেবতা খুব প্রাচীন এবং বাঙলায় তাই এঁদের বিশেষ জনপ্রিয়তা দেখা যায়।

লক্ষ্মী-মেধা-ধরা-পুষ্টি-গৌরী-তুষ্টি-প্রভা-ধৃতি এই আট হাত দিয়ে দেবী সরস্বতী আমাদের সর্বদা রক্ষা করেন। এই পার্থনা ভারতের নরনারী প্রাচীন কাল থেকে তাঁর কাছে করে আসছেন। লক্ষ্মী অর্থে রাজ্যশ্রী, সম্পদ, শোভা, মেধা—স্মৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি, ধরা—পৃথিবী, ভূসম্পত্তি, পুষ্টি—বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি গৌরী—শ্বেতবর্ণা ষোড়শী নারী; তুষ্টি—সন্তোষ; প্রভা—দীপ্তি, যশ; ধৃতি,—ধৈর্য্য, ধারণশক্তি; এবং তনু হচ্ছে—রূপ, মূর্তি।

সরস্বতীর ধ্যান মূর্তি এইরূপ: যিনি মুক্তাহার ধারণে শ্বেতশোভাযুক্তা, যিনি মস্তকে শশিকলায় অলঙ্কৃতা, চারহাতে যিনি বীণা, বর্ণরূপ অক্ষরমালা, মণিময় অমৃত কলস ও পুস্তক ধারণ করেন, দেবগণের দ্বারা পূজিতা, সরোবরে শতদল পদ্মে যাঁর বাস, যিনি বাক্যের অধিশ্বরী, ত্রিভুবন যাঁকে প্রণাম করছে, পদ্মের উপর উপবিষ্টা সেই মহতী দেবী সরস্বতীকে সতত বন্দনা করি।

দেবদানববন্দিতা দেবী সরস্বতী ভারতের বিদ্যা কাননে উদিতা হয়েছিলেন সর্বপ্রথম। বিজ্ঞানের পারগামী হওয়ার জন্য এবং পুত্রকন্যাদের সর্বদীনতা শান্তির জন্য জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতীকে ভারতের নরনারী বৈদিকযুগ থেকে আরাধনা করে আসছেন। জগতের সব লোক যে শক্তির আরাধনা করে ব্রহ্মশক্তিরূপা চিৎশক্তিরূপিনী আনন্দদায়িনী সরস্বতীকে বন্দনা করলে জ্ঞান-দৃষ্টিরূপ বিভূতি লাভ হয়। "ব্রহ্মশক্তিং বীণাপানিং জ্ঞানদৃষ্টি বিভূতয়ে"।

অতীতে দেবীর কোন মূর্তি নির্মাণ করে পূজা হতো না; পূজা হতো ঘটে এবং পুস্তকাদি ও মসপ্যাধার ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান উপকরণ। অষ্টাদশ শতক থেকে তাঁর ধ্যান দেখে মূর্তির পরিকল্পনা সুরু হয়। দুর্গা লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই তিন নারীদেবতাই খুব প্রাচীন কাল থেকে বাঙলাদেশে বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বাঙলার অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা বিষ্ণুর দয়িতা ও পার্শ্বচরীরূপে লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্তি তাই সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। বাঙলার মূর্তি

নির্মাতারা এই সব মূর্তি বাঙলার অসংখ্য মন্দিরে খোদাই করে এক নতুন পরিকল্পনার প্রবর্তন করেছিলেন। যাকে বলা যায় বাঙলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

আমাদের দেশের কবি সাহিত্যিক সকলেই সরস্বতী চরণে ঐশ্বর্য—সিদ্ধি লাভ করার জন্য প্রার্থনা করে গেছেন। এখানে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ও স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রার্থনার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হলো।

হৃদয় কমলে আসি, বিনাশিয়া তমোরাশি,
প্রকাশিতা হও বিধায়িনি।
কবিতা-কমল-মধু দেহি হে মাধববধু,
বীণাপাণি বাক্য প্রদায়িনী॥

"ভারতী" সম্পাদিকা প্রসিদ্ধ মহিলা কবি স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর বাণীসাধনার কথা নামক একটি গানে যা প্রকাশ করেছেন তা "গীতিগুচ্ছ" থেকে উদ্ধৃত হলো।

ওগো কমল আসনা—রঞ্জিনী বিণপাণি।
আমি কাহাকেও আর জানিনা ভারতি
তোমাকেই শুধু জানি!
ওগো মধুবছন্দা, হৃদয়ানন্দা,
না জানি প্রভাত না জানি সন্ধ্যা,
তোমারি পর্বে অর্ঘ্য রচিয়া, জীবন ধন্য মানি।
আমি জানি না তো তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিম্বা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীতিপূরিত পরমানন্দ লভি গো চরনে দানি।
আমি, না জানি অন্য বিভব ঋদ্ধি,
চাহি না মুক্তি চাহি না সিদ্ধি।
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অমৃতবাণী।

ব্যাসদেব মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অধ্যায়ে লিখেছেন

"নারায়ণং নমস্কৃতং নরঞ্চৈব নরোত্তমম।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং তত জয়মুদীরয়েৎ॥"

এর কাব্যানুবাদে রাজকৃষ্ণ রায় লিখেছেন তা এই:

নারায়ণ নরোত্তম নর ভারতীরে।
নমস্কার করি জয় উচ্চারিবে পরে॥

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গঠনে জয়গোপাল

তর্কালঙ্কারের দান অতুলনীয়। তিনি শিক্ষাসার গ্রন্থের আখ্যাপত্রে বীণাপাণি সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত হলো। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮১৮) একটি মাত্র কপি বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। সেই দুঃপ্রাপ্য রচনাটি যেমন সেকালের রীতি অনুসারে টানা মুদ্রিত হয়েছিল সেরূপ ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

গুরুদক্ষিণা

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস কুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দী জল কল্লোল কোলাহল কুতূহলী॥ সা তে ভবতু
সুপ্রিতা দেবী শিখরবাসিনী। উগ্রেন তপস্যা লব্ধো
যয়া পশুপতি পতিঃ॥ প্রণামে জুড়িয়া পাণি
বন্দো মাতা বীণাপাণি তব পদে রহুক মোর মতি।
তোমার চরণ সেবি ব্যাস বাল্মীকি কবি তোমা বিনা
আর নাহি গতি॥ কৃপাদৃষ্টে চাহ যারে ইন্দ্রপদ দেহ
তারে তুমি মাতা সকলের সার। তব ভক্ত সেই জন
পূজে তারে ত্রিভুবন তব পদে মতি রহে যার॥ বন্দো
হর গৌরী গঙ্গা বিপদনাশিনী। একে ২ বন্দো যত
সুর সিদ্ধ মুনি॥ পঞ্চদেব নবগ্রহ আদি যত জন।
সাবধান হয়ে বন্দো সভার চরণ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দো
করিয়া ভকতি। মাতা পিতা বন্দিলাম স্থির করি মতি॥

বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতীর কৃপা লাভ করে কি ভাবে কালিদাস মহাকবি কালিদাসে রূপান্তরিত হন সে কাহিনী সকলেরই জানা। দেশে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তিনি প্রথমে ছিলেন গণ্ড মূর্খ। এমন কি শোনা যায় যে, কাঠ কাটবার জন্য গাছে উঠে, তিনি যে ডালটিতে বসেছিলেন সেই ডালটি বুঝি কাটছিলেন। এমন সময় দৈবানুগ্রহে সরস্বতী বালিকার বেশ ধরে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ঐ ডালটি কাটতে নিষেধ করেন ও তাঁকে সরস্বতীর আরাধনা করতে বললেন। সরস্বতীর আরাধনা করে পরে তিনি হন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং মহাকবি। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন' নামে পরিচিত পণ্ডিতগোষ্ঠীর অন্যতম রত্ন।

মহাকবি কালিদাসের কাব্যপাঠে সেকালের সামাজিক রীতিনিতি, ভৌগলিক তথা রাজনীতিক জ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট নানারূপ তথ্য জানা যায় ও গভীর জ্ঞান লাভ হয়। তিনি প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম

দশকে। রঘুবংশে তিনি দিগ্বিজয়ে গমন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানের যে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে তিনি যে সেকালে ঐ সকল স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কালিদাসের বর্ণনায় উপমার প্রাচুর্য এবং ওই সকল উপমা যেরূপ সুচিন্তিত বাক্যবিন্যাসযুক্ত সেরূপ মধুর ও লালিত্যপূর্ণ উপমা ভারতের কোন পণ্ডিত অদ্যাবধি দিতে পারেন নি। তিনি উজ্জয়িনীর অধিবাসী ছিলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত আবার তিনি বাঙালী ছিলেন বলে মনে করেন। তা ঠিক নয়।

প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সদস্যদের নাম হচ্ছে : (১) কালিদাস, (২) ধন্বন্তরী, (৩) ক্ষপণক, (৪) অমরসিংহ, (৫) শঙ্কু, (৬) বেতালভট্ট, (৭) ঘটকর্পর, (৮) বরাহ ও (৯) মিহির।*

মা শীতলা দেবী

সুদূর অতীতকাল থেকে আমাদের দেশে বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে শীতলা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেবীর পূজা হয় শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে। গাধার পিঠে উলঙ্গিনী হয়ে দেবী শীতলা ঝাঁটা ও কলসী নিয়ে বসে থাকেন। আর কুলা হচ্ছে তাঁর মস্তকের অলঙ্কার। শীতল আকৃতি বিশিষ্টা বলে দেবীর নাম হয়েছে শীতলা। তিনি 'অবৈধব্যসুতপ্রদে' অর্থাৎ স্ত্রীলোক তাঁর পূজা করলে কখনও বিধবা হয় না এবং পুত্রবতী হয়, তাই শীতলা পূজা সেকালে প্রচলিত হয়েছিল।

শীতলা পূজার প্রবর্তন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, প্রাচীনকালে হস্তিনাপুরে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ধর্মশীলা। তাঁদের মহাধর্ম নামে এক পুত্র ও শুভকরী নামে ছিল এক পরম রূপবতী কন্যা। শুভকরী বড় হলে তাঁর কৌন্তিন্য নগরের রাজা সুমিত্রের পুত্র গুণবানের সঙ্গে

---

* অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচিত 'সরস্বতী' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে বিস্তারিত তথ্য বিধৃত আছে।

বিবাহ হয়। বিবাহের পর শুভকরী পতিগৃহে যাবার কথা বললে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কন্যাকে একদিন থেকে বৈধব্যনাশক শীতলাব্রত করে যেতে বললেন।

পরদিন রাজা কন্যাকে পূজার সামগ্রী ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ সহ গভীর বনের মধ্যে এক বৃহৎ পুষ্করিণীতে শীতলা দেবীর পূজা করতে পাঠালেন। শুভকরী বনের মধ্যে অনেক ঘুরলেন, কিন্তু তিনি কোথাও পুষ্করিণী দেখতে পেলেন না। শ্রান্ত ক্লান্ত রাজকুমারী এক গাছের তলায় বসে মা শীতলাদেবীকে ডাকতে লাগলেন। তখন এক বৃদ্ধা নারী এসে শুভকরীর সব কথা শুনে তাঁকে বললো যে, এসো বাছা, আমি তোমাকে পুষ্করিণী দেখিয়ে দিচ্ছি।

রাজকন্যা বৃদ্ধার সঙ্গে পুষ্করিণীর কাছে গিয়ে মা শীতলার পূজা সেখানে যথারীতি করলেন। পূজা শেষ করে শুভকরী দেখলো যে, অরণ্যমধ্যে এক ব্রাহ্মণের সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে এবং ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর স্ত্রী করুণস্বরে রোদন করছে। এই করুণ দৃশ্য দেখে রাজকুমারী শীতলা দেবীকে স্মরণ করলেন। তাঁর আকুল প্রার্থনায় দেবী রাজকুমারীকে দর্শন দিলেন এবং তাঁকে বর চাইতে বললেন।

রাজকুমারী তখন দেবীকে বললেন: মা তোমার পূজা করে আমি যে পুণ্যলাভ করেছি, তা তুমি এই ব্রাহ্মণীকে দাও, তাঁর পতি জীবিত হোক। শীতলা বললেন: তাই হোক। অমনি সর্পাদিষ্ট ব্রাহ্মণ চোখ চাইলেন, তারপর তিনি উঠে বসলেন। রাজকন্যা এই দেখে মহা আনন্দে গৃহে ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণীও সেই থেকে শীতলা দেবীর পূজা করতে লাগলেন এবং তদবধি এই পূজা আমাদের দেশে সর্ব শ্রেণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

শীতলা দেবীকে পূজায় অর্ঘদানের যে বিশেষ মন্ত্র আছে তা হচ্ছে: শীতল আকৃতি বিশিষ্টা, বৈধব্যনাশিনী ও পুত্রদায়িনী হে শীতলে! শ্রাবণের শুক্লপক্ষে আমার এই অর্ঘ গ্রহণ কর, তোমায় নমস্কার। আর দেবীর প্রণাম মন্ত্র হচ্ছে:

ওঁ শীতলে দহ মে পাপং পুত্রপৌত্রসুখপ্রদে
ধনধান্য প্রদে দেবী পূজাং কুরু নমোহস্তু তে ॥

অর্থাৎ হে দেবী! আজ আমি তোমার পূজা করছি, তুমি আমার পাপ দহন করো, আমার পুত্র পৌত্রদের সুখ দাও, দাও ধন ও ধান্য, তোমায় নমস্কার।

বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করেন বলে শীতলা দেবীর আর একটি নাম হচ্ছে বসন্তচণ্ডী। জলঘট ও সিন্দুর চর্চিত পাথর বকুলগাছ বা বটগাছের তলায় রেখে ইহার পূজা করা হয়। চাল, ফল, মিষ্টি এবং

বিশেষ ক্ষেত্রে ছাগল ও ভেড়া পর্যন্ত ভোগ দেওয়া হয়। বাতাসা দেবীর খুব প্রিয়। যখন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়, তখন মেয়েরা দেবীর বৃক্ষমূলে বা বারান্দায় জল দান করে শাঁখ বাজায়। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একটি ছোট মাটির শীতলা মূর্তিকে সিন্দুর মাখিয়ে গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে পূজা দেবার জন্য ভিক্ষা করে। ইনি হচ্ছেন ব্রহ্মা ও সাবিত্রীর কন্যা।

শীতলা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাত্মক বাঙলাকাব্য 'শীতলামঙ্গলে' দেবীর নানা কথা বিধৃত আছে। সংক্রামক ব্যাধি বলে বসন্ত নামের পরিবর্তে গ্রামে এক সময় বসন্ত হলে দেশের আপামর জনসাধারণ বলতো 'মায়ের দয়া' হয়েছে। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় "শীতলায় মারা গেল গোমাইলের গরু" এই উদ্ধৃতি থেকে বসন্ত রোগের প্রতিশব্দার্থে রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার নামও একদা প্রচলিত ছিল। চাতরায় ১২৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ঐতিহ্য মণ্ডিত শীতলা দেবীর চারদিন ব্যাপি পূজা ও মেলা শ্রীরামপুরের এক দর্শনীয় পূজা, শীতলা এষ্টেট এর পরিচালক।

শীতলা পণ্ডিত

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় শীতলা পণ্ডিত শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন: শীতলা বসন্ত, বিস্ফোটক, গলগণ্ড রোগের দেবতা। ইনি গর্দভারূঢ় ও বিবস্ত্র থাকেন এবং বাম কক্ষে কলস, দক্ষিণ হস্তে মার্জনী ও মস্তকোপরি শূর্প ধারণ করেন।

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভাস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জনোকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥
শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত স্কন্দপুরানীয় বচন।

শীতলা দেবী বিবস্ত্র ও গর্দভারূঢ়, তিনি মার্জনী কলস ও মস্তকে শূর্প ধারণ করিয়া থাকেন; আমি তাহাকে নমস্কার করি।

ইনি শিব-শক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহার কবচের মধ্যেও মুণ্ডমালিনী কালীর স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

পূর্বদিকে শীতলা, অগ্নি কোনে রোগ-নাশিনী, দক্ষিণে মুণ্ডমালাধারিণী দক্ষিণাকালী। নৈর্ঋত-কোনে শূর্পালঙ্কৃত-মস্তকা, পশ্চিমে সম্মার্জনী-ধরা, বায়ু-কোণে কলস-ধারিণী দেবী, উত্তরে সনাতনী দিগম্বরী এবং ঈশান-কোণে ঘোর-দর্শনী আমায় রক্ষা করুন।

শীতলার মন্ত্র ওঁ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ। কিন্তু অনেকে কেবল হ্রীঁ বীজ উচ্চারণ

পূর্বক তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকে।

হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, প্রভৃতি যে সমস্ত নীচ জাতীয় লোকে শীতলা সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে পণ্ডিত বলে। তাহারা কহে, শীতলা দেবী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া এইরূপ প্রত্যাদেশ করেন, "আমি তোমারে অনুগ্রহ করিলাম, তুমি আমাকে গৃহে স্থাপনা করিয়া পূজাদি কর।" যাহার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত নাম প্রাপ্ত হইয়া তামা গ্রহণ করে, অর্থাৎ তামার অঙ্গুরীয় অথবা বলয় প্রস্তুত করিয়া হস্তে ধারণ করিতে থাকে।

তাহারা নীচ জাতি, তথাচ নিজেই শীতলার অর্চনা করে। স্বয়ং শীতলার গুণকীর্তন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ও অন্য লোকেও তাহাদের বাটীতে আসিয়া পূজা দেয়। ইহাতে তাহাদের সংসার নির্বাহের আর অপ্রতুল থাকে না।*

মা ষষ্ঠী দেবী

সন্তানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম হচ্ছে ষষ্ঠী। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী-যুক্তা ষষ্ঠী তিথিতে যে দেবীর পূজা হয়, তাকে বলা হয় জামাইষষ্ঠী। উক্ত তিথিতে উত্তম সন্তানলাভ ও সন্তানগণের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য বিশেষত জামাতাদের নূতন ধুতি চাদর দিয়ে এবং ধানদুর্বা ও ফলমূলাদি দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। এ ছাড়া প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে যে পূজা হয় তাকে বলে নিত্য ষষ্ঠী পূজা।

কার্তিকের অপর নাম স্কন্দ, তাঁর পত্নী দেবসেনারও অপর নাম ষষ্ঠী এবং তাঁকে বলে স্কন্দষষ্ঠী। নিত্য ষষ্ঠী পূজায় স্কন্দপত্নী দেবসেনারও পূজা হয়ে থাকে। সন্তান জন্মিলে সূতিকা গৃহে ষষ্ঠ দিবসে এই দেবীর অর্চনা করা

---

* যাহারা গৃহে ধর্মদেবতা স্থাপন করিয়া পূজা করে, তাহাদিগকেও পণ্ডিত বলে। তাহারাও শীতলা পণ্ডিতদিগের মত হস্তে তাম্র বলয় গ্রহণ করে। এবং নীচ জাতি হইলেও নিজেই ধর্মদেবতার অর্চনা করিয়া থাকে।

হয় এবং কথিত আছে, তিনি এইদিন নবজাতকের ভাগ্যলিপি নির্ণয় করে দেন। ষষ্ঠী দেবীর ধ্যানমূর্তি হচ্ছে, দ্বিভূজা যুবতী ষষ্ঠী দেবীর দুই হাতে আছে বর ও অভয় মুদ্রা। তিনি দিব্যবসন পরিহিতা ও নানা অলঙ্কারে ভূসিতা। তিনি নিত্য প্রসন্নবদনা, সুখদায়িণী, সর্বসুলক্ষণ বিশিষ্টা, স্থূল উন্নতস্তনধারিণী, জগৎপালিনী ও তাঁর বাম ক্রোড়ে আছে উত্তমপুত্র।

দেবী ষষ্ঠী সম্বন্ধে নারায়ণ নারদকে বলেন যে, প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন বলে এই দেবীর নাম হয়েছে ষষ্ঠী। স্বায়ম্ভব মনুর পুত্র রাজা প্রিয়ব্রত ছিলেন পরম যোগী ও তপস্বী। তিনি ছিলেন আকুমার ব্রহ্মচারী। পরে ব্রহ্মার আদেশে তিনি বিবাহ করলেও, তাঁর কোন পুত্র সন্তান হলো না। এই জন্য কাশ্যপ মুনি রাজা প্রিয়ব্রতকে দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করালেন এবং যজ্ঞের চরু খেতে দিলেন রাণী মালিনী দেবীকে। চরু খাওয়ার পর রাণীর গর্ভ সঞ্চার হলো এবং বারো বৎসর গর্ভ ধারণ করে তিনি প্রসব করলেন এক সুবর্ণকান্তি মৃত পুত্র।

রাজা সেই মৃত পুত্রকে নিয়ে শ্মশানে যখন দাহ করতে গেলেন, তখন রাজা আকাশে বিমানে এক সুন্দরী দেবীকে দেখতে পেলেন। সূর্যের মত প্রভাবশালী সেই দেবীকে রাজা ভক্তির সঙ্গে সবিনয়ে তিনি কার কন্যা বা কার ভার্যা এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে দেবী বললেন যে, রাজন আমি হচ্ছি ব্রহ্মার মানসীকন্যা ও স্কন্দ হচ্ছেন আমার পতি। আর মাতৃকাগণ কর্তৃক দেবসেনা বলে আমার খ্যাতি এবং প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ বলে কেউ কেউ আবার আমায় বলেন বিশ্বষষ্ঠী। এই কথা বলে দেবী মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে সঞ্জীবিত করে, তাকে দিয়ে যখন চলে যাবার উদ্যোগ করছেন, তখন রাজা কাতর কণ্ঠে আর্ত নম্র ভাবে দেবীর স্তব করতে লাগলেন।

দেবী রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললেন: রাজা! তুমি স্বয়ম্ভু মনুর পুত্র বলে ত্রিলোকবিখ্যাত। তুমি যদি আমার পূজা কর এবং জগতে আমার পূজা প্রচলন কর, তাহলে পদ্মসদৃশ এই পুত্র তোমায় দেবো।

রাজা দেবীর কথা স্বীকার করলেন এবং বললেন যে, পৃথিবীতে তিনি মা ষষ্ঠীর পূজা প্রবর্তন করবেন। দেবী তখন রাজাকে ছেলে দিয়ে পুনরায় চলে গেলেন বিমানে করে স্বর্গে।

রাজা প্রিয়ব্রত পরমানন্দে শ্মশান থেকে পুত্রকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন এবং তিনিই প্রথম ষষ্ঠী দেবীর পূজা করলেন। প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে তিনি

নিজে দেবীর পূজা করতে শুরু করলেন এবং প্রত্যেককে ঘরে ঘরে দেবীর পূজা করতে আদেশ দিলেন। আর শিশুদের জন্মের ষষ্ঠদিবসে আঁতুড় ঘরে এবং একবিংশতি দিবসে সকলকে ষষ্ঠী পূজা করার বিধানও চালু করলেন। সেই দিন থেকে সারা ভারতবর্ষে ষষ্ঠী পূজার প্রচলন হয়েছে। এই পূজা হচ্ছে ভারতের অন্যতম প্রাচীন পূজা।

ষষ্ঠী দেবী সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁর বন্দনায় আছে: তুমি কার্তিকেয় দেবের ধাত্রী ষষ্ঠী নামে জগতে প্রসিদ্ধ; তোমার প্রসাদে নারী বহু পুত্র ও উত্তম সমৃদ্ধি লাভ করে থাকে। হে দেবি! তুমি আমাকে ধন, যশ ও ভাগ্য দান কর, বহু পুত্র দাও, যারা বীর্যবান হয়ে বেঁচে থাকবে শত বর্ষ। মাকে সন্ততিদের সুখের আশ্রয় স্বরূপা দেবীকে বন্দনা করি। গৃহসুখদায়িনী মহাশক্তি তোমাকে বন্দনা করি। মতান্তরে কৃত্তিকাদি যে ছয় মাতৃকার স্তন্যে কার্তিক পালিত হয়েছিলেন তাদের সমবেত মূর্তি দেবী ষষ্ঠী। তাঁর অষ্টাক্ষর মন্ত্র "ওঁ হ্রীং ষষ্ঠ দেবৈ স্বাহা" জপ ধ্যান ও স্তুতি করলে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হয়।

পুরাণাদির মধ্যে শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা প্রভৃতি আরাধ্যা দেবীদের অবস্থানের কথা কোথাও উল্লিখিত নেই। এই সমস্ত দেবী হচ্ছেন প্রাক্ আর্যসম্ভূতা। ইহারা আর্য-অনার্য-সংস্কৃতির সংঘাতের পর হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন বলে পণ্ডিতদের ধারণা। আদিতে অবৈদিক হলেও এই সমস্ত দেবী বাঙলার বহু পূজিতা দেবীদের মধ্যে অন্যতম। বাঙলাদেশে এমন কোন গ্রাম দেখা যাবে না, অশ্বত্থ বা বট গাছের তলায় ষষ্ঠাদেবীর 'পূজাস্থান' ষষ্ঠীতলা নেই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার এক মাস পর, সন্তানের মঙ্গল ও দীর্ঘজীবন কামনায় ষষ্ঠীদেবীর পূজা আজও বহু অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ বলে দেবীর নাম হয়েছিল ষষ্ঠী। ইহার সঙ্গে কার্তিকের বিবাহ হয় এবং ইনি মাতৃকাশ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা বলে অনুত্রক গৃহস্থ সন্তান কামনায় কার্তিক পূজার অনুষ্ঠান করেন। ষষ্ঠীদেবীর অনুগৃহীত বালককে তাই 'ষেঠের বাছা' বা ষষ্ঠীর বৎস বলা হয়।

মা মনসা দেবী

সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন মা মনসা। বাঙলাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে মা মনসার পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সর্পভয় নিবারণ ও ধন ধান্য পুত্রাদি লাভের জন্য জরুৎকারু মুনির ভার্যা, বাসুকির ভগ্নী, আস্তিক মুনির মাতা মনসা দেবীর অর্চনা করেছিলেন বলে তাঁর প্রণাম মন্ত্রে আছে। যথা :

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরুৎ কারো মুনো পত্নী পদ্মাদেবী নমোহস্তুতে ॥

মনসা দেবী শিবের কন্যা। পদ্মবনে তাঁর জন্ম বলে তাঁর আর একটি নাম পদ্মা। তিনি প্রতিপালিতা হয়েছিলেন নাগলোকে। তাই পাতালের নাগেরা তাঁকে রাণী করেছিলেন। মহাভারতের আদি পর্বে মনসার উল্লেখ আছে। মনসা গাছ (স্নুহীবৃক্ষ) বা সাপের উপর উপবিষ্ট শ্রীমূর্তির পূজা হয়। কোথাও বা সিন্দুর মাখানো এক টুকরো পাথরকে প্রতীক রূপে মা মনসা বলে তাকে পূজা করা হয়।

মনসার ধ্যানে আছে : দেবী সর্পগণের মাতা চন্দ্রবদনা, চারুকান্তি, বদান্যা, হংসবাহনা, উদারা, সুললিতনেত্রা, সিদ্ধিকামীদের পূজিতা, হাস্যবদনা, বহুসুবর্ণনা, মণি-নাগরত্নে সুশোভিতা, অর্চনাকারীদের আশ্রয়রূপা, প্রশস্ত স্তনদ্বয় বিশিষ্টা দেবীকে অষ্টনাগের সঙ্গে বন্দনা করি।

গাছের নীচে দেবীর পূজা ছিল বিহিত পূজা। এখন বেশ কিছু মন্দিরে তাঁর মূর্তি স্থাপন করে পূজা করা হয়। পূজার প্রধান উপকরণ হচ্ছে চাল ও দুধ। কিন্তু বিশেষ পূজা উপলক্ষে ছাগবলি দেওয়ার প্রথা আছে। হুগলী জেলার গ্রামে মনসা পূজায় সহস্রাধিক ছাগবলি দেওয়া হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনসা দেবীর দুপাশে জালু সালু দুভাই এবং তাঁর বাঁ দিকে নেতা ও ডান দিকে সুগন্ধ্যা বিরাজ করছেন, এ কথা দেবীর বন্দীয় স্তোত্রে আছে বলে লিখেছেন।

মনসা পূজার পর করা হয় অষ্টনাগের পূজা। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য ও দুধ হচ্ছে পূজার উপকরণ। অষ্টনাগ হচ্ছেন—অনন্ত নাগ, বাসুকী নাগ, পদ্মনাগ, মহাপদ্মনাগ, তক্ষকনাগ, কুলীরা নাগ, কর্কট নাগ ও শঙ্খনাগ। মনসা দেবীর প্রণাম মন্ত্রে আছে: হে জগতের আনন্দদায়িনী আস্তিক মুনির মাতা, এসো এসো, হে নাগগণের মাতা মনসা দেবী তোমাকে নমস্কার। হে সর্বকল্যাণ বিধায়িনী দেবী এসো এসো, মা মনসাগাছের শাখায় আরোহণ করে অবস্থিতা হও, আমি তোমাকে পূজা করছি।

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে সর্প দংশনের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য মনসা পূজা হয় সর্বাধিক। গোয়ালারা মনসার পূজা করেন পৌষ মাসে। দেবীর সব চেয়ে প্রিয় হচ্ছে রক্তজবা ও দুর্বা ঘাস। নাগ পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত মনসা পূজার প্রধান অঙ্গ ছিল ঝাপান উৎসব। এখন সেই উৎসবের রূপান্তর হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: "আমাদের দেশে বিশেষতঃ হুগলী বর্দ্ধমান বাঁকুড়া জেলায় আগে ঝাপান হইত। এখনও কোথাও কোথাও হয়। বহু দূর দেশ হইতে মাল-বৈদ্য-ওঝা একত্র হইত। বড় বড় ধুরন্ধর সর্প ওস্তাদ আসিত। ওস্তাদগণ শিষ্যসহ সাপের বহু সংখ্যক ঝাঁপি বা পেটারি লইয়া সেই উচ্চ মঞ্চের উপর উঠিত এবং সর্পের বিষম খেলা আরম্ভ করিত।"

মনসা পূজা প্রসারের জন্য সেকালের কবি বিপ্রদাস, কবি ক্ষেমানন্দ, কবি তন্ত্রাবর, কবি বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস তাঁদের কাব্যে বেহুলা-লখীন্দর প্রভৃতি যে সব কাহিনীর কথা বর্ণনা করেছেন, তাতে, অবিশ্বাসীরাও এই পূজা করেন বলে দেখা যায়।

অ্যালপিনয়েড জনগোষ্ঠী সম্ভূত দুর্ধর্ষ নাগজাতি একদা সর্প-প্রতীক ব্যবহার করতো। সর্প ছিল নাগজাতির কাছে বীরত্ব ও প্রভুত্বের প্রতীক, তাই উদ্যত ফণা সর্প-প্রতীক তারা মস্তকে ও স্কন্ধে বহন করতো। নাগ উপাধিধারী বংশ আমাদের দেশে এখনও আছে। অষ্টনাগ পূজার প্রচলন হয়েছিল পূর্বপুরুষ পূজার ধারা অনুসারে। অনন্তদেবকে বলা হয় অষ্টনাগ। কালক্রমে অষ্টনাগ পূজার ধারা সর্পপূজার ধারার সঙ্গে মিশে যায়। সেই জন্য মানুষ নাগপ্রধানরা সরীসৃপ সর্পরূপে বর্ণিত হয়েছে দেখা যায়।

একদা মনসা পূজার প্রধান অঙ্গ ছিল ঝাপান। ঝাপান শব্দের অর্থ হচ্ছে নরবাহিত যান। আসল উৎসবের এখন বিলুপ্তি ঘটেছে তা আগেই বলেছি।

তবে কোন কোন স্থানে রূপান্তর পরিগ্রহ করে ইহা এখনও টিকে আছে। কবি বিপ্রদাস তাঁর "মনসা বিজয়" কাব্যে লিখেছেন:

"এক শত শিঙ্গ সদা সঘনে যোগান।
বাজিয়া ছত্রিশ নানা নাদের বাখান॥
তাহার উপরে চড়ে নাগ আভরণ।
বিষম শব্দ আর চাকের বাজন॥"

মনসা দেবীর যে কাহিনী ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিবৃত আছে, তা থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মার পুত্রের নাম ছিল কশ্যপ। তিনি সর্পদংশনে জীবের প্রাণনাশ যাতে না হয়, সেই সর্পবিষ দূর করার মন্ত্র তিনি পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। তিনি সর্প দংশনের সংবাদ পাওয়া মাত্রই মন্ত্রবলে তাকে বাঁচিয়ে তুলতেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তার মনের মত কন্যা ছাড়া তিনি তাঁর অধীত বিদ্যা কাউকে শেখাবেন না। ঘটনাক্রমে কশ্যপমুনির একটি মানসকন্যা জন্মগ্রহণ করে। তিনি পিতার মনের চেয়ে সর্পকুলের প্রতি অধিক উগ্র ছিলেন বলে কশ্যপ তাঁর মনের মত এই কন্যার নাম রাখলেন 'মনসা'। মতান্তরে কশ্যপের মানসী কন্যা বলে তার নাম হয় মনসা।

মনসা দেবী যৌবনপ্রাপ্ত হলে পিতার মতানুসারে বিবাহ করলেন তিনি আর এক মুনিকে। তার নাম জরুৎকারু। তিনি জরাজীর্ণ যে কোন লোককে অতি সুন্দর রূপ দান করতে পারতেন। তাঁর মন্ত্রবল ছিল মনসা দেবীর চেয়ে আরো চমৎকার। মনসা কেবল বিষহারক মন্ত্রে প্রাণ দিতে পারতেন। তাঁর কিন্তু জীর্ণকে সৌম্য ও সুন্দর করার শক্তি ছিল না। দেবী মনসা তাঁর স্বামী জরুৎকারুকে পেয়ে বুঝলেন যে, সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে আমি প্রাণ সঞ্চার করবো, আর আমার স্বামী গঠন করবে তাকে নব রূপে। তবে একটি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়ে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল। প্রতিজ্ঞাটি হচ্ছে—জরুৎকারু সৌন্দর্য সৃষ্টির সামর্থ হারালে মনসা দেবী তাঁকে পরিত্যাগ করবেন এবং জরুৎকারুও প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মনসা দেবী প্রাণ সঞ্চার করতে না পারলে তিনিও তাকে পরিত্যাগ করবেন। অবশ্য তারা তাদের মন্ত্রশক্তি কেউই হারান নি। তাঁদের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম অস্তিক। তিনিও মন্ত্রবলে বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং পিতামাতার গুণাবলী সমূহ তিনিও খুব সুন্দরভাবে আয়ত্ব করেন। মনসা দেবীর একটি ভাই ছিল। তাঁর নাম স্বনামখ্যাত নাগরাজ বাসুকী। তিনিও পিতা কশ্যপের মত মন্ত্রশক্তির বিশেষ

অধিকারী ছিলেন। এই কাহিনীর তাৎপর্য খুব সুন্দর। সর্প দংশনে মৃত ব্যক্তির প্রাণদান ও জীর্ণতা থেকে মুক্ত করে জীবকে নবরূপ দান এই ছিল উভয়ের ব্রত। এই মনসা দেবী কিন্তু সরীসৃপ মনসা নয়। ইনি হচ্ছেন 'বিষহরি' অর্থাৎ যিনি বিষহারক মন্ত্রে বিষ হরণ করে জীবের নতুন প্রাণ দান করেন। তাঁর ব্রত শ্রাবণ মাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে পশ্চিমবঙ্গে তাই আজও প্রতিপালিত হয়।

মনসা দেবীর সঙ্গে সরীসৃপ মনসা বলে কথিত সর্পকে যুক্ত করার উদ্দেশ্য সম্ভবত দেবীর ঐশ্বরিক কার্যশক্তিকে জনসমাজে প্রচার করা। কশ্যপতন্ত্রে অনন্ত, কুলিক, বাসুকী, পদ্মপালক, তক্ষক, মহাপদ্ম, কর্কোটক ও পদ্ম নামে যে আট রকমের সর্প আছে, তাদের বলা হয় "নাগকুল"। এবং এই নাগকুলের নাগরাজ হচ্ছেন মনসা দেবীর ভাই বাসুকী। এই আট রকমের যে সর্পকুল তাদের আট প্রকার অতি প্রবল বিষের নাম—কালকুট, শৃঙ্গী, মুস্ত, সঙ্কোচ, বৎসনাভ, স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম। বিভিন্ন সর্পকুলের প্রবল বিষে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিষহারক মন্ত্রে যুগ যুগ ধরে মা মনসা প্রাণদান করার জন্য তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ও খ্যাতি এখনও অটুট আছে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬০ সালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করে ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র এই শিরোনামায় 'সংবাদ প্রভাকরে' ধারাবাহিক ভাবে তা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকায় [১৮ই চৈত্র ১২৬১] মাদারিপুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনসা পূজা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন "শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসা যাত্রা হয়, ইহাতে আর যত জাঁক জমক না হউক, সমস্ত জিলা লইয়া ৪০০০ পাঁটা বলিদান হইয়া থাকে। প্রতিমা গড়িয়া মনসা পূজা করে রোগাদির প্রতীকারার্থে মনসাকেই মানসা করে।"

এ ছাড়া মনসার প্রভাব নিয়ে যাত্রা ও কবিগানে বাঙলাদেশ সেকালে মুখর থাকতো। উনিশ শতকে প্রসিদ্ধ কবিয়াল রাম বসুর একটি গানেও তাই "নহে কাল ভুজঙ্গ, দংশিলে অঙ্গ, মন্ত্রেতে বাঁচিত প্রাণ" বলে উল্লেখ দেখা যায়।

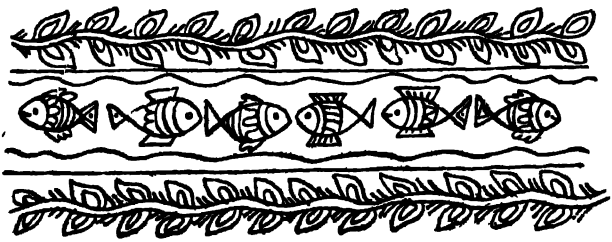

ডি. এম. প্রকাশিত কয়েকটি বই :

সুখময় মুখোপাধ্যায়—চৈতন্যদেব জীবনী : কালক্রম : পরিমণ্ডল : প্রিয়মণ্ডল	১২·০০
শ্রীপান্থের—শ্রীপান্থের নানারকম	৩০·০০
শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত—বিবেকী শিল্পী অন্নদাশঙ্কর	২০·০০
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর—গল্পে মা আনন্দময়ী-বাণী	২০·০০
সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের—সৃষ্টি ও মননের নানাদিকে রবীন্দ্রনাথ	১৮·০০
রমেন্দ্রনারায়ণ নাগের—রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা	২০·০০
আনন্দ বক্সী ও দেবাশিস চক্রবর্তীর—চিন্তানায়ক বার্ট্রাণ্ড রাসেল	৮·৫০
পূর্ণেন্দু পাত্রীর—সিনেমা সিনেমা	২৫·০০
অন্নদাশঙ্কর রায়ের—শিক্ষার ভবিষ্যৎ	১২·০০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের—বাংলার ধর্মসাহিত্য (লৌকিক)	১৮·০০
জগদীশ ভট্টাচার্যর—কবিমানসী	২৮·০০
নলিনীকান্ত গুপ্তর—স্বরাজ গঠনের ধারা	৫·০০
সুরজিৎ দাশগুপ্তর—দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ	৫·০০
সন্দীপ সরকারের—পিকাসোর পৃথিবী	৬·০০
সুভাষ ভট্টাচার্যর—আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান	৩০·০০